দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস

(মধ্যযুগ)

কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস

[মধ্যযুগ]

কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
এম.এ (ইতিহাস ও বাংলা), এল.এল.বি. (কলিকাতা),
পি.এইচ.ডি (লণ্ডন), প্রধান অধ্যাপক (ইতিহাস),
তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়।

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭

ISBN 81-7074-016-9

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত এবং অভিনব মুদ্রণ, ৭৪, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়া দিদি স্বর্গতা ভগবতী দাশগুপ্তা ও
শ্রদ্ধেয় দাদা স্বর্গত দেবীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের পুণ্য
স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

নিবেদন

প্রাচীন যুগ লেখার সময় যে আশা ব্যক্ত করেছিলাম নানা কারণে সে সময় সীমা রাখা সম্ভব হল না। সেজন্য দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীনযুগের মত মধ্যযুগে এই অঞ্চলের কোন অংশেই তেমন উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। মুসলমান বিজয়ের ফলে বঙ্গদেশের একটা অঞ্চল দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল। দীর্ঘ শত শত বছর তাঁরা যেভাবে শাসন করেছে, তার প্রভাব দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের উপর মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে পড়েছে। তারা কখনও কখনও স্বাধীন সুলতান হিসাবে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দিল্লীর অধীনস্থ শাসক হিসাবে দেশ শাসন করেছেন। এই অবস্থায় গৌড়ের শাসক সুলতানরা যখনই উড়িষ্যার দিকে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেছেন, তখনই সেখানকার হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাঁদের অনিবার্য যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে অনেক সময়ে তার ক্ষেত্র ছিল এই দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ। অপরদিকে উড়িষ্যার রাজারা যখনই বঙ্গদেশের দিকে আগ্রাসী নীতি পরিচালনা করতেন তখনই এই অঞ্চলে যুদ্ধ বেধে উঠত। ফলে এখানকার অনেকটা অঞ্চল উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশেষ করে কররাণী বংশের শাসনকালে এই ধরনের অবস্থা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। মোগল যুগে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী জমিদারের নাম পাওয়া যায়। যারা বার্ষিক নির্দিষ্ট রাজস্ব দানের বিনিময়ে নিজেদের আঞ্চলিক সীমায় শান্তিরক্ষার দায়ীত্ব পেয়েছিল। অবশ্য এরা কেউ নিজেদের স্বাধীন বলে দাবি করত না।

প্রাচীন যুগের মত মধ্যযুগের বিষয়বস্তুকেও পাঠ্যসূচীতে যেভাবে সাজানো আছে তার বদলে একটু ভিন্ন ধরনের সাজাবার চেষ্টা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগের পাঠ্যসূচীতে মাত্র তিনটি অধ্যায় দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন যুগে যা ছিল দশটি। এর প্রথম দুটি রাজনৈতিক ইতিহাস। এ বইতে তা ভেঙে মোট চারটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় অংশটিকে দুইভাগে ভাগ করে একটিতে সমাজ ও সংস্কৃতি, অন্যটিতে অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সবটাকে একত্রে মিলিয়ে শাসনব্যবস্থা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি দুটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বিদেশীদের আগমনের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। পাঠ্যসূচীতে শুধু পর্তুগীজদের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বইতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি সকল বিদেশী বণিকদের আগমনের কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে। এই

সঙ্গে তাঁদের কার্যাবলীর ফলাফলও বিবৃত করা হয়েছে। অষ্টম বা শেষ অধ্যায়ে সমাজ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হিন্দু মুসলমান সমাজগোষ্ঠীর বিবর্তন, জীবন-যাত্রা এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষে বিবৃত হয়েছে বঙ্গদেশে মারাঠা আক্রমণের কাহিনী। এর ফলে আধুনিক কলি-কাতার জন্ম সম্ভব হচ্ছে এটা দেখিয়ে এ পর্বে মধ্য থেকে আধুনিক যুগে উত্তোরণের সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে। মারাঠা আক্রমণের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের উপর তার প্রতিক্রিয়া ছিল অপরিসীম। মনে হয় এভাবে সাজানোর ফলে সকলের কাছে বিষয়টা অধিকতর সহজবোধ্য হবে।

প্রাচীন পর্বের মত এ পর্ব রচনাকালেও বহু শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুস্থানীয় ও স্নেহভাজন ব্যক্তির কাছে বুদ্ধি, পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি। এদের মধ্যে আমার শিক্ষক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। অবসর গ্রহণ করার পরও বইলেখা কতদূর এগোল সবসময় খোঁজ নেন।

তাছাড়া আমার ছাত্র শ্রীবাণীব্রত ত্রিপাঠী এবারও আগেরই মত নিরলস সাহায্য করেছে। প্রকাশনার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কনকবাবুর আগ্রহ ও উৎ-সাহ সবসময় আমাকে কাজে ব্যস্ত রাখছে। এরপর আধুনিক যুগও তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন আশ্বাস দিয়েছেন।

সবশেষে আগের মতই এবারও আমি সহকর্মী, অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন রেখে যাব। এ বইতে যে সকল ভুল, ত্রুটির জন্য আমিই দায়ী। সেক্ষেত্রে তা আমার নজরে আসলে সংশোধনের চেষ্টা নিশ্চয়ই করা হবে। যে বৃহত্তর ছাত্র সমাজের প্রয়োজনের কথা ভেবে এই প্রথম এ ধরনের বই লিখতে চেষ্টা করছি এটা যদি তাদের কাজে লাগে তাহলে এই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৯এ, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-৭০০০২৯
৪২-৫৬৩৭

কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়

(১২০০-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)

দ্বাদশ শতকের শেষভাগে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন যাযাবর জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে দুর্জয় অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। বলিষ্ঠ গঠন ও অদম্য সাহসী এইসব জাতির আক্রমনে সেলজুক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং তাহারা খোরাসান, সিস্থান এবং আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারি তুর্কীদের মধ্যে ইহাদের আগমণের ফলে নূতন করিয়া রাজ্য জয়ের উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। শীঘ্রই তাহাদের নজর ভারতবর্ষের দিকে নিবদ্ধ হইল। মহম্মদ-ইখতিয়ার-উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী এই যাযাবর গোষ্ঠীরই সন্তান। অত্যন্ত দরিদ্র এক পরিবারে তাহার জন্ম। রক্তের সম্পর্কে তিনি ছিলেন তুর্কী, জাতিতে খিলজী এবং বৃত্তিতে ছিলেন সৈনিক। তিনি খর্বাকৃতি, কদাকার এবং দীর্ঘবাহুর অধিকারী ছিলেন। ভাগ্যান্বেষণে প্রথম তিনি গজনী আসেন, সেখানে মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তিনি কুতুবুদ্দিন আইবকের দরবারে আসেন। কিন্তু এখানে তিনি বিশেষ সুযোগ লাভে সমর্থ হন নাই। অতঃপর তিনি বাদাউনে গমন করেন এবং বেতনভোগী সৈন্য হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যার শাসকের নিকটে আসেন। ইনি তাহাকে সীমান্তবর্তী দুইটি পরগনায় জায়গীর দান করেন। এই অঞ্চলের শাসনকার্যে এবং প্রতিবেশী রাজ্যে বিদ্রোহ দমনে সাফল্য লাভ করায় কুতুবুদ্দিন তাহাকে সম্মানিত করেন এবং পূর্বদিকে ইসলামের একজন অন্যতম বিজেতা হিসাবে তাহাকে স্বীকৃতি দেন।

বখতিয়ার খিলজীর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সামান্য বিপদ ও রক্তপাতের বিনিময়ে প্রভূত পরিমাণে লুণ্ঠিত দ্রব্য আয়ত্ব করা। বিভিন্ন দিকে দুই তিন বৎসর হিন্দু-রাজ্য লুণ্ঠন করিবার পর তিনি একদা বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার আক্রমণ করেন এবং সম্ভবতঃ উদন্তপুরী বিহার ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অধিকার করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক-

দের মতে তিনি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দেও আর একবার বিহার আক্রমণ করেন। এইভাবে নিজের আর্থিক ও সামরিক অবস্থা সুসংহত করিয়া তিনি বঙ্গদেশ অভিযান করিতে মনস্থ করিলেন। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুচর সংখ্যাও প্রভূত বৃদ্ধি পায়।

সেই সময়ে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন লক্ষণ সেন। নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে তিনি সেই সময়ে বসবাস করিতে ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে একদিন যখন সূর্য মধ্যগগনে এবং চারিদিকে একটি অলস এবং শিথিল কর্মবিমুখ পরিবেশ, ঠিক সেই সময়ে বখতিয়ার খিলজী অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করেন। তাহার এই আকস্মিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত বৃদ্ধ রাজা যুদ্ধ না করিয়াই রাজধানী গোপনে পরিত্যাগ করেন। এইভাবেই নাকি বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন সৈন্য লইয়া বঙ্গ দেশ জয় করেন।

বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের কাহিনী সমসাময়িক দুইটি পারসিক ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়। বই দুইটির মধ্যে প্রথমটি লেখা হইয়াছিল এই ঘটনার প্রায় ৬০ বছর পরে। এই গ্রন্থের লেখকের নাম মীনহাজ-উস্-সিরাজ (Minhaj-us-Siraj)। অপর গ্রন্থটি হইল তবাকৎ-ই-নাসিরী (Tabaquat-i-Nasiri)। মীনহাজ একসময় দিল্লীর কাজী ছিলেন। তিনি প্রায় দুই বৎসর লক্ষণাবতীতে থাকিয়া কয়েকজন বৃদ্ধের নিকট হইতে এই কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তাহার বিবরণ অনুসারে বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করিয়া জয় করেন।

মীনহাজের রচনার প্রায় একশত বৎসর পরে ইসামি (Isami) নামে অপর একজন ঐতিহাসিক তাহার রচিত ফতুহ-উস্-সালাতিন (Futuh-us-Salatin) নাম ঐতিহাসিক গ্রন্থে নবদ্বীপ বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাহিনী অবশ্য মীনহাজের কাহিনীর তুলনায় একটু স্বতন্ত্র। তাহার কাহিনী অনুসারে বখতিয়ার খিলজী নবদ্বীপে অশ্ব বিক্রেতার ছদ্মবেশে আগমন করেন। তিনি রাজা লক্ষণ সেনকে তাহার ঘোড়া, চীনা সিল্ক এবং বিভিন্ন দেশ হইতে আনিত অন্যান্য সামগ্রী পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। প্রাসাদের বিশ্রাম কক্ষে রাজা যখন এই সমস্ত সামগ্রী পরীক্ষা করিতেছিলেন সেই সময়ে বখতিয়ার খিলজীর নির্দেশে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তাহার সশস্ত্র অনুচরেরা রাজাকে ও তাহার অনুচরদের আক্রমণ করে। তখন রাজা এবং তাহার অনুচরেরা প্রচণ্ড বীরত্বের সহিত বাধাপ্রদান করেন এবং রাজা তাহাদের হাতে বন্দী হন। দেখা যাইতেছে এই দুই সমসাময়িক কাহিনীর মধ্যে অনেক বৈশাদৃশ্য থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে

সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮ জন সৈনিকের উপস্থিতি, বণিকের ছদ্মবেশে বখতিয়ার খিলজীর আগমন এবং অতর্কিত আক্রমণে লক্ষণ সেনের অসহায় অবস্থা উভয় বিবরণেই পাওয়া যায়।

বখতিয়ার খিলজী ও তাহার অনুচরদের আগমনে নবদ্বীপের জনগণের মধ্যে কোন অহেতুক কৌতূহলের সৃষ্টি হয় নাই। কারণ বিদেশী বণিকদের আগমন তখন এখানে প্রায় হামেশাই ঘটিত। এই অঞ্চলটি তখন বিশেষ সুরক্ষিতও ছিল না। দুইটি বিবরণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অমিল হইল রাজা লক্ষণ সেনের পরিণতি বিষয়ক কাহিনী। মীনহাজের মতে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন এবং ইসামির মতে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন।

ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যাহাতে মনে করা যাইতে পারে নবদ্বীপ সেন রাজাদের কথনও রাজধানী ছিল। ইহা গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র স্থান। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন বৃদ্ধরাজা লক্ষণ সেন শান্তিতে ও নিশ্চিতভাবে তীর্থ যাপনের উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ এখানে বসবাস করিতেছিলেন। সেইজন্য এখানে প্রতিরক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ বাড়িঘরও প্রস্তর নির্মিত ছিল না।

লক্ষণ সেন বীর এবং শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি সম্ভাব্য মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিতে পারে। সেই যুগে উত্তর ভারতবর্ষের দিক হইতে বঙ্গদেশে প্রবেশের স্বাভাবিক পথ ছিল রাজমহলের নিকটবর্তী তেলিয়াঘেরির সংকীর্ণ গিরিপথ। ইহার উত্তরে বিহারের তিরহুত ও অযোধ্যার মধ্যদিয়া গঙ্গার তীরবর্তী পথে সৈন্যচলাচলের প্রাকৃতিক কোন বাধা ছিল না। সেইজন্য বিহারের তিরহুত জেলাকে দ্বারভাঙ্গা (দ্বার বঙ্গ) এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। তেলিয়াঘেরির দক্ষিণ প্রান্তে ছিল ঝাড়খণ্ডের বিশাল জঙ্গল ও পার্বত্য অঞ্চল যাহার মধ্যদিয়া বৃহৎ সৈন্যবাহিনী চলাচল খুবই কষ্টকর।

এ কথা অনেকে অনুমান করেন যে রাজা লক্ষণ সেন উত্তর ভারতে মুসলমান বিজয়ের কালে রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সেজন্য তিনি সম্ভাব্য মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তাহার সেনাদলকে তেলিয়াঘেরির গিরি পথের সম্মুখে মোতায়েন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে দেখা গেল বখতিয়ার খিলজী তাহার সৈন্যদল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গল অঞ্চল দিয়াই অতর্কিতে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ শহরটি গঙ্গার তীরবর্তী প্রায় দীর্ঘ ৬ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া

ছিল, প্রশ্নে ইহা ছিল খুবই কম। সকলেই অনুমান করেন যে বখতিয়ার খিলজী ও তাহার ১৭ জন অনুচরসহ ছদ্মবেশে তাহার মূল সৈন্যবাহিনীকে অনেকটা পশ্চাতে রাখিয়া শহরের মধ্যে প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহাদের পরিধানে ছদ্মবেশ থাকায় তাহারা বিনা বাধায় শহরের অনেক দূরে রাজপ্রাসাদের সিংহ দরজার সামনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাহার মূল সৈন্যবাহিনী শহরের প্রধান দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অগ্রবর্তী বাহিনী যখন যুদ্ধের ধ্বনি দিয়াছিল তখন পশ্চাতের এই সৈন্যবাহিনীও তাহাদের আগমনবার্তা জানাইয়াছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় বখতিয়ার খিলজী ও তাহার অনুচরের আগমনের সংবাদে লক্ষণ সেন তাহাদের বাধাদানের স্বার্থকতা নাই বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ বঙ্গদেশ বিজয়ের এই কাহিনী কোন মতে বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়াই বর্তমানকালের ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। আব্দুল করিম অবশ্য মনে করেন লক্ষণ সেনের গুপ্তচর বিভাগ মোটেও দক্ষ ছিল না। তাহারা সময়মত শত্রুর গতিবিধির সংবাদ রাখিতে পারে নাই।

বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গদেশ বিজয়ের সীমানা মোটামুটি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলা ও উত্তর-পূর্বে দিনাজপুর জেলার মধ্যে সীমবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ প্রাচীন উত্তর রাঢ় এবং বরেন্দ্র অর্থাৎ বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দিনাজপুর জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বোঝা যাইতেছে বখতিয়ার খিলজী নবদ্বীপ এবং পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশ জয়ের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এই অঞ্চল তখনও মুসলমান অধিকারের সম্পূর্ণ বাহিরে ছিল। বখতিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ বিজয়ের সঠিক তারিখ লইয়া মতান্তর আছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এখন ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করেন।

বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চল অধিকার করিয়া (বরেন্দ্র, গৌড় প্রভৃতি) বখতিয়ার খিলজী পরবর্তী দুই বৎসর (১২০৩-১২০৫) অধিকৃত অঞ্চলে নূতন শাসন ব্যবস্থা চালু করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে তাহার শেষ যুদ্ধযাত্রা ছিল তিব্বতের বিরুদ্ধে। তিব্বতের অপরপারে চীন, তুর্কীস্থান এই দুইটি ধনী ও সভ্য দেশ অবস্থিত ছিল। তিস্তা ও করতোয়া নদীর ওপারে ছিল কামরূপ রাজ্য। তাহার বামদিকে ছিল তখনও অপরাজিত কোশী ও গণ্ডক রাজ্যের মধ্যবর্তী মিথিলা রাজ্য। বিহার ও বঙ্গদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজের সবচেয়ে বিপদ ছিল সেন রাজারা, যাহারা তখনও লক্ষণ

সেনের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে শক্ত ঘাটি করিয়া অবস্থান করিতেছিল। এই নূতন মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে আর একটি বিপদজনক শক্তি ছিল উড়িষ্যার পূর্বগঙ্গ সাম্রাজ্য, অর্থাৎ বঙ্গ-দেশের বিরাটঅংশ বিশেষ করিয়া সারা পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গ (বঙ্গ, রাঢ় ও সমতট), এমনকি বরেন্দ্রের কিছু অংশও বখতিয়ার খিলজীর অধিকারের বাহিরে ছিল। এই অবস্থায় সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করিবার চেষ্টা না করিয়া সুদূর দুর্গম পার্বত্য অতি ক্ষুদ্র রাজ্য তিব্বত জয়ের জন্য তাহার এই অভিযানের কারণ অনুধাবন করা খুবই কঠিন।

মনে হয় শুধুমাত্র দুঃসাহসিক অভিযানের নেশাই বখতিয়ার খিলজীকে বিপদ-সঙ্কুল তিব্বত অভিযানে উৎসাহিত করিয়াছিল। অথবা তিব্বতের মধ্যদিয়া তুর্কীস্থানের সহিত সহজ যোগাযোগের উদ্দেশ্যে তিনি তিব্বত অভিযান করিয়া-ছিলেন। তাহার এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। অনাহারে ক্ষুধায়, পথকষ্টে দুর্যোগে তাহার সৈন্যবাহিনীর অনেকেই প্রাণ হারাইয়া ছিল। ভগ্ন মনোরথ ও অসুস্থ অবস্থায় তিনি মোট ১০০০০ সৈন্যর মধ্যে ১০০ জন মাত্র সৈন্যসহ দেবকোটে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এখানেই সম্ভবতঃ তিনি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে রোগসজ্জায় তাহারই অনুচর আলিমুদ্দীন খিলজীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। একই বৎসর বিক্রমপুরে রাজা লক্ষণ সেন ও ঝিলাম নদীর তীরে দিল্লীর সুলতান মহম্মদ ঘোরীরও মৃত্যু হয় (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

খিলজী শাসন ও গৃহযুদ্ধ (১২০৬-২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

তিব্বতের অভিযানের কিছুপূর্বে বখতিয়ার খিলজী তাহারই অনুচর মহম্মদ সিরান (Muhammad Sheran) এবং তাহার ভ্রাতা আহাম্মদ সিরানকে একদল সৈন্যসহ বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাখনোর (বর্তমান বীরভূম) দিকে প্রেরণ করেন। তাহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরাজ্য ও সামন্তদের উপর দৃষ্টি রাখা এবং উড়িষ্যার পূর্বগঙ্গ রাজাদের সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া সুযোগ পাইলে রাঢ় ও জাজনগর (উড়িষ্যা) অঞ্চল স্থায়ীভাবে অধিকার করা। তিনি তাহার আর একজন অনুচর আলিমর্দান খিলজীকে ঘোরাঘাট (Ghoraghat) অঞ্চলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যেখান হইতে তিনি পূর্বদিকের সীমান্তের প্রতি নজর রাখিতে পারিতেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের রাজা লক্ষণ সেনের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা। ইহা ছাড়া তিনি হুসামুদ্দীন আইওয়াজ খিলজীকে পশ্চিম দিকে তাণ্ডায় সীমার রক্ষার দায়ীত্ব দেন।

বখতিয়ার খিলজীর হত্যার পর তাহার খিলজী অনুচরবর্গের মধ্যে অনিবার্য-

রূপে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। মহম্মদ সিরান তাহার প্রভুর হত্যার সংবাদে দ্রুতগতিতে আলি মর্দানকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে রাজধানী দেবকোটে উপস্থিত হন এবং তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। ঠিক এই সময়ে সুলতান মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পরে কুতুবুদ্দীন আইবক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন এবং তিনি নিজেকে স্বাধীন হিন্দুস্থানের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল গজনীর তাজুদ্দিন-ইয়ালদিজ (Taz-uddin-Yaldiz)। রাজনৈতিক এই অস্থির পরিবেশের মধ্যে মহম্মদ সিরানকে লক্ষণাবতীর সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি একজন অসম সাহসী ও দয়ালু স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাহার উচ্চাকাঙ্খী সহচরবর্গ তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই। তিনি দিল্লীর সহিত স্থিতাবস্থা নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

বন্দী আলিমর্দান উৎকোচ দ্বারা রক্ষীকে বশীভূত করিয়া কারাগার হইতে পালায়ন করিয়া দিল্লীতে কুতুবুদ্দীনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীর নূতন সুলতানকে মহম্মদ সিরানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে উৎসাহিত করেন। কুতুবুদ্দীন অযোধ্যার প্রদেশপালকে সৈন্যসহ বঙ্গদেশ অভিযান করিয়া খিলজী ওমরাহদের বিবাদ মিটাইবার আদেশ দেন। অযোধ্যার প্রদেশপাল কোশী নদী অতিক্রম করিলে হুসামুদ্দিন আইওয়াজ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করেন। এই সংবাদে মহম্মদ সিরান রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অযোধ্যার প্রদেশপাল রুমি (Rumi) দেবকোট অধিকার করিয়া লক্ষণাবতীতে প্রবেশ করেন। তিনি আইওয়াজকে দিল্লীর প্রতিনিধি হিসাবে দেবকোটের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া অযোধ্যার দিকে ফিরিয়া যান। কিন্তু অর্ধেক পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই সংবাদ পাইলেন যে, মহম্মদ সিরান দেবকোট আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি সৈন্যসহ বঙ্গদেশে আসিয়া মহম্মদ সিরানকে পরাস্ত করিলেন। সিরান পলায়ন করিয়া পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার শেষ পরিণতি কি হইয়াছিল সঠিক জানা যায় না। পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ তিনি হয় নিজের আমীরদের হাতে অথবা হিন্দু প্রধানের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। এই ভাবে সিরানের এক বছরের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বের অবসান ঘটে। আইওয়াজও মাত্র দুই বছর নিরুপদ্রবে শাসন করিতে পারিয়াছিলেন।

দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবক আলিমর্দানকে খুবই রাজনৈতিক কাজে লাগাইয়া ছিলেন। আলিমর্দান ছিলেন ন্যায়নীতি হীন নিষ্ঠুর রাজনীতিবিদ।

তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনুগত্য পরিবর্তন করিতে পারিতেন। কুতুবুদ্দীন তাহার সাহায্যে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য তাহাকে বঙ্গদেশের প্রদেশপাল নিযুক্ত করেন। তিনি ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। আইওয়াজ অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত সংঘর্ষের পথে না গিয়া তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজে তাহার হাতে ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া গেলেন।

বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের পর আলিমর্দানই সর্বপ্রথম মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র দুই বছর শাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার শাসনকাল ছিল স্বৈরাচারী, নির্মম এবং ভীতিপ্রদ। তিনি লাহোর হইতে আনিত বিদেশী সৈন্যদের উপর অধিকতরভাবে নির্ভর করিতেন। আলিমর্দান যখন বঙ্গদেশে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবকের মৃত্যু হয় (১২১০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাহার মৃত্যুতে দিল্লীতে প্রচণ্ড রাজনৈতিক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। একদিকে আরামশাহ এবং অন্যদিকে ইলতুৎমিসকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে এই দাবীর বিরোধীতা করেন একদিকে কুবাচা অন্যদিকে ইয়ালদিজ। এই রাজনৈতিক ডামাডোলে বঙ্গদেশের আলিমর্দানও যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া তিনি এক ভীতি ও ত্রাসের শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। খিলজী আমীর ওমরাহদের নির্বিচারে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার তুর্কী সৈন্যদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাহার এই নৃশংস অত্যাচারে জর্জরিত খিলজী আমীরগণ তাহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন। তাহারা পুনরায় হুসামুদ্দিন আইওয়াজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১২১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। আলিমর্দানের রাজ্যসীমা উত্তরে বরেন্দ্রভূমি, দক্ষিণে রাঢ়ের সীমান্ত পর্যন্ত (সম্ভবতঃ অজয়নদী বরাবর), পূর্বে ভাগীরথী এই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে করা হয়।

সুলতান হুসামুদ্দিন আইওয়াজ খিলজী

(গিয়াসুদ্দিন খিলজী—১২১৩-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)

হুসামুদ্দিন আইওয়াজ গিয়াসুদ্দিন আইওয়াজ খিলজী এই উপাধি ধারণ করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনিও বখতিয়ার খিলজীর ন্যায় একই

অঞ্চলের অধিবাসী এবং বিত্তহীন ভাগ্যান্বেষী। অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ শক্তিগুণে তিনি ধীরে ধীরে এই উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি যেহেতু অসন্তুষ্ট খিলজী আমীরদের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন সেইজন্য তাহার রাজত্বের প্রথম দুই বছর নিজ অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই সম্ভবতঃ উড়িষ্যার পূর্বগঙ্গ রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের (১২১১-১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) বীরমন্ত্রী 'বিষ্ণু' রাঢ় অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়া ছিলেন। এই অঞ্চলটি তখন কোন শক্তিশালী রাজার অধীন ছিল না। যদিও লক্ষণাবতীর মুসলমান শাসকগণ বীরভূমের লাখনোর পর্যন্ত তাহাদের রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা বলিয়া দাবি করিতেন। 'বিষ্ণু' সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ের বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহাদের শক্তির কেন্দ্র ছিল উড়িষ্যার বৈতরণী নদী তীরস্থ জাজপুর অথবা জাজনগর। এই ঘটনার সংবাদে সুলতান খুবই বিচলিত বোধ করিয়াছিলেন এবং মুসলমান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এই আক্রমণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। একটি বিবরণীতে দেখা যায় যে একজন ইসলাম ধর্মানুরাগী সুলতানের উপস্থিতিতেই জনগনকে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং ইহার জন্য সুলতান তাহাকে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। এই অধিকৃত অঞ্চল উদ্ধার করিবার জন্য সুলতান ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযান দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। ছাতেশ্বর (Chhatesvara) লিপি অনুসারে (যাহার সময়কাল মনমোহন চক্রবর্তী মহাশয় ১২২০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করেন) এই যুদ্ধে উড়িষ্যার সেনানায়ক 'বিষ্ণু' জয়লাভ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। কিন্তু এই জয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কারণ শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনীকে এই অঞ্চল হইতে সরিয়া যাইতে হইয়াছিল। মীনহাজের মতে এই অধিকৃত অঞ্চল পুনরায় সুলতানের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং তিনি প্রচুর ধনরত্ন ও হস্তি অধিকার করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ জয়ের পর সুলতান নিজের আমীরদের এই অঞ্চলে শাসনকার্যে নিয়োগ করেন। এইভাবে সুলতান শুধু নিজের সম্মানই পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা নহে তিনি উড়িষ্যার গঙ্গরাজাদের আগ্রাসী সাম্রাজবাদ নীতিকেও প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার ফলে তাহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত অজয় নদীর তীর হইতে দামোদরের তীরে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ইহাও বলা হইয়াছে যে জাজনগরের শাসকরা সুলতানকে কর দিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু মনে হয় গঙ্গবংশের বীরে রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীম এই কর প্রদান করেন নাই। যুদ্ধে বিপর্যস্ত অনঙ্গভীমের জাজনগরের সামন্ত 'বিষ্ণুই'

সম্ভবতঃ বঙ্গের সুলতানকে উপঢৌকন ও অর্থ প্রদান করিয়া তাহার রাজ্যের সীমান্তে ইহাদিগকে নিরস্ত করেন। মীনহাজের বিবরণ অনুসারে এই সময় বঙ্গের সুলতানের সৈন্যবাহিনী দামোদরের দক্ষিণ তীরস্থ কাতাসিন (Katasin) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই জায়গাটি সম্ভবতঃ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার সোনামুখীর নিকটবর্তী কোন স্থান।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন একইভাবে বঙ্গ, কামরূপ তিরহুতের শাসকদের নিকট হইতেও কর আদায় করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কিন্তু এই দাবি সম্পর্কে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তাহার রাজত্বে প্রথম ১২ বছর তিনি মোটামুটি নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন চালাইয়াছিলেন। এই সময় তিনি একদিকে মিথিলা রাজ্য, অন্যদিকে কামরূপ পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নানা অভিযান চালাইয়াছিলেন। ইহার ফলাফল তেমন কিছু স্থায়ী হয় নাই। তিনি বঙ্গদেশের সুলতানী শাসনের কেন্দ্রস্থান দেবকোট হইতে ঐতিহাসিক গৌড় লক্ষণাবতীতে স্থানান্তরিত করেন। তিনি মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম যিনি নদীমাতৃক বঙ্গদেশে রণতরীর উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়া একটি নৌবহর তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীকে আরও সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে অনেক পরিখা এবং সেতু নির্মাণ করেন। ইহা ছাড়া সীমান্তবর্তী শহরগুলির সহিত যোগাযোগের জন্য প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করেন। তিনি গৌড়কে প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঁধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নিজের শক্তিকে সংহত করিয়া গিয়াসুদ্দিন নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন এবং খুৎবা পাঠ করিয়া নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নিজের ক্ষমতাকে মুসলমান প্রজাদের নিকট আরও গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য তিনি আব্বাসিদ খলিফা আলনাসিরীর নিকট হইতে সম্মানসূচক অনুমোদন লাভ করেন। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিশেষ মুদ্রা প্রচলন করেন যাহাতে তিনি নিজেকে খলিফার সাহায্যকারি বলিয়া ঘোষণা করেন (১২২০ খ্রীষ্টাব্দ)।

কিন্তু এই সমস্ত কোন কিছুই তাহাকে শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিসের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। ইলতুৎমিস প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বী আমীরদের সহিত যুদ্ধে এবং পরে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল চেঙ্গিজখাঁর আক্রমণের সম্ভাবনায় খুবই বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ফলে ইচ্ছা থাকিলেও তিনি তখন গিয়াসুদ্দিনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হইলে এইবার তিনি পূর্বদিকে বাদাউন, কাশী, কনোজ, অযোধ্যা ও বঙ্গদেশের

প্রতি নজর দেন। তিনি একদল সৈন্য বিহারে প্রেরণ করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ, বিহার জয়ের উদ্দেশ্যে নিজেই সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। গিয়াসুদ্দিন তাহার সৈন্য ও রণতরীসহ দিল্লীর সুলতানের সহিত মোকাবেলা করিবার উদ্দেশ্যে নদীপথে অগ্রসর হইলেন। দুই সৈন্যদলের মধ্যে বিহারের হয় মুঙ্গের অথবা রাজমহলের নিকটবর্তী সক্রিগলি অথবা তেলিয়া-ঘেরির কোথাও সাক্ষাত হইয়াছিল। ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল সম্ভবতঃ ইহা ইলতুৎমিসের কাছে খুব শুভ হয় নাই। সেই জন্য দিল্লীর ঐতিহাসিকগণ ইহা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নাই। শুধু বলা হইয়াছে যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি ও একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। যাহাতে গিয়াসুদ্দিন ইলতুৎমিসকে ৮ লক্ষ টাকা এবং ৩৮টি হস্তি দান করিতে ও তাহাকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার নামে মুদ্রা ও খুৎবা পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সুলতান ইলতুৎমিস মালিক আলাউদ্দিন জানি নামক একজন আমীরকে বিহারের শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যান। যে মুহূর্তে ইলতুৎমিস দিল্লী ফিরিয়া গেলেন তখনই গিয়াসুদ্দিন বিহার হইতে আলাউদ্দিন জানিকে বিতাড়িত করিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। এই অপমানকর সংবাদ জানিতে পারিয়াও ইলতুৎমিস তখনকার মত তাহা হজম করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন সম্মুখ সমরে গিয়াসুদ্দিনকে পরাজিত করা বোধ হয় সম্ভব নয়।

গিয়াসুদ্দিন রাজধানীতে ফিরিয়া দিল্লী হইতে আক্রমণের আশঙ্কায় একবছর অপেক্ষা করিলেন। এই সময় অযোধ্যাতে "পিথো" নামে একজন নেতার অধীনে হিন্দুগণ বিদ্রোহী হইয়া সারা অঞ্চলে বহু মুসলমানকে হত্যা করে। ইহাদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে ইলতুৎমিস তাহার জৈষ্ঠ্য পুত্র যুবরাজ নাসিরউদ্দিন মামুদকে বিপুল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। যুবরাজের পরামর্শদাতা হিসাবে বিহারের ক্ষমতাচ্যুত শাসক আলাউদ্দিন জানিও যোগদান করেন। গিয়াসুদ্দিন এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া পূর্ববঙ্গের রাজাদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ অভিযান করেন। তিনি ভাবিতেই পারেন নাই যে ইলতুৎমিস এর অযোধ্যায় সৈন্য প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গদেশ অধিকার। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিনের সৈন্যদল পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালাইয়া বেশ সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। সেই সময়ে হঠাৎ তিনি খবর পাইলেন যুবরাজ নাসিরউদ্দিনের নেতৃত্বে দিল্লীর সৈন্য-বাহিনী লক্ষণাবতীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। গিয়াসুদ্দিন দ্রুতগতিতে অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তখন কিন্তু অনেক বিলম্ব

হইয়া গিয়াছে। তাহার আসিবার পূর্বেই দিল্লীর সৈন্যদল রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছে, এই সময় তিনি এক মারাত্মক ভুল করিলেন। তাহার মূল সৈন্য-বাহিনীর আগমনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সামান্য সৈন্যসহ দিল্লীর দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। ফলে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন এবং তাহাকে নৃসংশভাবে হত্যা করা হইল।

সুলতান গিয়াসুদ্দিনের ১৪ বৎসর রাজত্বকাল বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় সময়। তিনি বঙ্গদেশে খিলজী শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন এবং সুশাসক ছিলেন সন্দেহ নাই। তাহার সময় বঙ্গদেশের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ১৪ বছর রাজত্বকাল বঙ্গদেশে সমৃদ্ধি ও শান্তির যুগ। উত্তর ভারত যখন দুর্ধর্ষ চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে বিব্রত সেই সময় তিনি বঙ্গদেশে নানা জনহিতকর কার্য করিয়াছিলেন। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়া এবং মধ্য এশিয়া হইতে মুসলমান পণ্ডিত ও সুফিদের তাহার দরবারে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন আইওয়াজ খিলজীর নামাঙ্কিত মুদ্রা বঙ্গদেশে প্রথম পাওয়া গিয়াছিল।

শিলালিপির অভাবে এবং মুদ্রায় টাকশালের নাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়ান থাকায় সুলতান গিয়াসুদ্দিনের আমলে বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের সীমা নিধারণ করা সম্ভব নয়। তবে তাহার একটি আনুমানিক রেখা টানা যাইতে পারে। মূল বঙ্গদেশে লক্ষণাবতী, পুর্ণিয়া, তাজপুর, পাঞ্জারা (Panjarah), ঘোড়াঘাটা, বারবাকাবাদ। রাজশাহী ও বোগরার পশ্চিম অংশ এবং গঙ্গার উত্তর-পূর্বে "তাণ্ডা" বীরভূমের নিকট সরিফাবাদ এবং বর্ধমানের সুলেমাবাদের একটি অংশ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি দক্ষিণ বিহারের একটি অংশ অধিকার করিয়া তাহার রাজ্যসীমা অযোধ্য হইয়া উত্তর বিহারের গণ্ডক নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। একথা মনে রাখিতে হইবে যে এই অধিকারের অর্থ হইল সে সময় এই অঞ্চলে তাহার অধিকারকে অস্বীকার করিবার মত কোন শক্তিশালী হিন্দু বা মুসলমান শাসক ছিলনা। আসল সত্য হইল এই বিহারে এবং গঙ্গার দক্ষিণতীরস্থ এবং নব্য অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে তাহার শাসন ছিল 'অনেকটা সামরিক অধিকারের মত। পশ্চিমে কোশী নদী, পূর্বে পুনরনবা, উত্তরে দেবকোট, দক্ষিণে গঙ্গা। এই রাজ্য সীমার ওপারে বহু হিন্দু রাজত্ব ছিল যাহার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুযোগসুবিধা মত কখনও মসলমান শাসকদের অধিনতা স্বীকার করিত আবার সুযোগ পাইলেই তাহা অস্বীকার করিত। ফলে এই সব অঞ্চল

প্রাথমিক অবস্থায় বারে বারে মুসলমান সৈন্যদের অধিকার করিতে হইত। অর্থাৎ ইহাদের উপর তখনও মুসলমানদের কোন স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

মামলুক শাসন (১২২৭-১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

বঙ্গদেশে ষাট বছরের মামলুক শাসনকালে ১৫ জন প্রধান ব্যক্তি লক্ষণাবতীতে ক্ষমতায় আসীন হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন দিল্লী দরবারের লোক। মধ্য এশিয়ার খিতাই, তুর্ক, উজবেক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এই দশজন ব্যক্তি বাল্যকালে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার অনেক পূর্বেই ইহারা সকলেই দিল্লীর দরবারে উচ্চ সরকারী পদে আসীন ছিলেন। তাহাদের শাসনকালে লক্ষণাবতী দিল্লীর রাজদরবারে একটি প্রতিভূ রূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই জন্য এই সময় বঙ্গদেশের রাজদরবার ও শাসন প্রায় দিল্লীর অনুকরণ বলা যাইতে পারে। শাসন ব্যবস্থায়ও দিল্লীরই অনুরূপ বিকেন্দ্রিত ছোট ছোট সামন্ত প্রতিভূদের পর্যায়ক্রমে অধিপত্য ছিল।

বঙ্গদেশের এই সময়কার ইতিহাস খুবই দুর্ভাগ্যজনক। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর যে রাজনৈতিক শূণ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য এক অশুভ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হইয়াছিল। এই সময়কার বিহার, অযোধ্যা, কনৌজ প্রভৃতি অঞ্চলে শাসকদের জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খাই ছিল লক্ষণাবতীর শাসনভার অধিকার করা। কারণ ইহা করিতে পারিলেই তাহারা সম্মানিত "মালিক-উস-শাক" অথবা "পূর্বদেশের প্রভু" এই মর্যাদা লাভ করিতে পারিতেন। বঙ্গদেশের জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে যিনি সিংহাসন অধিকার করিতেন তাহার প্রতি আনুগত্য একটা সহজাত অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ লোকের আনুগত্য ছিল সিংহাসনের প্রকৃত ক্ষমতা অধিকারীর প্রতি। এই অবস্থায় নানা ষড়যন্ত্র ও হত্যার মাধ্যমে যে কেউ সিংহাসন দখল করিতে পারিলে তিনি প্রজাদের আনুগত্য লাভ করিতে পারিতেন। বঙ্গদেশের শাসকরাও গৌড়ের ক্ষমতা অধিকার করিয়া সাধারণত দিল্লীর সিংহাসন অধিকারী যে কোন ব্যক্তির প্রতি অন্তত মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিতেন। এই সময়কার বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গৌড়ের শাসকরা ঘোরতর বিপদের দিনেও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতেন না। সে জন্য দেখা যায় যখন কলিঙ্গ-রাজ গৌড় অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখনও বরেন্দ্রভূমিতে হিন্দু-প্রাজদের মধ্যে মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশিত হয় নাই।

এই যুগে লক্ষণাবতীতে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শক্তি মোটামুটি একটি স্থিতাবস্থার মধ্যে ছিল। তাহাদের রাজ্যসীমার প্রসারণ প্রায় বন্ধই হইয়া গিয়াছিল। উপরন্তু এই সময় তাহারা প্রতিবেশী শক্তিশালী হিন্দুরাজ্যের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হইয়াছিল। একদিকে কামরূপ অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ এবং উড়িষ্যার শক্তিশালী হিন্দু নরপতিরা গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শাসকদের ভীতির কারণ হইয়াছিল।

লক্ষ্মণাবতীর রাষ্ট্রীয় শক্তির পক্ষে এই সময় সবচেয়ে বিপদজনক ছিল শক্তিশালী উড়িষ্যার পূর্বগঙ্গরাজ্য। তাহারা ছিলেন আদি গঙ্গদের সামন্ত এবং তাহাদের রাজধানী ছিল বৈতরণী নদীর তীরে জাজপুর নামক স্থানে। তাহারা লক্ষ্মণাবতীর মামলুক শাসকদের পক্ষে খুবই দুঃশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল।

যুবরাজ নাসিরউদ্দিন মহম্মদ যিনি গিয়াসুদ্দিন আইওয়াজ খিলজীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি অযোধ্যা ও বঙ্গদেশকে এক শাসানাধীনে আনয়ন করেন এবং নিজে লক্ষ্মণাবতীতে বসবাস শুরু করেন। তিনি আইওয়াজের ধনসম্পত্তি রাজধানীর মুসলমান উলেমা, সৈয়দ এবং সুফিদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহার পিতা তাহাকে 'মালিক-উস-শাক' এই উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র দেড় বৎসর শাসন করার পরেই লক্ষ্মণাবতীতে তাহার মৃত্যু হয়।

তাহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্র আইওয়াজের একজন অনুচর ইখতিয়ার-উদ্দিন বল্কা (Balka) খিলজী লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়া দিল্লীর প্রতিনিধি সকলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন এবং তিনি নিজে প্রায় স্বাধীন সুলতানের মত ১৮ মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন (১২২৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ইলতুৎমিস তাহাকে শাস্তিদেবার উদ্দেশ্যে অভিযান করেন (১২৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পরে বল্কা বন্দী হন এবং তখন তাহাকে হত্যা করা হয়। ইলতুৎমিস বিহারের প্রদেশপাল মালিক আলাউদ্দিন জানিকে লক্ষ্মণাবতী শাসক নিয়োগ করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যান।

আলাউদ্দিন জানি মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থানের যুবরাজ ছিলেন এবং মোঙ্গল আক্রমণের সময় ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন রাজকীয় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। তাহার এক বৎসরের কিছু সময় রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন বিশেষ কারণে তাহাকে অপসারিত করা হয় এবং তাহার স্থলে বিহারের প্রদেশপাল মালিক সইফুদ্দিন আইবককে লক্ষ্মণাবতীর শাসক নিযুক্ত করা হয়। বিহারের শূন্যপদে বাদাউনের প্রদেশপাল তুগরল-তুগান খানকে নিয়োগ করা হয়। মালিক সৈফুদ্দিন আইবক জাতিতে ছিলেন কারা খিতাই-তুর্ক বা তাতার বংশোদ্ভূত। তিনি দীর্ঘ তিন বছর অত্যন্ত

দৃঢ়তার সহিত বঙ্গদেশের শাসন কার্য চালাইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পূর্ববঙ্গের দিকে একবার অভিযান করিয়া অনেক হস্তি দখল করিয়াছিলেন। সুলতান ইলতুৎমিস তাহার প্রেরিত হস্তি পাইয়া খুবই খুশি হইয়াছিলেন তাহাকে ইউ-গান-তাং উপাধি দিয়াছিলেন।

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল, সেই সময় হয় স্বাভাবিক মৃত্যু অথবা রিয়াজ-এর লেখকের মতে বিষ প্রয়োগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের সিংহাসন লইয়া এক ঘোরতর রাজনৈতিক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরবর্তীকালে দিল্লীতে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অনিবার্য প্রভাব পড়িয়াছিল বঙ্গদেশের রাজনৈতিক জীবনে। এই রাজনৈতিক ডামাডোলের সুযোগে আওর খান ইবাক (Aor Khan Ibac) নামে একজন তুর্কী লক্ষণাবতীতে শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন। বিহারের প্রদেশপাল তুগরল তুগান খান এই বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হন। ঘোরতর যুদ্ধের পর তুগরল তুগান খান আওর খানকে নিহত করিয়া লক্ষ্ণাবতী অধিকার করেন। এইভাবে তুগরল খান রাঢ়, বরেন্দ্র ও বিহারের শাসকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তুগরল তুগান খান ও তুর্কী কারাখিতাই বংশের সন্তান ছিলেন এবং বাল্য-কাল ইলতুৎমিসের ক্রীতদাসরূপে জীবন আরম্ভ করেন। লেখক মীনহাজউদ্দিন সিরাজ ইহার কাছে নানা অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি বে-আইনী-ভাবে ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন তথাপি নানা উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তিনি সুলতানা রাজিয়ার নিকট হইতে লক্ষ্ণাবতী ও বিহারের শাসনকর্তারূপে স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। তিনি যতদূর সম্ভব দিল্লীর রাজনৈতিক অস্থিরতা হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতেন। তিনি যখনই যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতেন তাহার প্রতি তখনই আনুগত্য প্রকাশ করিতেন। এইভাবে দিল্লীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তিনি বঙ্গদেশে একটি আগ্রাসী রাজ্যবিস্তার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর সৈন্য, অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন এমন কি বেশ শক্তিশালী একটি নৌবহরও গঠন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনের সীমানা সুলতান আইওয়াজ খিলজীর মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত ছিল।

দিল্লীর সিংহাসনে ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন মামুদশাহ আরোহন করিবার পর সুলতান তুগরল তুগান তাহার রাজ্য জয় শুরু করেন। তিনি নদীপথে এলাহ-বাদ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার সহিত মীনহাজউদ্দিনের দেখা হয় এবং তিনি তাহাকে সেই সময়ে লক্ষ্ণাবতীতে লইয়া আসেন।

তুগরল খান-এর স্বপ্ন ছিল পূর্ব ভারতে একটি অখণ্ড মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এলাহবাদ হইতে বিজয়গর্বে লক্ষণাবতী ফিরিয়া আসিবার পরে তাহার সেই স্বপ্ন ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে জাজনগরের অধিপতি তুগরলের রাজ্য আক্রমণ করিতে শুরু করেন। এই সময়ে উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তৃতীয় অনঙ্গভীমের পুত্র প্রথম রাজা নরসিংদেব। ইনি পিতার মৃত্যুর পর (১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তুগরল সৈন্য ও নৌবহরসহ উত্তরভারত অভিমুখে অভিযান করার সুযোগে তিনি রাঢ়ের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশের সীমান্ত আক্রমণ শুরু করেন। এই অভিযানে তিনি যথাসম্ভব দক্ষিণ রাঢ়ের বীরভূম জেলার 'নাগর' অঞ্চলে অবস্থিত শক্তিশালী তুর্কীবাহিনীর কোন রকম সন্দেহ উদ্রেকের কোন সুযোগ দেন নাই এবং এই কারণে তিনি তাহার অভিযানকে ভাগীরথীর পূর্বদিকেই সীমাবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন। এই অঞ্চল খিলজী শাসন-এর প্রথম হইতেই মাঝে মাঝে আক্রান্ত হইত এবং সুলতান গিয়াসুদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর পর (১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ) এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে আর কোন মুসলমান সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ফলে সপ্তগ্রাম এবং নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অর্ধস্বাধীন হিন্দুশাসকদের অধিকার তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বভাবতই এই সকল স্থানীয় শাসকরা শক্তিশালী উড়িষ্যা রাজ্যের উত্তরদিকে সম্প্রসারণশীল অভিযানকে কোন বাধা দেয় নাই। কারণ এই শক্তিশালী উড়িষ্যারাজই তুর্কীদের সম্প্রসারণের পথে প্রধান বাধা হইবে তাহারা তাহা ভাল-ভাবে বুঝিয়াছিলেন। তুগরল তুগান এই আগ্রাসী নীতির প্রতি প্রথমটা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু যখন উড়িষ্যার রাজ্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত জয় করিতে করিতে লক্ষ্মণাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন (১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) তখন তাহার চেতনার উদয় হইল। তিনি অবিলম্বে এই বিপদের মোকাবিলা করিবার জন্য সৈন্য ও রণতরীসহ বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার সৈন্য ও রণতরী দক্ষিণ দিকে অজয় ও দামোদর যখন অতিক্রম করিল তখন উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনীর পশ্চাৎ ধাবন করিয়া বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সোনামুখীর পাঁচমাইল দক্ষিণ পূর্বে "কাটাসিন" দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে তুর্কী সৈন্যরা আক্রমণ চালাইতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধে তাহারা খুব সুবিধা করিতে পারে নাই। তবে উড়িষ্যা বাহিনীর বিরুদ্ধে সামান্য বিজয়েও তুর্কী বাহিনী খুবই উল্লসিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় তাহারা আয়াসে গা ঢালিয়া দিয়া যখন মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করিতেছিল ঠিক সেই সময়ে উড়িষ্যাবাহিনীর আক্রমণে মুসলমান সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে মীনহাজউদ্দিন অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন

এবং তিনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন হিন্দুসৈন্য কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণের কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কাননগো মনে করেন মাত্র কয়েকজন হিন্দুসৈন্য কর্তৃক মুসলমান বাহিনী বিপর্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যা বাহিনীর নিপুণ সমরনীতিই মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান ও প্রকৃত কারণ। তিনি মনে করেন উড়িষ্যাবাহিনী বিনা যুদ্ধে চতুরতার সহিত প্রথম অবস্থায় পিছু হটিয়া যাইবার সময় মুসলমান বাহিনীকে তাহাদের সীমান্ত হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছিল এবং গোপনে তাঁহারা অনেক সৈন্য পশ্চাতেও মোতায়েন করিয়াছিল। পশ্চাত হইতে এই সৈন্যবাহিনীর আক্রমণও তাহাদের পরাজয়ের আরও একটি কারণ।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। তুগরল তুগান খান দ্রুতগতিতে রাজধানীতে ফিরিয়া তাহার দুইজন বিশ্বস্ত অনুচরকে (শরফ-উল-মুল্ক-অল্-আসরি এবং কাজি জালালুদ্দিন ভাসানি) দিল্লীর সুলতানের নিকট উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন করেন। তাহার এই আবেদন দিল্লীর সুলতান মঞ্জুর করেন এবং কারা মানিকপুরের শাসক মালিক "কারাকাস" খান ও অযোধ্যার শাসক মালিক "তমর" খানকে লক্ষ্মণাবতীর শাসককে উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য আদেশ দেন। জাজনগরের রাজা লাখনোর শাসক "ফকর-উল-মুল্ক-করিমুদ্দিন লাঙ্গোরী"-সহ অনেক মুসলমানকে হত্যা করিয়া এই অঞ্চল অধিকার করেন। এইভাবে রাঢ়ভূমিতে মুসলমান শাসন লোপ পায় এবং তাহা উড়িষ্যার জাজনগর রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এইবার জাজনগরের রাজা বিপুল সৈন্য ও হস্তি-বাহিনীসহ বরেন্দ্র অভিযান করিয়া লক্ষ্মণাবতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। এই অবস্থায় তুগরল খানকে লক্ষ্মণাবতীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যেদিন উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনী লক্ষ্মণাবতীর শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছিল, ঠিক তাহার পরদিন খবর পাওয়া গেল যে উত্তর ভারত হইতে বিপুল সৈন্যদল লক্ষ্মণা-বতীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সৈন্যবাহিনীর আগমন বার্তা সঠিক হইলেও তাহারা কিন্তু তখনও লক্ষ্মণাবতী হইতে বেশ কয়েকদিনের পথ দূরে ছিল। সম্ভবতঃ অবরুদ্ধ মুসলমান সেনাবাহিনীর মনোবল সঞ্চার করিবার জন্য তখন তাহাদের আগমন বার্তা এইভাবে প্রচার করা হইয়াছিল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনী দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইবার ভয়ে লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

এই অবস্থায় অবশ্য তুগরল খান-এর বিপদ কাটিল না, তিনি এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন। এই সময় দিল্লী ও লক্ষ্মণাবতীর সৈন্যবাহিনী মিলিতভাবে

উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইল। তুগরল খান ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যেহেতু উড়িষ্যার বাহিনী লক্ষ্মণাবতী ছাড়িয়া গিয়াছে সেই হেতু দিল্লীর বাহিনীও দিল্লীতে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু মালিক তমন-খান-ই-কিরান তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বরং তুগরল তুগন খানকে বিতাড়িত করিয়া লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া তুগরল খান-এর দুর্গ অবরোধ করেন। ফলে উভয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সর্বদাই সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয় এই ব্যাপারে তমর খান কিন্তু দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের অসন্তোষের ভয় করিলেন না। দীর্ঘদিন এই দ্বন্দ্ব চলিবার পর ঐতিহাসিক মীনাহাজুদ্দিনের মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে তুগরল খানকে তাহার ধনসম্পদ হস্তি ও অনুচরসহ লক্ষ্মণাবতী হইতে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইল। তাহার সঙ্গে মালিক কারাকাস খান, মালিক তাজউদ্দিন ও ঐতিহাসিক মীনহাজউদ্দিনও সপরিবারে দিল্লী চলিয়া যান। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন মামুদ শাহ এতই দুর্বল ছিলেন যে তিনি তমর-উদ্দিন-খানকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোন শাস্তি দিতে পারেন নাই। এবং তুগরল খানের প্রতি অবিচারের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দিন মামুদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তুগরল তুগান খানকে অযোধ্যার শাসক নিয়োগ করেন। এখানে ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। একই বছর একই দিনে ঘটনাচক্রে লক্ষ্মণাবতীতে তমর খানেরও মৃত্যু হয়। তমর খান দুই বছর বে-আইনীভাবে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকাজ চালাইয়া ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে নূতন কোন রাজ্য জয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

উড়িষ্যার রাজা নরসিংহদেব লক্ষ্মণাবতী জয় করিতে না পারিলেও দীর্ঘ ১০ বছর তুর্কী শাসকগণ বঙ্গদেশে অধিকৃত অঞ্চল হইতে তাঁহাকে সরাইতে পারে নাই। বঙ্গদেশে নরসিংহদেবের রাজ্যসীমা উত্তরে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ সমগ্র রাঢ় অঞ্চল যাহা তিনি জয় করিয়া ছিলেন তাহার সমস্তই তাহার অধিকার ছিল। কেন্দুয়া পাটনা তাম্রশাসন হইতে নরসিংহদেবের রাজ্যের উত্তর সীমা গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই তথ্য পাওয়া যায়।

তমরউদ্দিনের মৃত্যুর পর বঙ্গ ও বিহারের শাসনভার মালিক জালালউদ্দিন মামুদ শাহের পুত্র মালিক আলাউদ্দিন জানিকে দেওয়া হয়। তিনি ১২৪৭-১২৫১ খ্রীষ্টাব্দ এই চার বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাহার রাজত্বের কোন

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই। তিনি নিজে এক শিলালিপিতে (মালদহ জেলার গঙ্গারামপুরে অবস্থিত) মালিক-উস-শাক এর সহিত 'শাহ' উপাধিও গ্রহণ করেন। এই উপাধি গ্রহণ করিয়াও তিনি দিল্লীর সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেন নাই, কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার জন্যই তিনি এই উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতে সাহস পাইয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাহার মৃত্যুর পর অযোধ্যার শাসক মালিক ইখতিয়ার-উদ্দিন-ইউজবাক লক্ষ্মণাবতীর শাসক নিযুক্ত হন। তিনি দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে দুইবার বিদ্রোহ ঘোষণা করা সত্বেও প্রধান উজির বলবনের স্নেহভাজন থাকায় তাহাকে দুইবার ক্ষমা করা হয়। মীনহাজের মতে তিনি ছিলেন দিল্লীর প্রতি বিদ্রোহী ভাবাপন্ন শাসক। তবে তিনি অত্যন্ত সাহসী, সমর নিপুণ ও সুশাসক ছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন আইওয়াজ-খিলজীর পর তিনি আবার তুর্কী রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দেন এবং বেশ সাফল্য অর্জন করেন। এই সময় উড়িষ্যার রাজা প্রথম নরসিংহ-দেবের একজন সামন্ত (শবনতর) বর্তমান হুগলী জেলার উত্তর পূর্বে অবস্থিত গড় মান্দারনে রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই ইউজবাক-এর পক্ষে দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল হইতে হিন্দুদের বিতাড়ন খুব সহজসাধ্য হয় নাই। তিনি পর পর ইঁহাদের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। প্রথম দুইটি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিলেও তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হন এবং ইহাতে তাহার প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু তিনি তুগরল খানের মত ভুল না করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে দিল্লীর দরবারে সাহায্যের আবেদন করেন। কিন্তু সেই সময়ে দিল্লীতে খুবই বিশৃঙ্খল অবস্থা চলিতেছিল, সুতরাং সেখান হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। তিনি তাহার সৈন্যবাহিনীকে নূতন ভাবে সংগঠিত করিলেন এবং তাহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে বিরত থাকিলেন। হিন্দু সৈন্যবাহিনীতে অনেক হস্তি ছিল এবং সেই যুগে এক একটি হস্তিকে ৫০০ জন অশ্বারোহীর সমান মনে করা হইত। তাহার অশ্বারোহী বাহিনী ছিল অত্যন্ত দক্ষ ও সুশিক্ষিত। সেই জন্য তিনি সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়া পশ্চাত দিক হইতে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া হস্তিবাহিনীকে ঘায়েল করিতে লাগিলেন। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিয়া ইপ্সিত ফল লাভ করেন এবং হিন্দু সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া গড় মান্দারন অধিকার করেন। রাজধানী হস্তগত হইলেও তিনি কিন্তু এখানকার শাসককে বন্দী করিতে পারেন নাই।

তবাকৎ-ই-নাসিরীর মতে মান্দারনের শাসক ছিলেন শবনতর। তিনি তাহাকে উড়িষ্যারাজের জামাতাও বলিয়াছেন। ছাটেশ্বর লিপিতে উড়িষ্যা

রাজের 'বিষ্ণু' নামে এক মন্ত্রীর প্রতি প্রচুর প্রশংসা বাক্য উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ এই কারণে মনে করেন শবনতর ও বিষ্ণু একই ব্যক্তি। উড়িষ্যার গঙ্গ-রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয়। সেজন্য ব্রাহ্মণদের সহিত তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা খুবই কম। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে মীনহাজ ভুল করিয়া বিষ্ণু ও শবনতরকে উড়িষ্যারাজের জামাতা বলিয়াছেন। আসলে তিনি খুব সম্ভবতঃ উড়িষ্যারাজের রাঢ় ও বরেন্দ্র অভিযানের একজন অন্যতম নায়ক ছিলেন।

দক্ষিণ রাঢ় জয়ের ফলে বঙ্গদেশের মুসলমান রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা লক্ষণা-বতী হইতে মান্দারন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বিজয়ে উল্লসিত হইয়া সুলতান ইউজবাক 'মুঘিজুদ্দিন' উপাধি লইয়া তৃতীয় বারের মত বিদ্রোহ করেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে তিনি লক্ষণাবতী টাকশাল হইতে একটি বিশেষ রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি হইলেন বঙ্গদেশের প্রথম তুর্কীশাসক যিনি প্রকাশ্যে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করিলেন।

দিল্লীতে তখনও অরাজকতা চলিতেছিল এবং এই অবস্থার সুযোগে মুঘিজুদ্দিন অযোধ্যা প্রদেশও অধিকার করিয়া নেন। এইভাবে তিনি লক্ষণাবতী, বিহার ও অযোধ্যার শাসক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর রাজনৈতিক অরাজকতার সুযোগে তিনি কামরূপও অভিযান করেন। মুসলমান শাসকদের কামরূপ অভিযান পূর্বেও ব্যর্থ হইয়া ছিল এবং এইবারও ব্যর্থ হইল এবং এই যুদ্ধেই গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি সপরিবারে বন্দী হন এবং সেই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হয় (১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

মুঘিজুদ্দিন বিদ্রোহী হইয়াছিলেন বলিয়া দরবারে ঐতিহাসিকগণ তাহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। তিনি একজন সাহসী বীর ও সমর কুশল নরপতি ছিলেন সে বিষয় সন্দেহ নাই। তিনি পুনরায় উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনীর হাত হইতে সমগ্র রাঢ় অঞ্চল উদ্ধার করেন লক্ষণাবতীর রাজ্যসীমা বর্তমান মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেন। পরবর্তী কালে এই অঞ্চলকে ভিত্তি করিয়াই পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে সেন রাজাদের বিরুদ্ধে মুসলমান শাসনের সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

মন্দারন পর্যন্ত মুসলমান রাজ্যের যে সীমা প্রসারিত হইয়াছিল তাহা প্রায় স্থিতিশীল থাকে এবং এখান হইতে পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকেরা উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

সুলতান মুঘিজুদ্দিনের কামরূপে শোচনীয় মৃত্যুর পর লক্ষণাবতী সুলতানরা

দিল্লীর সুলতানের প্রতি অনুগত্য প্রদর্শন করে। প্রথম মালিক মুঘিজুদ্দিন-বলবন-ই-ইউজাবেকী লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন দখল করেন। তিনি একজন সাহসী মালিক ছিলেন যিনি দুর্ধর্ষ মামুদ জানির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ মুঘিজুদ্দিনের স্বজাতিও ছিলেন। তিনি দিল্লী সুলতানের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রায় দুই বৎসর স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া ছিলেন। যদিও তিনি সর্বদাই সুলতান নাসির-উদ্দিনের নাম মুদ্রায় ব্যবহার করিতেন, তিনি শাসনের শেষ বছর দিল্লীর সুলতানকে দুইটি হস্তি ও অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তাহার শাসন কালে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পূর্ববঙ্গ অভিযান। এই অভিযানের সময় তিনি রাজধানী অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং ২৩ বছর পূর্বে সুলতান গিয়াসুদ্দিন আইওয়াজ খিলজীর মতই তিনি ও শত্রু কর্তৃক পরাজিত, বন্দী ও নিহত হন। লক্ষ্মণাবতী এই সময়ে যাহারা দখল করিয়া ছিলেন তাহাদের নায়ক ছিলেন মালিক তাজুদ্দিন-আসরাল খান। তিনি খোরাজিমের একজন আমীরের পুত্র ছিলেন এবং শৈশব অবস্থায় বন্দী হইয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে মীহাজুদ্দিনের বর্ণনা এখানেই শেষ। পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন-বারুণী তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই কাজেই এই সময়কার ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস খুব সুস্পষ্ট নহে। নূতন শাসকের সময় মুদ্রা ও তাহার সময়ে বিশেষ কোন আলোকপাত করে নাই। তিনি একজন স্বাধীন সুলতানের ন্যায় লক্ষ্মণাবতী ও বিহার শাসন করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র তাতার খান সিংহাসন হস্তগত করেন। তিনি একজন সাহসী, উদার এবং সৎশাসক ছিলেন। তিনি দিল্লীর সুলতান নাসির-উদ্দিনের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বলবন শাসনভার গ্রহণ করিলে তিনি অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর সহিত ২৩টি হস্তি উপহার দান করেন। তাহার প্রেরিত ব্যক্তিদের দিল্লীর দরবারে প্রভূত সম্মান দেখানো হয়। বলবনের শাসনভার গ্রহণ করিবার দুই বছর পরে সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর শের খাঁ নামক ঐ পরিবারের একজন শাসন-ভার দখল করেন। তিনি কতদিন শাসন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় নাই। তবে তাহার মৃত্যুর পর সুলতান বলবন আমিন খান নামক একজনকে লক্ষ্মণাবতীর শাসক হিসাবে পাঠান। একই সঙ্গে বলবান তুগরল খান নামক এক ব্যক্তিকে তাহার সহকারী শাসক হিসাবে বঙ্গদেশে নিযুক্ত করেন। শের খান সম্ভবতঃ চার বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্বকালে

বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের সীমা পূর্ববঙ্গের খানিকটা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের সেন রাজারা তখন পদ্মা নদীর উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইতেছিল। পশ্চিম দিক হইতে মুসলমান আক্রমণ ও দক্ষিণ দিক হইতে মগধের আক্রমণে এবং বর্তমানে বরিশাল জেলার চন্দ্রদ্বীপে স্বাধীন শাসকের আবির্ভাবে একাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পূর্ববঙ্গের সেন রাজাদের ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। বলবনের শাসনকালেইপ্রথম লক্ষ্মণাবতীতে একজন সহকারী প্রদেশপাল নিয়োগের সংবাদ পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে বলবনী শাসন ব্যবস্থার সূচনা

তুগরল ছিলেন সফলকাম মামলুক সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অতি সাধারণ ক্রীতদাস অবস্থা হইতে নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার চরিত্রে তুর্কীসুলভ অনেকগুলি গুণ ছিল। অদম্য সাহস, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দুঃসাহসিক বীরত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অপারসাম উচ্চাভিলাস তাহার চরিত্রের মধ্যে বিরাজমান ছিল। বলবনের লক্ষ্মণাবতীতে প্রদেশপাল ও সহকারী প্রদেশপাল নিযুক্তি তাহার কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচায়ক। কারণ তিনি জানিতেন লক্ষ্মণাবতীর শাসকেরা সবদাই বিদ্রোহ করিতে উৎসুক। সেজন্য বিদ্রোহ প্রবণ প্রদেশ লক্ষ্মণাবতীতে তাহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী করিবার নিমিত্ত তিনি সহকারী নিয়োগের পন্থা উদ্ভাবন করেন। অবশ্য বলবনের এই পদ্ধতিও শেষ পর্যন্ত বিশেষ সফল হয় নাই।

বঙ্গদেশের নূতন শাসক আমিন খান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাহার শাসনকালে তাহার সহকারী তুগরল খানই ছিলেন প্রকৃত শাসন ক্ষমতার মূল উৎস। তুগরল খান দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দুইবার দিল্লী বাহিনীকে পরাজিত করেন। মনে হয় তুগরল খান বঙ্গদেশে আসার কিছুদিন পরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাহার উদ্ধতন শাসক আমিন খানকে বিতাড়িত করিয়া দেন। বারুণী তাহার তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে বলিয়াছেন বঙ্গদেশে সর্বদাই বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল এবং দিল্লীর লোকেরা বঙ্গ দেশকে "বলগামপুর" বা "বিদ্রোহী এলাকা" নামে অভিহিত করিতেন। বারুণী আরও বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশের আবহাওয়া বিদ্রোহের অনুকূল ছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে জানা যায় তুগরল খান লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করার দিকে মনযোগ দিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রস্তুত হন। প্রথমে তিনি পূর্ববঙ্গ অভিযান করেন এবং সেখানে তিনি সোনার গাঁও

অঞ্চলে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন। বারুনী ইহাকে "তুগরলের কেল্লা" নামে অভিহিত করেন। এই ঘটনার পূর্বেই বিক্রমপুরের সেন রাজাদের পতন ঘটিয়াছিল। তিনি রাঢ় অঞ্চলেও রাজ্যসীমা বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান প্রেরণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার জাজনগরে অভিযান প্রেরণ করেন। তখন জাজনগর রাজ্য উত্তরে ছোটনাগপুর হইতে দক্ষিণে ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটামটিভাবে এই এলাকার মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সব আক্রমণের ফলে তিনি বিপুল ধনরত্ন ও কিছু হস্তি করায়ত্ব করেন। তাহার বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হইল তিনি এই অধিকৃত সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ দিল্লীর সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন নাই। এই সময়ে সম্ভবতঃ তিনি আমিন খানকে লক্ষ্মণাবতী হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজে শাসনক্ষমতা অধিকার করেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন সীমান্ত অঞ্চলে মোঙ্গল আক্রমণে বিব্রত থাকায় বঙ্গদেশের প্রতি সঠিক নজর রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই সময়ে পাঞ্জাব অঞ্চলে সুলতান বলবন খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িলে সেই সময় তাহার মৃত্যু সংবাদ রটিয়াছিল। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াই তুগরল খান স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান মুঘিজুদ্দিন উপাধি গ্রহন করেন। রোগমুক্তির পর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন তুগরল খানকে দিল্লীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সুযোগ দিয়াছিলেন কিন্তু আনুগত্য প্রকাশে তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। তিনি বরং স্বসৈন্যে দিল্লীবাহিনীর সহিত মোকাবিলা করিবার জন্য বিহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নিজের নামে খুৎবা পাঠ করিয়া ও মুদ্রা প্রচলন করিয়া তুগরলের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে বলবন খুবই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তিনি তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন (১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এই সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন অযোধ্যার শাসন-কর্তা মালিক তুরমতি। উভয়পক্ষের যুদ্ধে দিল্লীর সেনাবাহিনী পরাস্ত হইল। তাহাদের অনেকে সুলতান বলবনের ভয়ে দিল্লী ফিরিয়া না গিয়া তুগরল খানের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই ব্যর্থতায় বলবন তুরমতিকে নৃসংশভাবে হত্যা করেন।

পরবর্তী বছর নূতন এক সেনানায়কের নেতৃত্বে তুগরলের বিরুদ্ধে আর একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ এই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন বাহাদুর। কিন্তু এই সেনাবাহিনীরও তুগরলের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। এইবার ক্ষুব্ধ সুলতান নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই অভিযান প্রেরণ করিতে গিয়া সুলতান বলবন প্রায় তিন বৎসর

দিল্লীতে অনুপস্থিত ছিলেন। এই অভিযানের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি তাহার উদ্দেশ্য গোপন করিয়া প্রথমে তাহার যাত্রা শুরু করেন এবং এই অভিযানে তিনি তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। পথিমধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে করিতে তিনি এক বিপুল সৈন্যবাহিনীসহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। তুগরল সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনকে ভাল করিয়া চিনিতেন। তিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন সুলতানের নিকট হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এই সময় বর্ষা সমাগত প্রায়। বলবন দ্রুতগতিতে সরযূ নদী অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহার এই বিপুল স্থল ও নৌবাহিনী সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয় মনে করিয়া তুগরল খান পরিত্যাগ করিলেন। এখানকার অনেক প্রধান নাগরিকও তাহার সহিত পলায়ন করিল। বারুণীর মতে তুগরল খান উড়িষ্যার জাজনগরের দিকে পলায়ন করেন এবং লক্ষ্মণাবতী হইতে একদিনের দূরত্বে একটি শুষ্ক জায়গায় শিবিরস্থাপন করেন। এই স্থানটি অনেকের মতে বীরভূম জেলার কোন একটি অঞ্চল। বলবন যখন লক্ষ্মণাবতীর নিকটে পৌঁছিলেন তখন তুগরল খান পুনরায় জাজনগরের দিকে যাত্রা করেন। পরিত্যক্ত লক্ষ্মণাবতী শহরে বলবন ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি উপস্থিত হন এবং কিছুকাল সেখানে বিশ্রামের পর তিনি বারুণীর মাতামহ সিপাহশালার হিসামুদ্দিনকে লক্ষ্মণাবতীর শাসক নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি একদল সৈন্যসহ তুগরলের পশ্চাৎ অনুসরণ করেন।

বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথমটি ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষাকালে সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁওর নিকটবর্তী কোন স্থানে। এই যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা না করিতে পারিয়া তুগরল গোপনে স্ত্রী, পুরুষ ও ধনসম্পদসহ জাজনগরের দিকে দ্রুত পলায়ন করেন। বলবন এই খবর পাওয়া মাত্র ক্ষিপ্রগতিতে অল্পসময়ের মধ্যে জাজনগরের সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। এইবার বলবন তুগরলকে তাহার সমস্ত সৈন্যসহ তাড়া না করিয়া অন্য এক নীতি অবলম্বন করেন। তিনি মালিক "বেকতুর"-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলসহ তুগরলের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। তিনি সৈন্যদলকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া তুগবলের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে প্রেরণের আদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপ একটি ক্ষুদ্রবাহিনী কর্তৃক আত্মগোপনকারী তুগরলের সেনাবাহিনী আবিষ্কৃত হইল এবং দিল্লীর সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণে তুগরল পরাজিত ও নিহত হইলেন। সুলতান বলবন প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং প্রতভূ

পরিমাণে বন্দীসহ বিজয়গর্বে লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি লক্ষ্মণাবতীর রাস্তার দুইধারে ফাঁসির মঞ্চ স্থাপন করিয়া তুগরলের জামাতা, মন্ত্রী, ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি সকলকে নির্বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহার এই নৃসংশ শাস্তি বিধান তাহার অনুচরদের মধ্যেও বিরক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল।

বলবন আরও কিছুদিন লক্ষ্মণাবতীতে থাকিয়া বঙ্গদেশের শাসন-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করেন এবং তাহার কনিষ্ঠপুত্র বুগরা খানকে বিশেষ রাজকীয় উপাধি-সহ এখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রায় তিন বছর অনুপস্থিত থাকার পর তিনি পুনরায় দিল্লী গমন করেন। চার বৎসরের মধ্যে বলবন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার পুত্র বিদ্রোহী তুগরলের মত কম অকৃতজ্ঞ নয়। বঙ্গদেশকে দিল্লীর কঠিন শাসনে আনিবার তাঁহার প্রচেষ্টা সে জন্য ব্যর্থ হইয়াছিল বলা চলে।

বলবনী বংশধরদের শাসন (১২৮২-১৩২৮)

মুঘিজুদ্দিন তুগরলের মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় ৪৬ বছর বঙ্গদেশের শাসন ক্ষমতা সুলতান বলবনের বংশধরদের অধিকারে ছিল। সুলতান বুগরা খান ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে পিতা কর্তৃক বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত হন। পিতার জীবিত অবস্থায় প্রথম চার বৎসর তিনি দিল্লীর অধীনস্থ সুলতানরূপে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন। এই যুগের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বোধ হয় কোন সমসাময়িক লিখিত বিবরণের অভাব। ফলে এই সময়কার মুদ্রাই একমাত্র সঠিক দিক নির্দেশক। বুগরা খান সুমানা অঞ্চলের প্রদেশপাল হিসাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার জীবনের প্রথম অবস্থার কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি ছিলেন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। ফলে চারিপার্শ্বে যাহা ঘটিতেছে তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। বলবন তাহার পুত্রকে শাসনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন সহকারী আমীরকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের দুইজনেরই নাম ছিল ফিরোজ। একজন জাতিতে খিলজী, যিনি "কারকোন্দরাই" বা উত্তম বিবেচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপরজন "কোহ-ই-যুদের" অধিবাসী, তিনি "কিস্‌ওয়ার-ই-কাস" বা রাজ্য বিজয়ীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাতে বোঝা যায় সুলতান বুগরা খানকে সাহায্য করিবার জন্য একজন সমর বিশেষজ্ঞ ও একজন রাজনীতিবিদকে লক্ষ্মণাবতীতে রাখিয়া যান। লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করিবার পূর্বে বলবন পুত্রকে নানা উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি কিন্তু পিতার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত আরামে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। কারণ তাহার বিচক্ষণ সেনানায়কেরা সুষ্ঠুভাবেই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। এই সময়ে বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। পুত্র শোকে মুহ্যমান সুলতান একমাত্র পুত্র বুগরা খানকে তাহার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসার জন্য ডাকিয়া পাঠান। পিতার আদেশে দিল্লীতে গিয়া দুই মাস থাকিবার পর তিনি অধৈর্য হইয়া পুনরায় লক্ষ্মণাবতীতে পলায়ন করেন। তাহার কয়েক মাস পরে বৃদ্ধ সুলতান বলবনের মৃত্যু হয় (১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)। পিতার বিনা অনুমতিতে লক্ষ্মণাবতীতে চলিয়া আসায় নিরাশ হৃদয়ে বলবন মৃত্যুর পূর্বে তাহার মৃত পুত্র মহম্মদের নাবালক পুত্র কাই খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু দিল্লীর উজির নিজামুদ্দিন পরলোকগত সুলতানের মনোনয়নকে নাকচ করিয়া বুগরা খানের ১৮ বছরের পুত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসাইলেন। এদিকে বুগরা খান পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া এক সপ্তাহ শোক পালন করেন এবং তাহার ঠিক পরেই নাসির-উদ্দিন মামুদ এই উপাধি গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। এইভাবে লক্ষ্মণাবতী ও দিল্লীতে পিতা ও পুত্র একই সঙ্গে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন।

কাইকোবাদকে সুলতান বলবন অত্যন্ত কঠিন শাসনে রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। তিনি মদ্যপান ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হইয়া দিন কাটাইতে থাকেন। রাজ্য শাসনে তাহার কোন আগ্রহ ছিল না। পুত্রের এই সমস্ত আচরণে বুগরা খান অত্যন্ত মর্মাহত হন। প্রথমে চিঠির মারফৎ পুত্রের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি একটি সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সংবাদ পাইয়া কাইকোবাদও পিতার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সরযূ নদীর উভয় তীরে দুইপক্ষের শিবির স্থাপিত হইল। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু কাইকোবাদের সহিত সরযূ নদীর তীরে আগমন করেন। তিনি পিতা-পুত্রের মিলন সম্পর্কে একটি কাব্য রচনা করেন।

পিতা-পুত্রের মিলনের পর লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিবার পূর্বে বুগরা খান কাইকোবাদকে প্রকাশ্যে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। দিল্লী ফিরিয়া গিয়া কাইকোবাদ পিতার সকল উপদেশ ভুলিয়া যান, কিন্তু নিজামুদ্দিন সম্পর্কে সকল উপদেশ মনে রাখেন। সেজন্য ছয় মাসের মধ্যে নিজামুদ্দিনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

ইহাতে শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইহা দূর করিবার জন্য তিনি জালাল-উদ্দিন-ফিরোজ-খিলজীকে দিল্লীতে লইয়া আসেন। ইহাতে বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ দিল্লীর ইলবারি তুর্কী ও খিলজীদের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। কাইকোবাদের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুত্র তাইমুরকে শামসুদ্দিন উপাধিসহ সিংহাসনে বসান হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরে তাহাকেও হত্যা করা হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সুলতান নিজেও প্রাণ হারাইলেন এবং ইলবারি তুর্কীদের পরাস্ত করিয়া খিলজীরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

দিল্লীর এই শোচনীয় সংবাদে (পুত্র ও পৌত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ) বুগরা খান খুবই মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং তিনি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু গোলাম হোসেন সেলিমের মতে তিনি দিল্লীর খিলজী আক্রমণের ভয়ে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কাইকাসকে সিংহাসন দান করিয়া চলিয়া যান। ইহার পর বুগরা খান কতদিন বাঁচিয়া ছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। তবে মনে হয় তিনি সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ কর্তৃক লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন অধিকারের অনেক পূর্বেই মারা গিয়াছিলেন।

কাইকোবাদ সাহসী সেনাপতি ছিলেন না। তিনি উপদেষ্টা হিসাবে ভাল, কিন্তু সেই হিসাবে কাজকর্ম করিতে পারিতেন না। ভাবপ্রবণতা ছিল তাহার চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেজন্য তিনি দিল্লীর সিংহাসন ছাড়িয়া লক্ষ্মণা-বতীতে শাসক হিসাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। বঙ্গদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি কবি সাহিত্যিকদের সমাদর করিতেন। কাইকোয়াসের মৃত্যু বা সিংহাসনচ্যুতির পরেই বঙ্গদেশের বলবনী বংশের শাসন শেষ হয়।

সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ

খিলজীরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার পর সেখানে মামলুক শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু বঙ্গদেশে তাহাদের শাসন আরও ৪০ বছর স্থায়ী হইয়াছিল। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সঠিক পরিচয় এখনও ঠিক জানা যায় নাই। ইবন বতুতা তাহাকে বুগরা খানের বংশধর বলিয়াছেন। মনে হয় ইহা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য নয়। তিনি সম্ভবতঃ বলবনের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। বলবন বুগরা খানকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ সুলতান কাইকোয়াসের রাজত্বকালে তাহার অধীনস্থ

বহারের শাসক ছিলেন। মনে হয় কাইকোয়াসের মৃত্যুর পর তিনি লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ তাহার এক পুত্র তাজ-উদ্দিন হাতিম খানকে বিহারের শাসনভার অর্পণ করেন। তাহার রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মুসলমান রাষ্ট্রশক্তি বর্তমান ময়মনসিং জেলা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্রের ওপারে আসাম ও সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার পুত্রদের ক্রমাগত বিদ্রোহের ফলে তাহার শাসনকাল খুবই বিপর্যস্ত হইয়া-ছিল। তাহার বিদ্রোহী সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন বাহাদুর। এই বাহাদুর এক সময় বিদ্রোহী হইয়া পিতাকে লক্ষ্মণাবতী হইতে বিতাড়িত করেন এবং নিজে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে বসেন এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি পিতাকে পূর্ববঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তাহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। শামসুদ্দিন ফিরোজশাহ কার্যকরীভাবে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উপর শাসন চালাইতে পারিয়া-ছিলেন। তাহার জীবনের সঙ্গে পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহানের বিষাদময় জীবনের কিছু সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন তিনি লক্ষ্মণা-বতী হইতে তাহার রাজধানী মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াতে স্থানান্তরিত করেন এবং সম্ভবতঃ ইহার নাম রাখেন ফিরোজাবাদ। এই অঞ্চলটি লক্ষ্মণাবতী অপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর এবং প্রতিরক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল। সেইজন্য বোধ হয় তিনি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যাহা পরবর্তীকালে বঙ্গের সুলতানদের স্বাভাবিক রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল।

শামসুদ্দিন ফিরোজশাহের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা তিনজন সমসাময়িক লেখকের বিবরণীতে পাওয়া যায়। ইহারা হলেন জিয়াউদ্দিন বারুণী, ইসামী এবং ইবন-বতুতা। শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শিহাবুদ্দিন বুগরা শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু তাহার ভ্রাতা গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ তাহাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। গিয়াসুদ্দিনের হাতে শিহা-বুদ্দিন বুগরা ছাড়া অন্যসব ভ্রাতাও নিহত হন। শিহাবুদ্দিন ও নাসিরুদ্দিন দিল্লীর তৎকালিন সুলতান গিয়াসুদ্দিনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শিহাবুদ্দিন বুগরা সম্ভবতঃ এই আবেদন পাইবার অব্যবহিত পরে পরলোকগমন করেন। কারণ ইহার পরে তাহার আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক এই আবেদনে সাড়া দিয়া তাহার পুত্র জুনা খানের উপর দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া সসৈন্যে বঙ্গদেশ অভিযান করেন। তিনি প্রথমে ত্রিহুত আক্রমণ করেন এবং সেখানে কর্ণাটক বংশের রাজা হরিসেনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া

ঐ রাজ্যে প্রথমে মুসলিম শাসন স্থাপন করেন। এইখানে নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম তাহার সহিত যোগদান করেন। এই বাহিনী লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া লইলে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ এই সময় পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিলেন। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে গিয়াসুদ্দিন দিল্লীর সৈন্যদের নিকট বন্দী হন। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বঙ্গদেশকে তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিমকে বঙ্গদেশের শাসনভার অর্পণ করেন এবং গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তাহার পালিতপুত্র তাতার খানকে সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও-এর শাসনভার দেন। বঙ্গদেশ হইতে বহু ধনদৌলত ও রত্নসহ তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন কিন্তু পথে এক দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর জুনাখান 'মহম্মদ শাহ' নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। ইনি ইতিহাসে মহম্মদ বিনতুঘলক নামে পরিচিত। তিনি বঙ্গদেশের শাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন করিলেন। লক্ষ্মণাবতী অঞ্চলের শাসনভার নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম শাহের অধীনে সম্পূর্ণ না রাখিয়া তিনি পিণ্ডার খিলজী নামে এক ব্যক্তিকে নাসিরউদ্দিনের সহকারী শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিয়া দিল্লী হইতে পাঠাইলেন। তিনি গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহকে বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি দিয়া সোনারগাঁও তাতার খানের সহকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। পরবর্তী কালে নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিমের খবর আর বেশী কিছু জানা যায় না।

গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ ১৩২৫-১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহরম খানের সহিত যুগ্মভাবে সোনার গাঁও অঞ্চল শাসন করেন। কিন্তু সুলতান মহম্মদ বিনতুঘলকের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার সুযোগে তিনি আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু বহরম খানের তৎপরতায় তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পর দশ বছর কদর খান, বহরম খান ও মালিক ইজ-উদ্দিন-আয়হা মহম্মদ তুঘলের অধীনস্ত শাসক হিসাবে লক্ষবতী, সোনার গাঁও ও সাত গাঁও শাসন করেন। এই দশ বছরের মধ্যে কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

History of Bengal গ্রন্থে Dr. K. R. Kanungo বঙ্গদেশের এই শাসনকালকে মামলুক বা দাস শাসনকাল রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আব্দুল করিম কাহুনগোর এই নামকরণকে সমর্থন করেন নাই। তাহার মতে এই সময়ের সকল শাসকরা দাস ছিলেন না। তাই সেই যুগকে পুরোপুরি দাসযুগ বা দাস আমল বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। তাহার মতে এই শাসন কালকে তুর্কী শাসন বলাই যুক্তিযুক্ত।

সূত্র নির্দেশ

১। History of Bengal, Vol. II (D.U.) (ed-J. N. Sarkar), 1972, Pages 1-29, 43-91

২। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭৩, পৃঃ ১-৩০

৩। বাংলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১, পৃঃ ১-৯৭

৪। বাংলার ইতিহাস (সুলতানি আমল), আব্দুলকরিম, ১৯৭৭, পৃঃ ৬৪-১৮৩

৫। History of Bengal (Middle age), Susila Mondal, Part I, 1970, Pages 33-129

৬। Muslim Administration in Orissa, M.A. Haque., 1980, Pages 3-14

৭। The Delhi Sultanate, Habib and Nizami, 1982, Pages 1135-1148

৮। The History of Medieval Bengal, R. C. Majumdar, 1974, Pages 5-21

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলিয়াস শাহী বংশের অভ্যুত্থান

(স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়)

বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল হইতে শেষ পর্যন্ত পর্যায়-ক্রমে ইহা একবার দিল্লীর অধীন হইয়াছে কখনও বা স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ কর্তৃক সুলতান গিয়াসুদ্দিন মামুদের পরাজয় পর্যন্ত মোট দুইশত বৎসর বঙ্গদেশ অবিচ্ছিন্নভাবে যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল তাহা অবিসংবাদিতভাবে একটি অতি গৌরবময় যুগ। এই সময় বঙ্গদেশের সুলতানগণ নিজস্ব যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম হইয়াছিলেন। তাহারা অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় অপরিসীম দক্ষতা দেখাইয়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন।

ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ

১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া যে বিবাদ শুরু হয় তাহাতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ। কিন্তু তাহার ভ্রাতারা দিল্লীতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সসৈন্যে ,বঙ্গদেশে আসিয়া গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ তুঘলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই সময়ে বঙ্গদেশ মহম্মদ-বিন-তুঘলক কর্তৃক তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া শাসিত হইতেছিল। এই তিনটি প্রশাসনিক বিভাগের একটি ছিল লক্ষ্মণাবতী, যাহার শাসক ছিলেন মালিক পিণ্ডার খিলজী (যাহাকে সুলতান সম্মানসূচক কদরখান উপাধি দিয়াছিলেন)। তাহার উজির ছিলেন হিসামুদ্দিন আবুরাজা। অপর অঞ্চলটি হইল সোনার গাঁও, যাহার শাসক ছিলেন সুলতানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাতার খান (যাহার উপাধি ছিল বহরাম খান)। তৃতীয় প্রশাসনিক অঞ্চলটি হইল সাতগাঁও, যাহারা শাসক ইজুদ্দিন য়াহয়া (যাহাকে আজম-উল-মুল্ক উপাধি দেওয়া হইয়াছিল)।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক কর্তৃক প্রবর্তিত এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কিছুদিন ভালভাবেই চলিয়াছিল। বন্দী বাহাদুর শাহ দিল্লী হইতে মুক্ত হইয়া বহরম খাঁয়ের সহিত যুগ্মশাসক হিসাবে সোনার গাঁওএ ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে তিনি বিদ্রোহী হইয়া বহরম খাঁয়ের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। এইবার বহরম খাঁ ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এককভাবে সোনারগাঁয়ে শাসন পরিচালনা করেন। এই বহরাম খাঁর তরবারীবাহক ছিলেন ফকরুদ্দিন। তিনি ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বহরাম খাঁর মৃত্যুর পর শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া দিল্লী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন।

তাহার স্বাধীনতা ঘোষণায় বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের শাসকগণ একত্রে মিলিতভাবে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন কদর খাঁ। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফকরুদ্দিন সৈন্যসহ রাজধানী হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। সোনারগাঁও আবার দিল্লী সুলতানের অধীনে চলিয়া গেল।

এদিকে লুণ্ঠিত প্রভৃত দ্রব্য সামগ্রী কদর খাঁ প্রথা অনুযায়ী সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ না করিয়া নিজেই হস্তগত করেন। এই সময়ে বর্ষার সুযোগে ফকরুদ্দিন গোপন আশ্রয়স্থল হইতে বাহিরে আসিয়া কদর খাঁকে অবরোধ করিলেন। অসন্তুষ্ট সৈন্যরা কদর খাঁকে বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে হত্যা করে। এইভাবে ফকরুদ্দিন পুনরায় সোনারগাঁও এর অধিকার ফিরিয়া পাইলেন। তিনি সাময়িকভাবে লক্ষণাবতীও অধিকার করিলেন এবং মুখালিশ নামক এক ব্যক্তিকে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তিনি মাত্র একবৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

ঠিক এই সময় কদর খাঁর মৃত্যুর পর তাহার একজন কর্মচারী মুবারক মুখালিশকে হত্যা করিয়া লক্ষণাবতী অধিকার করেন এবং রাজধানী লক্ষণাবতী হইতে পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। এই পাণ্ডুয়াই বঙ্গদেশের পরবর্তী ১০০ বছর রাজধানী ছিল।

কদর খাঁয়ের অধীনস্থ একজন কর্মচারী আলি মুবারক মুখালিশকে হত্যা করিয়া লক্ষণাবতী অধিকার করিল। তিনি দিল্লীতে মহম্মদ বিন্ তুঘলককে একজন শাসনকর্তা লক্ষণাবতীতে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। তুঘলক এক ব্যক্তিকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন, কিন্তু পৌছিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। এদিকে লক্ষণাবতীতে কোন শাসনকর্তা না থাকায় বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফকরুদ্দিনের আক্রমণকে রোধ করিবার উদ্দেশ্যে আলিমুবারক 'আলাউদ্দিন আলি শাহ' নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে লক্ষণাবতীর স্বাধীন শাসক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ লক্ষ্মণাবতী বেশীদিন নিজের অধিকারে না রাখিতে পারিলেও তিনি সোনার গাঁও সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশই স্বাধীন শাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র একবৎসর কয়েকমাস রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। ফকরুদ্দিন মুবারক শাহের ঠিক পরেই ইখতিয়ারউদ্দিন গাজিশাহ নামক এক ব্যক্তি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৩৩৯-৫২ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি সম্ভবতঃ মুবারক শাহের পুত্র ছিলেন। তাহার এক পালিত ভ্রাতা সেই সময় দিল্লী হইতে আসিয়া সম্ভবতঃ তাহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া সিংহাসন হইতে নামাইয়া শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)

সুলতান ইলিয়াস শাহের সিংহাসন আরোহনের মাধ্যমে বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নূতন পর্যায়ের সূচনা হয়। এই সময় উত্তর ভারতে মহম্মদ বিন তুঘলকের খামখেয়ালী রাজ্য পরিচালনার ফলে তাহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই সুযোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক শাসকেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নিজেদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় রত ছিলেন।

বঙ্গদেশের নূতন শাসক ইলিয়াস শাহ এই সুযোগে নিজের শাসনের অধিকারকে প্রসারিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। প্রথমে তিরহুত পরে নেপালেও তিনি অভিযান করিয়াছিলেন। বিহারের তিরহুত অঞ্চলের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইলেও নেপালে তিনি বেশীদিন থাকেন নাই। এই সমস্ত অভিযানে সাফল্যলাভ করিয়া তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নজর দিলেন।

তিনি পশ্চিমবঙ্গের সুবর্ণরেখা হইতে গোদাবরী পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অভিযান করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে প্রভূত ধনশালী অনেক হিন্দু রাজা তখন এই অঞ্চলে ছিল। তাহাদের এই ঐশ্বর্যের প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়, ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনারকের মন্দির ভাস্কর্যের মধ্যে। এই সমস্ত মন্দিরের ঐশ্বর্য দীর্ঘদিনই প্রতিবেশী বঙ্গদেশের মুসলমান সুলতানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু উড়িষ্যার শক্তিশালী পূর্ববঙ্গ রাজাদের (তৃতীয় অনঙ্গভীম, প্রথম ও দ্বিতীয় নরসিংহ প্রভৃতি) শৌর্যের ফলে প্রায় ১২৫ বৎসর ইহাদের কেহ আক্রমণে অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে এই ঐশ্বর্যশালী রাজ্যের বিরুদ্ধে ইলিয়াস শাহ

অভিযান করিলেন। তিনি সীমান্তের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া সৈন্যসহ চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তাহার সৈন্যবাহিনীর প্রতাপে উড়িষ্যার অভিজাতরা দূরে দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সুলতান উড়িষ্যা হইতে প্রচুর ধনরত্ন ও ৪৪টি হস্তি সংগ্রহ করিয়া বিজয়গর্বে ফিরিয়া আসিলেন।

ইলিয়াস শাহের এই অভূতপূর্ব সাফল্য সম্পর্কে অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন যে ঠিক একই সময়ে বিজয়নগরের রাজা বুক্কা রায়ও উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফলে সেই সময়ে উড়িষ্যা রাজ তৃতীয় ভানুদেবের পক্ষে এই উভয়দিক হইতে আক্রমণ প্রতিহত করা কোন মতে সম্ভব ছিল না। বর্তমান কালের একজন ঐতিহাসিক (P. Archaya) ইলিয়াস শাহের জাজনগর অভিযানকে গল্প বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই বিতর্কের বিস্তারিত বর্ণনা প্রয়োজনীয় নয়। ইলিয়াস শাহ ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও অধিকার করিয়া বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃস্থাপন করেন।

ইলিয়াস শাহের বিভিন্ন অভিযানের সাফল্য ও নানাদিকে রাজ্যবিস্তারের খবরে দিল্লীর নূতন সুলতান ফিরোজ তুঘলক খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল সৈন্যসহ ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সুলতানকে কোন প্রকার বাধা না দিয়া সৈন্যসহ বর্তমান মালদহ জেলার নিকটবর্তী একডালা নামক এক সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে ফিরোজ শাহ বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশের রাজধানী দখল করিয়া একডালা দুর্গ অবরোধ করেন।

তিনটি সমসাময়িক গ্রন্থে ইলিয়াস শাহের সহিত ফিরোজ শাহের সংঘর্ষের ঘটনা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটি জিয়াউদ্দিন বারুণী রচিত "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী", দ্বিতীয়টি শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ রচিত "তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী", তৃতীয়টি কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক রচিত ফিরোজ শাহের নির্দেশে রচিত "সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী"। তিনটিই ফিরোজ শাহের অনুগত লেখকদের লেখা। ইহাদের মতে কয়েকমাস অবরুদ্ধ থাকার পর উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধ বঙ্গদেশের সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফিরোজ শাহের অনুগত ঐতিহাসিকদের বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং ফিরোজ শাহই এই যুদ্ধে তেমন সুবিধা করিতে না পারিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাই মনে করেন। তবে এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক কালে কোন কোন ঐতিহাসিক বিভিন্ন নথিপত্রের সাহায্যে এই অনুমান

করিয়া থাকেন যে বঙ্গের সুলতান ইলিয়াস শাহ ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের আক্রমণকালে উড়িষ্যার গঙ্গরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দিক হইতে সাহায্য বা আক্রমণের আশঙ্কাতেই ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গের অবরোধ তুলিয়া লইলেন এবং দ্রুতগতিতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। মনে হয় বঙ্গদেশের সুলতানকে সাহায্য করিবার জন্য ক্ষুব্ধ সুলতান ফিরোজ শাহ পরে দিল্লী হইতে উড়িষ্যা অভিযান করেন। তবে এই যুদ্ধের ফলে ইলিয়াস শাহ সিংহাসন হারান নাই অথবা একডালা দুর্গ তাহার হস্তচ্যুত হয় নাই। ফিরোজ শাহ দিল্লী ফিরিবার পর উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ সালে বঙ্গদেশের সুলতান ফিরোজ তুঘলককে প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও বঙ্গদেশের স্বাধীনতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দিল্লীর সহিত এই যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের সেনাপতি ছিলেন সহদেব নামক একজন হিন্দু।

ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সহিত শান্তির সুযোগে কামরূপ রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান করিয়া কিছু অঞ্চল অধিকার করেন। পূর্বভারতে দিল্লীর সমান্তরাল একটি স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর হিসাবে ইলিয়াস স্বভাবতই দিল্লীর ঐতিহাসিকদের কটাক্ষের কারণ হইয়াছিলেন। তাহারা তাহাকে নেশাগ্রস্ত ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বলিয়াছেন। তবে এইসব নিন্দাসূচক বিশ্লেষণের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

হাজি ইলিয়াস শাহের সময়কার জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি হাজিপুরশাহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ফিরোজাবাদে (পাণ্ডুয়া) একটি বিশাল জলাশয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে দুইজন বিখ্যাত সুফিসন্ত তাহার রাজধানী আসিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে তিনি ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য প্রমাণে মনে হয় তাহার ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল।

সিকন্দর শাহ (১৩৫৭-১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)

সিকন্দর শাহ ইলিয়াস শাহের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী। সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি লিপি ও সমসাময়িক দিল্লীর ঐতিহাসিকদের উল্লেখ ছাড়া বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় নাই।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি সর্বপ্রথম নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করিবার প্রতি মনযোগ দিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লীর সহিত সদ্ভাব রাখার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবারই প্রচুর উপঢৌকনসহ দিল্লীর সুলতানের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন।

কিন্তু সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রথমবারে বঙ্গ অভিযানের বিফলতার ক্ষোভ কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। সোনারগাঁও-এর জনৈক আমীরের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে উত্তেজিত সুলতান বিপুল এক সৈন্যবাহিনী লইয়া দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ অভিযান করেন। পিতার অনুসৃত নীতি অনুসরণ করিয়া সিকন্দর শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুনরায় সুলতানের সেনাবাহিনী একডালা দুর্গ অবরোধ করিল। বেশ কয়েকমাস অবরুদ্ধ থাকার পর উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ফিরোজ তুঘলক বঙ্গদেশের স্বাধীনতা মোটামুটি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন ও উপঢৌকন বিতরণ করা হয়। সুলতান ফিরোজ ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষবারের মত সৈন্যসহ বঙ্গদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। এই ঘটনার পর প্রায় দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল আফগান অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত দিল্লী কর্তৃক বঙ্গদেশ আর আক্রান্ত হয় নাই।

সিকন্দরের শেষ জীবন মোটেই সুখের ছিল না। পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ও ষড়যন্ত্র তাহার শেষ জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

সিকন্দর শুধু একজন ধীর ও সুশাসক ছিলেন তাহাই নহে, তিনি শিল্পকলারও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজধানী পাণ্ডুয়ার নিকটে আদিনার বিখ্যাত মসজিদ তাহার শিল্প অনুরাগের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। তাহারই রাজত্বকালে বঙ্গদেশের আরও অনেক অঞ্চলে বহু শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তিনি পিতার ন্যায় মুসলমান সাধুসন্তদেরও ভক্ত ছিলেন।

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে দিল্লীর সহিত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ হইতে আরম্ভ করিয়া আলাউদ্দিন হোসেন শাহ পর্যন্ত বঙ্গদেশের সুলতানদের সম্বন্ধে দিল্লীর সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দ)

ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই বংশের প্রথম তিনজন সুলতান অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক ছিলেন। ইলিয়াস শাহ

ও সিকন্দর শাহ প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজেদের সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন। আজম শাহও পিতা এবং পিতামহের ন্যায়, বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধবিগ্রহে নহে অন্য কারণে। বঙ্গদেশের সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাহার মত আকর্ষণীয় চরিত্র খুব কমই আছে। লোকরঞ্জন ব্যক্তিত্বের দিক দিয়াও তাহার তুলনা হয় না। তাহার চরিত্রের নানা রকম বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হইয়াছিল।

তাহার রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল উত্তর-পূর্ব সীমান্তে হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান। ফিরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় তিনি জৌনপুরে সুলতানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভূটান সম্রাটের সহিতও তাহার দূত বিনিময় হইয়াছিল। ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনা দূতের সহিত মা-হুয়ান নামক একজন দোভাষীর বঙ্গদেশে আগমন হইয়াছিল। তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে সমসাময়িক বঙ্গদেশের এক মনোজ্ঞ চিত্র পাওয়া যায়। তিনি পারস্যের কবি হাফিজের সহিত পত্রালাপ করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি নিজে কবি ও কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ঢাকার ইতিহাস অনুসারে (History of Bengal) সম্ভবতঃ তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

সৈফুদ্দিন হমজা শাহ, শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ ও আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সৈফুদ্দিন হমজা শাহ সিংহাসন আরোহণ করেন (১৪০৯-১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুই বছর রাজত্বের পর তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমসাময়িক একজন আরব দেশীয় গ্রন্থকারের মতে হমজা শাহ তাহার ক্রীতদাস শিহাবুদ্দিন কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ইনি পরবর্তীকালে শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪১২-১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

তাহার সিংহাসন লাভের পশ্চাতে পরাক্রমশালী রাজাগণের সমর্থন ছিল। অর্থাৎ শিহাবুদ্দিন নামে সুলতান হইলেও আসল ক্ষমতা করায়ত্ব করিয়াছিলেন রাজা গনেশ। দুই বৎসর পর তাহার মৃত্যু হয়। কাহারও মতে তিনি গনেশ কর্তৃক নিহত হন।

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহের মৃত্যুর পর তাহার

পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সুলতান হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক বিবরণে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের নামের উল্লেখ নাই। তাহাতে মনে হয় শিহাবুদ্দিনের পর তাহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজা গনেশই রাজ্যশাসন করিতেন। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা ১৪১৪-১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করার পর রাজা গনেশ সম্ভবতঃ নিজের রাজত্ব করিবার জন্য তাহাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন।

মধ্যবর্তী হিন্দু রাজবংশ

রাজা গনেশ ঃ—ইলিয়াসশাহী রাজবংশের প্রথম পর্যায়ের শেষ সুলতানের মৃত্যু এবং নাসিরউদ্দিন মামুদ কর্তৃক পুনরায় সিংহাসন অধিকারের মধ্যবর্তী দুই বছর হিন্দুরাজারা বঙ্গদেশে শাসন করিয়াছিলেন।

এই সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় সকল ঐতিহাসিকই মোটামুটি একই কথা বলিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশ মুসলমান শাসকদের অধিকারে ছিল। এই সময়ের মধ্যে কোন কোন অঞ্চল বিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার এই একজন মাত্র হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সেজন্য তাহার কীর্তির অসামান্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই।

অবশ্য এই হিন্দু অভ্যুদয় বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। গনেশের বংশধরেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা সত্বেও তাহারা বঙ্গদেশের সিংহাসন বেশীদিন নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই অল্পস্থায়ী সময়ের মধ্যেও গনেশ ও তাহার বংশের রাজত্বে বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করিয়াছে। কারণ প্রথমত এই রাজবংশ হিন্দুর বংশ, আর দ্বিতীয়ত ইহারা সকলেই বঙ্গদেশেরই সন্তান। সেজন্য রাজা গনেশ যেদিন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন সেই দিন হইতে বঙ্গের রাজশক্তির সহিত দেশের জনগণের অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হইল।

রাজা গনেশ উত্তরবঙ্গের ভাতুড়িয়া অঞ্চলের অত্যন্ত শক্তিশালী একজন জমিদার ছিলেন। তিনি ইলিয়াস শাহী সুলতানদের অন্যতম আমীরও ছিলেন এবং এই সময়কার রাজনীতিতে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ দুইজন সুলতানের আমলে তিনি ছিলেন প্রকৃত শাসক। সুলতান

আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যূত (সম্ভবতঃ নিহত) করিয়া বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করেন।

কিন্তু তিনি নিরুপদ্রবে বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। মুসলমান দরবেশরা বিধর্মীর সিংহাসন অধিকারের প্রচণ্ড বিরোধীতা করিতে লাগিলেন। রাজা গনেশ এই বিরোধ কঠোরভাবে দমন করিতে আরম্ভ করিলে ক্রুদ্ধ দরবেশ-দের নেতা জৌনপুরের সুলতানের নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করিলেন। জৌন-পুরের সুলতান সৈন্যসহ বঙ্গদেশ অভিযান করিলেএই সময় তাহার রাজনীতি চতুর পুত্র যদু (নামান্তর জিতমল) পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করেন। তখন বাধ্য হইয়া রাজা গনেশ দূরে সরিয়া গেলেন। যদু রাজ্য-লোভে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেন। জৌনপুরের সুলতান যদুকে সিংহসনে বসাইয়া ফিরিয়া গেলেন। সিংহাসনে আরোহন করিয়া যদু জালাল-উদ্দিন মহম্মদশাহ উপাধি গ্রহণ করিলেন। রাজনৈতিক এই পরিবর্তন ১৪১৫-১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ঘটিয়াছিল।

জৌনপুরের সুলতান দেশে ফিরিয়া গেলে রাজা গনেশ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া নিজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পুত্র জালালউদ্দিন নামমাত্র সুলতান থাকিলেও তিনি পিতার ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। রাজা গনেশ প্রতিপক্ষ দরবেশদের কঠোর হস্তে দমন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এই অবস্থা চলিবার পর রাজা গনেশ পুত্র জালালউদ্দিনকে অপসারিত করিয়া নিজে দনুজর্মদনদেব নাম গ্রহন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দনুজর্মদনদেব ও রাজা গনেশ দুইজন পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের মতে দনুজর্মদনদেব চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। কিন্তু এই মত অনেকেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি ১৪১৭ হইতে পুনরায় রাজত্ব আরম্ভ করিয়া সম্ভবতঃ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে পরলোক গমন করেন। অনেকে মনে করেন তিনি পুত্র যদুকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনরায় হিন্দুধর্মে দিক্ষিত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার ষড়যন্ত্রের ফলে রাজা গনেশের মৃত্যু হয়। খুব কম সময়ের জন্য হইলেও রাজা গনেশ বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ তাহার রাজ্যে ছিল। ফিরিস্তার মতে রাজা গনেশ দক্ষ সুশাসক ছিলেন।

মহেন্দ্রদেব ঃ—রাজা গনেশ বা দনুজর্মদনদেবের মুদ্রার ঠিক পরবর্তী-কালেই মহেন্দ্রদেব নামে একজন হিন্দুরাজার মুদ্রা পাওয়া *গিয়াছে*। ইহাতে

মনে হয় মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং সম্ভবতঃ পুত্র। ফিরিস্তার মতে রাজা গনেশের আর এক পুত্র ছিলেন। তাহাতে অনুমাত্র করা অসঙ্গত নয় যে এই মহেন্দ্রদেব জালালউদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং সম্ভবতঃ রাজা গনেশের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে জালালউদ্দিন সম্ভবতঃ তাহাকে অপসারিত করিয়া পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন।

জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ :—জালালউদ্দিন দুই দফায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথমবার ১৪১৫-১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রথমবারের রাজত্বকালে চীন সম্রাটের দূতেরা রাজদরবারে আসিয়াছিলেন। তাহার দ্বিতীয়বারের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার মধ্যে হইল বার্মার রাজার নিকট পরাজিত আরাকান রাজের তাহার দরবারে আশ্রয়লাভ ও তাহার সাহায্যে রাজ্য পুনরুদ্ধার। তিনি বহু মসজিদ সংস্কার সাধন করায় বাগদাদের খালিফা এবং মিশরের রাজার নিকট হইতে অনেক উপহার পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ বোঝা যায় ধর্মান্তরিত হইলেও তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি রাজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রও তাহার নিকট সমাদর পাইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে তিনি সুশাসক ও ন্যায় বিচারক ছিলেন। তিনি জনবহুল পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীকে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। সম্ভবতঃ ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

শামসুদ্দিন আহাম্মদ শাহ

জালালউদ্দিন-এর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শামসুদ্দিন আহাম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি প্রায় ১৮ বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহা সঠিক নয়। কারণ তাহার নামাঙ্কিত কোন মুদ্রাই তাহার রাজত্বের প্রথম বছরের পর আর পাওয়া যায় নাই। সেজন্য বুকানন মনে করেন শামসুদ্দিন তিন বছর রাজত্ব করেন। ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। রিয়াজ ও বুকাননের বিবরণী মতে শামসুদ্দিনের কুশাসনে ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া দেশের আমীরগণ তাহার দুইজন ক্রীতদাসের সাহায্যে তাহাকে হত্যা করান। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে রাজা গনেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইয়া যায়।

মামুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশঃ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)

নাসিরউদ্দিন মামুদ ঃ—শামসুদ্দিন আহাম্মদের দুই হত্যাকারী নিজেদের মধ্যে সিংহাসন লাভের জন্য ঘোরতর বিবাদ শুরু করে। এই অবস্থায় দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ ইলিয়াস শাহের জনৈক পৌত্র নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহকে সর্ব-সম্মতিক্রমে সিংহাসনের বসান। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নাসিরউদ্দিন মামুদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি একজন উদার মনোভাবাপন্ন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকল প্রজা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করিতেন। তাহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে শিল্পকলারও যথেষ্ঠ উন্নতি হয়। তিনি সুদীর্ঘ ২৪-২৫ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তাহার রাজত্বকাল মোটামুটি শান্তিতেই কাটিয়াছিল। তবে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৩৫-১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এক তাম্রশাসন হইতে অনুমান করা যায় যে তাহার সহিত নাসিরউদ্দিনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। সেই যুগে দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল উড়িষ্যার রাজাদের শাসনাধীনে ছিল এবং খুব সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনকালের শেষদিকে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল সেই সময় তাহাদের রাজত্বের সীমা পুনরায় ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজারা সীমাবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার পূর্বগঙ্গ রাজারা সবসময় ভাগীরথী নদীর উপর আধিপত্য দাবি করিতেন। ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কপিলেন্দ্র-দেবের একটি লিপিতে তিনি নিজেকে 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া দাবি করিয়াছেন, এবং তিনি 'মল্লিকা পারিসকে' (মালিক বাদশাহ) পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন। এই বিশেষ শব্দ দ্বারা সম্ভবতঃ তিনি গৌড়ের মুসলমান শাসকদের কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং তাহার সহিত নাসিরউদ্দিন-এর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে তিনি জয়ের দাবি করিয়াছেন। কপিলেন্দ্রদেবের অন্যতম সামন্ত কোণ্ডাবিতুগনদেব প্রদত্ত ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এক লিপি হইতে জানা যায় যে কপিলেন্দ্র-দেব দুইজন 'তুরস্ক' নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঐ সময় উড়িষ্যার নিকটবর্তী দুইজন মুসলমান নৃপতি ছিলেন। একজন বাহমনীর সুলতান এবং অন্যজন বঙ্গদেশের সুলতান নাসিরউদ্দিন। সুতরাং এই লিপি অনুসারেও তিনি নাসিরউদ্দিনকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

এই কপিলেন্দ্রদেব পূর্বগঙ্গ রাজবংশের শেষ রাজা চতুর্থ ভানুদেবের মৃত্যুর পর (১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি এইভাবে সূর্য-বংশীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

কপিলেন্দ্রদেবের বঙ্গদেশ অভিযানের ফলাফল কি হইয়াছিল বিশেষ জানা যায় না। মনে হয় তিনি হুগলী নদীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ জেলার গড় মান্দারন পর্যন্ত উপকূলবর্তী একটি সংকীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। সেই যুগে এই গড় মান্দারন বর্ধমান হইতে উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলে যাইবার সৈন্য চলাচলের পথে অবস্থিত ছিল। খুব স্বাভাবিক কারণে ইহা সামরিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মনে হয় তিনি গড়মান্দারনের উপর অধিকার বেশীদিন রাখিতে পারেন নাই।

নাসিরউদ্দিনের রাজত্বকালে দুইবার চীন সম্রাটের কাছে উপহার সমেত রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করা হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতকের দিকে চীনের সহিত যে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা প্রায় ৩৪ বছর অব্যাহত ছিল।

রুকুনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)

নাসিরউদ্দিন মামুদের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রুকুনুদ্দিন বারবক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পিতা মামুদ শাহের সহিত যুক্তভাবে রাজত্ব করেন।

তিনি অনেক নূতন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাহার রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল উড়িষ্যা ও কামরূপে অভিযান। ইসমাইল গাজী নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি তাহার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তাহার বিভিন্ন বিজয়কাহিনী "রিসালৎ-ই-শুহাদা" নামক একটি ফরাসী গ্রন্থে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পীর মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি সংকলন করেন। এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য উপাদান থাকিলেও মোটের উপর ইহা বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত মনে হয়।

উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের বিভিন্ন দানপত্রে দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে বঙ্গদেশের সুলতানদের সহিত সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ইহা ছিল একটি নিয়মিত ঘটনা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই অভিযানগুলিতে উড়িষ্যারাজই অধিকতর সুবিধা লাভ করিয়াছিল। অবশ্য এই অভিমতের স্বপক্ষে তিনি তেমন কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় এই সমস্ত যুদ্ধে কোন পক্ষই তেমন স্থায়ী কোন সুযোগসুবিধা লাভ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিকাংশ অঞ্চল উড়িষ্যার

রাজাদের অধিকারে ছিল। তবে মাঝে মাঝে তাহাদের এই অধিকার গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সুলতানদের হাতে হারাইতে হইত।

"রিসালৎ"-এর কাহিনী অনুসারে সুলতান বারবকের সেনাপতি ইসমাইল গাজী হুগলী জেলার গড় মান্দারনে বিদ্রোহী রাজা গজপতিকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া ঐ দুর্গ অধিকার করেন। ইহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ঘটনা সম্ভবতঃ এই যে গজপতি বংশীয় উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কোন সেনাধ্যক্ষকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ইসমাইল ঐ মান্দারন দুর্গ অধিকার করেন। এই মান্দারন দুর্গ বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইলেও কপিলেন্দ্রদেবের তাহা জয় করিতে সম্ভব হইয়াছিলেন। গড় মান্দারনের দক্ষিণ দিকে একটি বিশাল তোরণ আছে যাহার নাম "উড়িয়া মর্দানা" অর্থাৎ উড়িয়াদের পীড়নকারী। জনশ্রুতি অনুসারে ইসমাইল গাজী উড়িয়াদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার ঘটনাকে স্মরণীয় রাখিবার জন্য বোধ হয় এই তোরণটি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এই বিজয়ের কোন তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। মনে হয় সুলতান বারবকের রাজত্বের প্রথম দিকেই ইহা ঘটিয়াছিল। কারণ পরবর্তীকালে সেনাধ্যক্ষ ইসমাইলকে কামরূপ অভিযানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেখানে দীর্ঘ যুদ্ধের পর তিনি নিহত হইয়াছিলেন।

সুলতান রুকুনুদ্দিন বারবক শাহ আরও বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়ধর্মের কবি ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিশারদ বৃহস্পতি মিশ্র, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী, আমীর জৈমুদ্দীন হরুই, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিকও ছিলেন। গৌড়ের "দাখিল দরওয়াজা" নাম বিখ্যাত সুন্দর তোরণটি তাহারই নির্মিত বলিয়া কথিত। তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিদের উচ্চরাজ পদে নিযুক্ত করিতেন। তিনি তাহার সৈন্য দলে বিভিন্ন দেশ হইতে লোক নিয়োগ করিতেন। তিনি আফ্রিকা হইতে বিপুল সংখ্যক হাবশী আমদানি করিয়াছিলেন। রুকুনুদ্দিন বারবক শাহ বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ)

বারবক শাহের রাজত্বকালে তাহার পুত্র শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ কিছুকাল পিতার সহিত যুক্তভাবে রাজত্ব করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে প্রায় ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে তাহাকে উচ্চশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ন্যায়বিচার-প্রবন ও শাসন দক্ষ নরপতি বলা হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে গৌড়ের বিখ্যাত লোটন মসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন।

জালালউদ্দিন ফতে শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের মতে ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর সিকন্দর শাহ নামে একজন রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় অমাত্যরা তাহাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন। সম্ভবতঃ তাহার রাজত্ব তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় নাই। পরবর্তী সুলতানের নাম হুসেন। তিনি জালালউদ্দিন ফতে শাহ এই নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহের পুত্র এবং শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের খুল্লতাত।

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে ইনি বুদ্ধিমান নৃপতি ছিলেন বলা হইয়াছে। বিজয় গুপ্ত তাহার মনসামঙ্গল কাব্যে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারই রাজত্বকালে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়।

তিনি অন্যায়কারীদের খুবই কঠোর শাস্তি বিধান করিতেন। এই সময়ে হাবশীদের প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা অনেক সময় সুলতানের আদেশ পর্যন্ত মান্য করিত না। সুলতান তাহাদের কঠোর হস্তে দমন করিতেন। ফলে এই অন্যায়কারীরা প্রাসাদ রক্ষীদের প্রধান খোজা বারবকের সহিত এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন এবং একদিন রাত্রে সুলতান ফতেশাহকে হত্যা করিলেন। ফতে শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালও শেষ হইল। দীর্ঘ প্রায় দেড়শত বৎসর রাজত্বকালে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই বংশের সহিষ্ণুতা ছিল সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই বংশের সুলতানরা বঙ্গদেশকে মনেপ্রাণে স্বদেশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য ইহারা সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সহিত তাহারা একেবারে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে ইহাদের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

হাবশী রাজত্ব (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)

সুলতান শাহজাদা ঃ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন ফতে শাহকে হত্যা করিয়া খোজা বারবক, সুলতান শাহজাদা এই নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। আধুনিক গবেষকরা মনে করেন তিনি জাতিতে হাবশী ছিলেন। সেজন্য

তাহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে হাবশী রাজত্ব শুরু হয় তবে এ বিষয়ে মতান্তর আছে। 'ফিরিস্তার' মতে তিনি ছিলেন বাঙালী। তাহার রাজত্বকাল কাহারও মতে ৮ মাস, আবার কাহারও মতে আড়াই মাস বা ছয় মাস মাত্র। তিনি খুব অত্যাচারী শাসক ছিলেন। বিক্ষুব্ধ সৈনিকরা তাহাকে হত্যা করে। সেই সময় তাহাদের নায়ক মালিক আন্দিলকে সিংহাসন গ্রহণে অনুরোধ করেন।

সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ)

মালিক আন্দিল সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের প্রথম হাবশী সুলতান। অনেকের ধারণা হাবশী সুলতানরা সকলেই অযোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং তাহাদের রাজত্বকালে দেশের সন্ত্রাস ও অরাজকতা বিরাজিত ছিল। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল এবং নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। তিনি গৌড়ের বিখ্যাত "ফিরোজ মিনারটি" নির্মাণ করেন। তিন বছরের কিছু অধিককাল তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর কারণ সঠিক জানা যায় না। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে তিনি প্রাসাদরক্ষী পাইকদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন।

নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ (দ্বিতীয়) (১৪৯০-১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দ)

পরবর্তী সুলতান ছিলেন নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ। তাহার পিতৃপরিচয় রহস্যাবৃত। তবে তাহাকে সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের পুত্র বলিয়া মনে করার পক্ষে যুক্তি প্রবলতর। তিনি খুব অল্পবয়স্ক থাকায় একজন হাবশীকে সুলতানের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তিনি চক্রান্ত করিয়া সমস্ত শাসন ক্ষমতা হস্তগত করায় সিদিবদর নামে পাইকদের একজন সর্দার এই বালক শাসক নাসিরউদ্দিন মামুদকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ বাবর তাহার আত্মজীবনীতেও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)

সিদিবদর যাহার ডাক নাম ছিল "পাগল", তিনি প্রভুকে হত্যা করিয়া শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ এই উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তিনি ধর্মমত নির্বিশেষে

বহু দরবেশ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহার অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছাইল তখন সকল শ্রেণীর জনগণই তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। প্রায় দুই বৎসর পর তাহার মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিপক্ষ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মুজাফ্‌ফর শাহকে হত্যা করিয়া নিজে সুলতান হইলেন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাবশী শাসনেরও অবসান হয়। আধুনিক ঐতিহাসিক-দের মতে চারজন হাবশী সুলতান মোট ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

হোসেন শাহী বংশের শাসন : (১৪৯৩-১৫৩৮) খ্রীষ্টাব্দ

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ : (১৪৯৩-১৫১৯) খ্রীষ্টাব্দ

প্রাক মোগল যুগে হোসেনশাহী আমল বঙ্গদেশে স্বর্ণ যুগ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর লোক ছিলেন। তাহার সময় বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। তাহার রাজ্যের আয়তন অন্যান্য সুলতানদের অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। তাহার সময়কার অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন (শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতি) পাওয়া গিয়াছে। তিনি পরধর্মের প্রতি উদার ছিলেন এবং উচ্চরাজপদে অনেক হিন্দুদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাহার অমাত্যরা বাংলা ভাষার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চৈতন্যদেব ছিলেন তাহার সমসাময়িক। সেই জন্য চৈতন্যদেবের নানা প্রসঙ্গে হোসেনশাহের নাম যুক্ত হওয়ায় তিনি বাঙ্গালীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন। তাহার বংশের মোট চারজন সুলতান রাজত্ব করেন। তাহারা সকলেই মোটামুটি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

হোসেনশাহের প্রকৃত পরিচয় ও পূর্ব ইতিহাস লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে শিলালিপি ও মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে তিনি সৈয়দ বংশের সন্তান। সম্ভবতঃ তিনি তাহার পিতার সহিত শৈশবে মুর্শিদাবাদ জেলায় একানিচাঁদ পাড়া নামক স্থানে প্রথম বসবাস করেন। পরে নিজ ক্ষমতাবলে হাবশী শাসন কালে প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হন। তিনি কিভাবে রাজকীয় উচ্চপদ লাভ করিয়া প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে সুলতান মুজাফ্‌ফর শাহের মৃত্যুর পর অমাত্যরা হোসেনশাহকে সুলতান নির্বাচন করেন। শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে মনে হয় তিনি ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাহার যে যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল সে সম্বন্ধে প্রমাণ আছে।

তিনি বঙ্গদেশে ছিলেন বহিরাগত। সেই অবস্থা হইতে উচ্চরাজপদ ক্রমে প্রধানমন্ত্রী এবং পরে সিংহাসন লাভ কম কৃতিত্বের কথা নহে। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার অল্পকাল পরেই রাজ্যে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে উশৃঙ্খল ও কুখ্যাত হাবশীদের দেশ হইতে বিতাড়ন করেন। অবাধ্য সৈনিকদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং উচ্চরাজপদে যোগ্য ও দক্ষ হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়োগ করেন।

তাহার রাজত্ব আরম্ভ হইবার দুই বছর পরে জৌনপুরে রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন-শাহ-শর্কী দিল্লীর সিকন্দর শাহলোদীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হোসেনশাহের দরবারে আশ্রয়গ্রহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বেই উভয় পক্ষের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয় যাহাতে হোসেনশাহ দিল্লীর সুলতানকে তাহার কোন শত্রুকে ভবিষ্যতে আর আশ্রয় না দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন।

হোসেনশাহ তাহার রাজত্বের প্রথম বৎসর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে "কামরূপ-কামাতা-জাজনগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী" বলিয়া অভিহিত করিয়া এই রাজ্যগুলি জয়ের জন্য সক্রিয় চেষ্টা করিতে থাকেন। বহু বৎসরের চেষ্টায় তিনি কামতাপুর ও কামরূপ সম্পূর্ণ জয় করেন।

উড়িষ্যার সহিত হোসেনশাহের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয় তাহার রাজত্বের প্রথম বৎসরই উড়িষ্যারাজ্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময় উড়িষ্যার রাজা ছিলেন কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তমদেব। পরে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তমদেবের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র প্রতাপ রুদ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপরুদ্রেব দেবগুরু জীবদেবাচার্যের লেখা "ভক্তিভগবত" মহাকাব্য হইতে জানা যায় যে সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপরুদ্রদেবকে বঙ্গে সুলতানদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। হোসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি "রিয়াজ-উস-সালাতিন" এবং ত্রিপুরার 'রাজমালার' সাক্ষ্য অনুসারে মনে হয় হোসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে উড়িষ্যার বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রের মতে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রই হোসেনশাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। "ভক্তিভগবত" অনুসারে পিতার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পরে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব বঙ্গের সুলতানকে পরাজিত করিয়া ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে হোসেনশাহ প্রতাপরুদ্রের নিকট পরাজিত হইয়া ভয়ব্যাকুল চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের রচনা বলিয়া কথিত "সরস্বতী বিলাস" গ্রন্থে তাহাকে "শরণাগত-

যুবনা-পুরাধীশ্বর-হুসন-শাহ-সুরত্রাণ-সরনরক্ষন" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র শুধু কেবল হুসেনশাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে তিনি তাহার রক্ষাকর্তা ইহাও বলা হইয়াছে। উড়িষ্যা ভাষার লেখা জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত "মাদলা পঞ্জী" ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা "কটকরাজ বংশাবলী" এই উভয় গ্রন্থে বঙ্গের সুলতান উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া রাজধানী কটক ও পুরী পর্যন্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের সমস্ত মূর্তি তিনি লুণ্ঠন করেন। কিন্তু জগন্নাথদেবের মূর্তিকে চিল্কা হ্রদের মধ্যস্থিত চড়াই গুহার মধ্যে রাখা হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহা ধ্বংস করিতে পারেন নাই। এই অভিযানকালে রাজা প্রতাপরুদ্র দক্ষিণদিকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য রাজ্যে অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এই আক্রমণের সংবাদ পাইবামাত্র দ্রুতগতিতে রাজ্যে ফিরিয়া আসেন এবং বঙ্গের সুলতানকে তাড়া করিয়া গঙ্গার তীর পর্যন্ত লইয়া যান। এই বিবরণে আরও বলা হইয়াছে প্রতাপরুদ্র ও হোসেনশাহের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হোসেনশাহ মান্দারন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপরুদ্র তখন মান্দারন দুর্গ অবরোধ করেন। এই সময় প্রতাপরুদ্রের অন্যতম সেনাপতি গোবিন্দবিদ্যাধর রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হোসেন শাহের পক্ষে যোগদান করেন। এইবার তাহারা মিলিতভাবে প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া প্রতাপরুদ্রকে মান্দারন হইতে বিতাড়িত করেন। মান্দারন হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র গোবিন্দবিদ্যাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং অনেক বোঝাইয়া তাহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন। ইহার পর তিনি গোবিন্দকে উচ্চপদে নিয়োগ করিয়া তাহাকে রাজ্যশাসনের ভার দেন। ফলে হোসেন শাহ আর উড়িষ্যা জয় করিতে পারিলেন না। এই কাহিনী সমস্তটা সত্য না হইলেও অনেকটাই যে সত্য তাহাতে সন্দেহের বিশেষ কোন অবকাশ নাই। বোঝা যাইতেছে এই যুদ্ধে হোসেন শাহ বা উড়িষ্যার রাজা উভয়েই যখন যুদ্ধ জয়ের দাবি করিতেছেন তখন ইহাতে কাহারও তেমন কিছু সুবিধা লাভ হয় নাই।

"চৈতন্য ভগবত", "চৈতন্য চরিতামৃত" ও "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই সংঘর্ষ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় হোসেনশাহ উড়িষ্যা অভিযান করিয়া সেখানকার বহু মন্দির ও মূর্তি ভাঙ্গিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যা রাজের সহিত দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব যখন নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসেন (১৫১৫ খ্রীঃ) তখন হোসেনশাহ পুনরায় উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। জয়ানন্দ তাহার "চৈতন্য মঙ্গল" কাব্যে লিখিয়াছেন যে উড়িষ্যার রাজা

প্রতাপরুদ্রদেব বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার পূর্বে চৈতন্যদেবের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাকে এই প্রচেষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইতে বলেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন "কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর মহাশক্তি" তাহাকে আক্রমণ করিলে উড়িষ্যা ধ্বংস হইবে এবং জগন্নাথদেব নীলাচল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাতে প্রতাপরুদ্র নাকি বঙ্গদেশ আক্রমণ হইতে বিরত হন। ইহা কতটা সত্য তাহা বলা খুব কঠিন।

হোসেন শাহ ১৪৯৩-১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উড়িষ্যা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৫১২-১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের এই সময় এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের নেতৃত্বে আবার আক্রমণ শুরু হয়। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই স্থায়ীভাবে তেমন কোন বিশেষ ফল লাভ করিতে পারেন নাই।

ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে হোসেন শাহ আক্রমণ করিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই কিন্তু তাহা না হইলেও মেদিনীপুর জেলার উত্তরদিকে কিছু অংশে যে তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল ইহা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে। হোসেনশাহ তাহার হাবশী ও পাইক প্রজাদের কিছু কিছু ভূমি দান করিয়া বঙ্গদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে মেদিনীপুর জেলার সীমান্ত রক্ষার্থে তাহাদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার এই পাইকদের বংশধরেরাই পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হইলে ঐ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল।

হোসেনশাহের সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বঙ্গদেশের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। গোবিন্দদাসের "কড়চা" ও জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" চৈতন্যদেবের নীলাচলে তীর্থযাত্রার বিবরণ বর্ণিত আছে। তিনি হাজিপুর (বর্তমান ডায়মণ্ডহারবার) হইতে গেঁওখালি হইয়া তমলুকে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে মেদিনীপুর, নারায়ণগড় ও দাঁতন হইয়া তিনি উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করেন। তিনি যে সময় উড়িষ্যা গিয়াছিলেন সে সময় উৎকলে হিন্দুরাজার সহিত বঙ্গদেশে মুসলমান সুলতানের বিবাদ চলিতেছিল এই কারণে বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তে লোকেদের জীবন নিরাপদ ছিল না।

হোসেনশাহ ও ত্রিপুরার রাজার মধ্যে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। ত্রিপুরার রাজবংশবলী "রাজমালাতে" এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথম তিনটি যুদ্ধে ব্যর্থ হইলেও তিনি স্বয়ং ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই সময় ত্রিপুরা বাহিনী পরাজিত হইলে সেই দেশের কিছু অংশ বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত হয়। তাহার সহিত আরাকান রাজেরও সমবেত সংঘর্ষ হইয়াছিল। তাহার রাজত্ব-

কালেই বঙ্গদেশে পর্তুগীজরা প্রথম আক্রমণ করে। তিনি রাজধানীকে গৌড় হইতে একডালায় স্থানান্তরিত করেন। তাহার প্রসিদ্ধ কয়েকজন মন্ত্রী, অমাত্য ও কর্মচারী ছিল। তাহাদের মধ্যে পরাগল খান, ছুটি খান, রূপ, সনাতন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার গুণমুগ্ধ হিন্দু প্রজাগণ তাহাকে "নৃপতি তিলক, জগৎ ভূষণ" প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল।

তাহার সুবিস্তৃত রাজ্যসীমা উত্তর-পূর্বে আসামের হাজা অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বে সিলেট ও চট্টগ্রাম, উত্তর-পশ্চিমে শরন, মুঙ্গের ও বিহারসরিফ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মান্দারন ও ২৪ পরগণার মধ্যে মোটামুটি বিস্তৃত ছিল।

নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর নসরৎশাহ (১৫১৯-১৫৩২) খ্রীষ্টাব্দ

. আলাউদ্দিন হোসেনশাহের মৃত্যুর পর তাহার সুযোগ্য পুত্র নাসিরউদ্দিন নসরৎশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় তিনি পিতার মৃত্যুর অন্তত তিন বৎসর পূর্বে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশের অধিকার লাভ করেন।

কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি হোসেনশাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ ছিলেন। তাহার সিংহাসনে আরোহণের দুই বৎসর পরে দিল্লীর লোদী রাজ্যের ভাঙ্গন ধরে। তখন পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হইয়া যায় এবং এই অঞ্চলে লোহানী ও হুসুলী বংশের আফগান নায়কেরা প্রতিপত্তিলাভ করে। নসরৎশাহ ইহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিলে উত্তরভারতে আফগান নায়কেরা পূর্বভারতের দিকে পলায়ন করেন। বাবর ঘাগরা নদী পর্যন্ত অঞ্চল তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই নদীর ওপার হইতে নসরৎশাহের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। ফলে উত্তরভারত হইতে বিতাড়িত আফগান নায়কগণ পূর্বভারতে নসরৎশাহের নেতৃত্বে মোগল বিরোধী একটি শক্তিশিবির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। জৌনপুরের সুলতান বাহাদুর খাঁ লোহানী, বিহারের শেরখাঁ ও লোদী বংশের মামুদ এই শক্তি সংঘে যোগদান করেন। বাবর নসরৎশাহ শাহের নিকট আনুগত্যের দাবি করিলেন। নসরৎশাহ ইহার উত্তর দিতে অহেতুক দেরী করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এই শক্তি সংঘের নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের ফলে শক্তি সংঘ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অবস্থায় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইল। এই যুদ্ধে বঙ্গের সুলতান পরাজিত হইলেন এবং তিনি সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর পূর্বভারতে আফগানগণ পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়া মোগলদের বিরোধী শক্তি সৈন্য গঠন করেন। নসরৎশাহ এই শক্তি সংঘকে শক্তিশালী করিবার জন্য মোগলদের পরম শত্রু গুজরাটে বাহাদুর শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিবার কালেই এক আততায়ীর হাতে নসরৎশাহ নিহত হন। পিতার ন্যায় তিনিও একজন উদারনৈতিক প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিতে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীকরনন্দী, কবিকঙ্কন প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণ তাহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন।

নসরৎশাহের রাজের আয়তনও বেশ বড় ছিল। প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ, ত্রিহুত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নসরৎশাহের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

আলাউদ্দিন ফিরোজ : (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

মনে হয় নসরৎ শাহের মৃত্যুর পূর্বে তাহার ভ্রাতা মামুদকে উত্তরাধিকারী মনোনিত করিয়া যান। কিন্তু রাজদরবারে এক প্রভাবশালী দল ইহা আগ্রাহ্য করিয়া নসরৎ-এর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও শিল্প ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তিনি শীঘ্রই তাহার খুল্লতাত মামুদ কর্তৃক নিহত হন।

গিয়াসুদ্দিন মামুদশাহ : (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)

গিয়াসুদ্দিন মামুদশাহ শাসন কার্যের অনুপযুক্ত ছিলেন। তাহার কুশাসনের বিরুদ্ধে সর্বত্র আমীরগণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠেন। আফগান দলপতি শেরখাঁ শূর মামুদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষে মামুদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং বঙ্গদেশে আফগান শেরখাঁর প্রভূত্ব স্থাপিত হয় (১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এইভাবে বঙ্গদেশে হুসেন শাহী বংশের অবসান হয় এবং দীর্ঘ দুইশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশ যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল তাহা বিনষ্ট হয় এবং বঙ্গদেশ পুনরায় দিল্লীর অধীন একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইহার জন্য সুলতান মামুদ শাহ নিজেই দায়ী। কারণ তিনি ছিলেন দুর্বল, নির্বোধ, অদূরদর্শী ও যুদ্ধনীতিতে অজ্ঞ। গিয়াসুদ্দিন মামুদের রাজত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্গদেশে পর্তুগীজদের প্রথম বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন।

পূর্বে হোসেনশাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তাহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

সুলতান মামুদ পলায়ন করিয়া হুমায়ুনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত গৌড়ের দিকে আসিবার পথে তাহার দুই বন্দী পুত্রের আফগানদের হাতে নিহত হইবার সংবাদ পাইয়া অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সূত্র নির্দেশ

১। History of Bengal, Vol. II, (D.U.), (1972), Pp. 1-29, 95-165.

২। বাংলাদেশের ইতিহাস—২য় খণ্ড (১৩৭৩), রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ১০-১০৮

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস—২য় খণ্ড (১৯৭১), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭১-২২৫

৪। বাংলার ইতিহস (১৯৭৭), আব্দুল করিম, পৃঃ ৬৪-৪০৪

৫। History of Bengal, Sushila Mondal, Part-I (1970), 42-91, Pp. 33-234

৬। Muslim Administration in Orissa (1980), M.A. Haque, Pp. 3-46

৭। The Delhi Sulanate (1982), (I.H.C.), Habib & Nizami, Pp. 1144-48, 1155-60

৮। The Delhi Sultanate (1960), (V.B.V.) Pp. 193-221

৯। বাংলার ইতিহাসে দুশো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, (১৩৩৮-১৫৩৮), ১৯৬২ পৃঃ ২৫-৩৫৪

১০। Husain Shahi Bengal (1965), M.R. Tarafdar, Pp. 1-89

১১। History of Medieval Bengal (1974), R. C. Majumdar, Pp. 48-67

১২। মেদিনীপুরের ইতিহাস (১৩৪৬ সাল), যোগেশচন্দ্র বসু, পৃঃ ১৩১-২৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

আফগান শাসন

(১৫৩৮--১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)

পঞ্চদশ শতকে আফগানদের আকস্মিকভাবে শাসন ক্ষমতা লাভ এবং ষোড়শ শতাব্দী ব্যাপী মোগলদের সহিত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে ভারতের পূর্বদিকে তাহাদের ক্রমাগত অনুপ্রবেশ এই উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায়। প্রথমে তাহারা সুলতান বলবনের রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক হইতে গুরুত্ব লাভ করে। পরবর্তীকালে মহম্মদ বিনতুঘলক ও সর্বশেষে লোদী সুলতানদের রাজত্বকালে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক শক্তি হিসাবে পরিণত হয়।

মোগলেরা যখন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে সেই সময় আফগানরা শেষবারের মত তাহাদের সহিত রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এই সময় পাঠানদের মধ্যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হয়, ইনি হইলেন শের শাহ। সাধারণ জায়গীরদারের পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বিহারের শাসনক্ষমতা লাভ করেন (১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার পর তাহার উত্থান বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি বঙ্গদেশের সুলতানের তেলিয়াঘেরির পশ্চিম দিকস্থ সমস্ত স্থান অধিকার করেন এবং ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করেন।

তাহার এই দ্রুত ও অনন্যসাধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ূন খুবই চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি বিরাট এক সৈন্য ও নৌবহরসহ বঙ্গদেশের দিকে যাত্রা করেন। শের শাহ এই বিপদের দিনে হুমায়ূনের সৈন্যবাহিনীকে পাশ কাটাইয়া অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় অধিকার করিলেন এবং নিজের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মুদ্রা প্রচলন করিলেন। এইভাবে ২০০ বৎসরের স্বাধীন সুলতানী শাসনের শেরশাহের হাতে মামুদ শাহের পরাজয়ের ফলে অবসান ঘটিল। শের শাহের ক্রমশ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সঙ্কিত হইয়া হুমায়ূন প্রথমে শের খাঁ অধিকৃত চুনার দুর্গ অধিকার করেন, পরে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। শের খাঁ হুমায়ূনের সহিত সম্মুখ সমর পরিহার করিবার জন্য তাহার আগমনের পূর্বেই গৌড় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। হুমায়ূন গৌড় অধিকার করিয়া প্রায় নয় মাস অলসভাবে সময় অতিবাহিত করেন। এই সুযোগে শের খাঁ কাশী, জৌনপুর, কনৌজ প্রভৃতি অধিকার করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর

হইতে লাগিলেন। শের খাঁর এই বিজয় অভিযানে হুমায়ুনের সুখ নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি অবিলম্বে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথের মধ্যে পরপর দুইটি যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত হইয়া আশ্রয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত পারস্য রাজের দরবারে উপস্থিত হইলেন। শের শাহ সামান্য অবস্থা হইতে নিজ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

মোগলদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিবা মাত্রই শেরশাহ প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়া মোগল শাসককে অপসারিত করিয়াছিলেন। মোগল শাসক জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে শের শাহের পুত্র পরাজিত ও নিহত করেন (১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। বঙ্গদেশে অন্যান্য অঞ্চলে নিযুক্ত সৈন্যরাও শেরশাহের সৈন্যদের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। তিনি এই সময় পর্তুগীজ অধ্যুষিত চট্টগ্রাম বন্দরও অধিকার করিয়া নেন। শেরশাহ যখন ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন সেই সময় (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি জানিতে পারিলেন তাহার নিযুক্ত বঙ্গদেশের শাসনকর্তা খিজির খান বঙ্গদেশের শেষে সুলতান গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীন সুলতান হিসাবে পরিচয় দিতেছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র পাঞ্জাব হইতে গৌড়ে আসিয়া খিজির খানকে পদচ্যুত করেন এবং ফজিলৎকে গৌড়ের শাসক নিযুক্ত করেন।

শেরশাহ বঙ্গদেশকে কতকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতি অঞ্চলের জন্য শাসন কর্তা হিসাবে একজন আমীর নিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে শেরশাহের আমলে তাহার সামগ্রিক শাসন সংস্কারের দ্বারা বঙ্গদেশ উপকৃত হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও হইতে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেন যাহা পরবর্তীকালে গ্রাণ্ট ট্যাঙ্ক রোড (G.T.) নামে পরিচিত হয়। এইভাবে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে শেরশাহ বঙ্গদেশের সহিত দিল্লী সাম্রাজ্যের যে রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা পাঁচ বৎসর স্বল্পস্থায়ী (১৫৪০-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকাল মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। ইসমাইল শাহের মৃত্যুর পর নবপ্রতিষ্ঠিত আফগান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে শুরু করে এবং প্রথমেই বঙ্গদেশ দিল্লীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

ইসমাইল শাহের নাবালক পুত্র ফিরোজ খান সিংহাসনে আরোহণ করিবার কয়েকদিন পরে শের শাহের আত্মীয় মুবারিজ খান তাহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তখন তাহার উপাধি হয় মহম্মদ শাহ আদিল। দুর্ধর্ষ আফগান অভিজাতদের ক্ষমতাকে খর্ব করা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

এই সময়ে বঙ্গদেশের শাসক ছিলেন মহম্মদ খান। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা

করিলেন এবং শামসুদ্দিন মহম্মদ শাহ গাজী উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের সুলতান হন। তিনি জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। সেই সময় রাজসেনাপতি হিমু কর্তৃক তিনি নিহত হন (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে)। এইবার আদিল শাহবাজ খানকে বঙ্গের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশে পৌছিবার পূর্বেই নিহত শামসুদ্দিনের পুত্র খিজির খান নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ এই উপাধি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় উত্তর ভারতেও এক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটিল। মোগল সম্রাট হুমায়ুন পারস্য রাজের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সৈন্যসহ ভারতে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাঞ্জাবের বিদ্রোহী শাসককে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার কয়েক মাস পরে আকস্মিকভাবে তাহার মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আকবর দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)। তাহার অভিভাবক বৈরাম খাঁর সহিত পানিপথের যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হন। মহম্মদ আদিল স্বয়ং পরাজিত হইয়া পূর্বদিকে পলায়ন করেন। তিনি বঙ্গদেশের সুলতান বাহাদুর শাহ গিয়াসুদ্দিন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

বঙ্গদেশের বিজয়ী সুলতান জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইলে তিনি মোগল সেনাপতি খানই জামানের হাতে পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরবর্তী কয়েক বৎসর ছোটখাট ভূস্বামীদের স্থানীয় বিদ্রোহে খানিকটা বিব্রত হওয়া ছাড়া মোটামুটি তিনি শান্তিতে শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা জালালউদ্দিন দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন উপাধি গ্রহণ করিয়া সুলতান হইলেন (১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। মোগলদের সহিত তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে দক্ষিণপূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চল কররাণী বংশীয় আফগানরা জয় করায় তাহার গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শাসনভার গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম জানা যায় নাই। মাত্র সাতমাস পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করিয়া তৃতীয় গিয়াসুদ্দিন এই উপাধি গ্রহণ করেন। কররাণী বংশীয় এক আফগান তৃতীয় গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং নূতন একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

কররাণী বংশের রাজত্ব (১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)

কররাণীরা আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা। তাহাদের আদিনিবাস ছিল বঙ্গাশ (কুররম)। শের শাহের প্রধান অমাত্যদের একজন ছিলেন তাজ খাঁ কররাণী। আদিল শাহের সময় যখন রাজদরবারে অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল সেই সময় তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া বর্তমান উত্তর-প্রদেশে গাঙ্গেয় অঞ্চলে একটি স্থান অধিকার করেন। কিন্তু মহম্মদ আদিলশাহ সেখানে তাঁহাকে পরাজিত করেন। ফলে তিনি তাণ্ডায় পলাইয়া আসিয়া এই অঞ্চলের জায়গীরদারও তাহার অন্যান্য তিন ভ্রাতার (ইমাদ, সুলেমান ও ইলিয়াস) সহিত মিলিত হন। কিছুদিন পরে তাহারা আদিলের সেনাপতি হিমু কর্তৃক চুনারের নিকট পরাস্ত হন। ফলে তাজ ও সুলেমান বঙ্গদেশের দিকে পলায়ন করেন। পরবর্তী দশ বৎসরে তাহার দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চল অধিকার করেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাজখান তৃতীয় গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করিয়া বঙ্গদেশের সুলতান হন। এক বৎসর শাসন করিবার পর তাহার মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা সুলেমান কররাণী বঙ্গদেশের সুলতান হন।

সুলেমান কররাণী ঃ—সুলেমান কররাণী দীর্ঘ ৮ বৎসর (১৫৬৫-১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গদেশ শাসন করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তাহার রাজ্যসীমা ক্রমশ দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে শোন ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময়ে শূরবংশের বিভিন্ন শাখা আত্মকলহে বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে সুলেমানের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই ছিল না। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়ার, এলাহবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের অধিকারে থাকায় এই সকল অঞ্চলে আফগান নায়কগণ অনেকেই সুলেমানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোচবিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাহার উৎকৃষ্ট হস্তিবাহিনীও ছিল। ফলে আফগানদের শেষে আশ্রয়স্থল হিসাবে বঙ্গদেশ বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছিল।

বিপুল ধনসম্পদ ও সুশিক্ষিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সুলেমান কররাণী উত্তরপূর্ব ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে দীর্ঘ শান্তির ফলে বঙ্গদেশের রাজস্ব প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি প্রজাদের ন্যায় বিচারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে বহু বহিরাগত মুসলমান জ্ঞানীগুণিকেও দরবারে সম্মানের সহিত স্থান দিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক নীতিতেও তিনি সমান দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাট আকবরের প্রতি সর্বদা মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাহার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে মোগল শাসকদের মাধ্যমে সম্রাটকে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইতেন। তিনি আকবরের নামে মুদ্রা ও নিয়মিত খুৎবা পাঠ করিতেন। অর্থাৎ তিনি নিজে কোন রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই। শুধু তিনি নিজেকে "আলাহজরৎ" এই বলিয়া পরিচয় দিতেন। সেই সময় শোননদী ছিল মোগল অধিকার ও সুলেমানের অধীন অঞ্চলের সীমারেখা।

তাহার এই বিচক্ষণ কূটনীতি ও সুশানের পশ্চাতে একজন অতি বিজ্ঞ মন্ত্রীর অবদান ছিল (লোদিখান)। তিনি ছিলেন প্রভুর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত সেই সঙ্গে তাহার ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। তাহার সহিত মিশ্রিত ছিল তাহার বিজ্ঞজনোচিত রাজনৈতিক কৌশল। তিনি তাহার বিচক্ষণতার দ্বারা যতকাল জীবিত ছিলেন ততদিন দুর্ধর্ষ আফগানদের অহেতুক কোন রাজনৈতিক দুঃসাহসী কিছু করা হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন।

এই সময়ে উড়িষ্যার গজপতি রাজবংশের পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের পরবর্তী দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনকাল চলিতেছিল। ফলে তখন উড়িষ্যা রাজ্যে এক বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল। অভিজাতদের বিদ্রোহ, হত্যা ও বে-আইনিভাবে সিংহাসন অধিকার প্রভৃতি হামেশাই ঘটিত। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা খুব স্বাভাবিক কারণে সীমান্তবর্তী শাসকদের উড়িষ্যা অভিযানে উৎসাহিত করিয়াছিল। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চক্রপ্রতাপদেব তাহার পুত্র নরসিংহ জেনা কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হইবার পর তিনি নিজেও অল্প-কালের মধ্যে নিহত হইলেন। তখন মন্ত্রী হরিচন্দন মুকুন্দদেব (তেলিঙ্গা মুকুন্দ-দেব নামে অধিক পরিচিত) নামে একজন মন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠেন। তিনি সিংহাসনে চক্রপ্রতাপদেবের অন্য এক পুত্র রঘুরাম জেনাকে বসাইলেন। তিনি ১৫৬০-১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিজেই সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি কঠোর হস্তে রাজ্যের শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন।

মহম্মদ শাহ আদিলের ইব্রাহিম শূর নামে এক প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বত্র বিফল মনোরথ হইয়া ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে উড়িষ্যা রাজা কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। রাজা মুকুন্দ দেব তাহাকে কিছুতেই বঙ্গদেশের সুলতানের হাতে সমর্পণ করিতে রাজি হন নাই। তিনি ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের প্রেরিত রাজদূতকে সাদরে দরবারে গ্রহণ করেন এবং আকবরের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া প্রতিশ্রুতি দেন যদি

কখনও স্থলেমান কররাণী আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহা হইলে তিনি ইব্রাহিম শূরকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে পাঠাইবেন। তিনি নিজেই একবার বঙ্গদেশে অভিযান চালাইয়া দক্ষিণ বঙ্গে হুগলীর নিকটবর্তী সাতগাঁও পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে গঙ্গা নদীতে তিনি একটি ঘাট নির্মাণ করেন।

১৫৬৭-১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে আকবর যখন চিতোর আক্রমণে ব্যস্ত সেই সময় স্থলেমান কররাণী তাহার পুত্র বায়াজিত ও ভূতপূর্ব মোগল সেনাধ্যক্ষ সিকন্দর উজবেকের নেতৃত্বে উড়িষ্যায় অভিযান প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ছোটনাগপুর ও ময়ূরভঞ্জ জঙ্গলের মধ্য দিয়া উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় রাজা মুকুন্দদেব প্রতিরক্ষার ব্যাপারে একটু শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই আক্রমণের প্রতি তিনি তেমন গুরুত্ব না দিয়া তাহাদের প্রতিহত করিবার জন্য ছোট রায় ও রঘুভঞ্জ নামে দুইজনের অধীনে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। তখন মুকুন্দদেব কটসামা (Kotsama) নামক দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং উৎকোচ দ্বারা বায়াজিতের সৈন্যকে বশীভূত করিলেন। ইহার পর মুকুন্দদেবের সহিত বিশ্বাসঘাতকদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোট রায় উভয়েই নিহত হইলেন। সারঙ্গগড়ের সৈনাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ (কাহারো কাহারো মতে দুর্গাভঞ্জ) এই স্থযোগে উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু স্থলেমান কররাণী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। এইবার তিনি ইব্রাহিম শূরকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। এইভাবে উড়িষ্যা প্রথম স্থলেমানের শাসনাধীনে আসে।

উত্তর বিহার অঞ্চল হইতে আক্রমণকারী আফগান সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি কালাপাহাড়ের (রাজু) নেতৃত্বে অশ্বারোহী সৈন্যদল দ্রুতগতিতে পুরীর দিকে অগ্রসর হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহারা বিনা বাধায় পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির অধিকার করিয়া তাহাতে সঞ্চিত বহুদিনের বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত করেন। এই দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণের ফলে উড়িষ্যার রাজবংশের পতন ঘটিল এবং উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

স্থলেমান কররাণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারে এক নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাহারা ক্ষমতাশালী হইয়া একসময় স্থলেমান কররাণীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)। স্থলেমানের সৈন্যবাহিনী কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে তাহাদের পরাজিত করিয়া তাহার রাজাকে বন্দী করিয়াছিল। পরবর্তী সময় স্থলেমান স্বয়ং কোচবিহারের

রাজধানী অবরোধ করিবার সময় উড়িষ্যায় এক অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

স্থলেমান কররাণীর শাসন কালে মোগলেরা বঙ্গদেশে আর কোন অভিযান প্রেরণ করেন নাই। তাহার ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

বায়জিত কররাণী (১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ)

স্থলেমানের মৃত্যুর পর তাহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র বায়জিত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির। তাহার অশিষ্ট ব্যবহারে অমাত্যরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ফলে একদল অমাত্য ইহাদের মধ্যে (লোহানীরাই প্রধান) তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করিলেন। স্থলেমানের ভাগিনেয় ও জামাতা হনসু ইহাদের সহিত যোগদান করিয়া বায়জিতকে হত্যা করিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই লোদীখান ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে বন্দী হইয়া নিহত হন। বায়জিত কররাণী তাহার স্বল্পকালীন রাজত্বের মধ্যে মোগল সম্রাট আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

কালাপাহাড়

স্থলেমান কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দুরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং হিন্দুদের মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিবার জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তী কালে মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। আবুল ফজলের "আকবরনামা", বাদাউনির "মন্তকবুত তারিখ" এবং নিজামুতদৌল্লার "মখজান-ই-আফগানী" প্রভৃতি হইতে প্রামাণিকভাবে জানা যায় যে কালাপাহাড় জন্মগত দিক হইতে মুসলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি সিকন্দর শূরের ভ্রাতা ছিলেন। তাহার অন্য নাম রাজু। ইহা হইতে অনেকে কালাপাহাড়কে হিন্দু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেই যুগে 'রাজু' নামটি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমধিক প্রচলিত ছিল। কালাপাহাড় ইসলাম শাহের রাজত্ব-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দাউদ কররাণীর রাজত্বকাল পর্যন্ত বঙ্গের সৈন্যবাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররাণীর মৃত্যুর সাতবৎসর পরে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল রাজশক্তির সহিত বিদ্রোহী মাসুম কাবুলীর সহিত যুদ্ধে কালা-পাহাড় মাসুমের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

ইহা ভিন্ন আরও একজন কালাপাহাড় ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহ্‌লোদী ও সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক এবং তাহার রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেন এই দুই জনের নাম 'কালপাহাড়' হইয়াছিল সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। "রিয়াজ-উস-সলাতিনের" মতে কালাপাহাড়া বাবরের অন্যতম আমীর ছিলেন এবং আকবরের সেনাপতিরূপে উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। এই তথ্য একেবারে ভিত্তিহীন। দুর্গাচরণ সান্যাল তাহার "বাংলার সামাজিক ইতিহাস" পুস্তকে কালাপাহাড় সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক যাহার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নাই। কাজেই তাহা গুরুত্বসহ বিবেচনার একেবারেই উপযুক্ত নহে।

দাউদ কররাণী (১৫৭২-১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)

হনসুকে বধ করিয়া অমাত্যগণ সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউকে সিংহাসনে বসাইলেন। অল্পবয়স্ক দাউদ অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্ত মস্তিকের লোক ছিলেন। তাহার পর তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও মদ্যপ। পিতার প্রভূত ঐশ্বর্য ও একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লাভ করিয়া তিনিও আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। অমাত্যদের অপমান করিয়া এবং সিংহাসনে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সকল আত্মীয়কে হত্যা করিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যে বহু শত্রুর সৃষ্টি করিলেন। সুযোগ সন্ধানী ও স্বার্থপর কুতলু লোহানী ও গুরজর কররাণী প্রভৃতি অমাত্যগণ কুপরামর্শ দিয়া সুলতান দাউদকে লোদীখানের মত সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করাইয়া তুলিলেন। এমন কি আবুল ফজলও লোদীখানকে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুবিবেচক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোদীখানের জামাতাকে হত্যা করেন।

দাউদ যখন নিজে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন আফগানদের প্রধান সেনাপতি গুরজর খান বায়জিতের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। ক্ষুদ্ধ দাউদ তখন লোদীখানকে ইহাদের বিরুদ্ধে বিহারে পাঠাইলেন। এদিকে আকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্যে খান-ই-খানন মুনিম খানকে পাঠাইলেন। এই সংবাদে লোদীখান ও গুজরখান নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া মুনিম খানকে উপঢৌকন পাঠাইয়া মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন।

ঘটনার এই পরিণতিতে দাউদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিহারে সৈন্যসহ যাত্রা

করেন। ইতিমধ্যে আকবর গুজরাট অভিযান শেষ করিয়া মুনিম খানকে আরও সৈন্য পাঠাইলেন। মুনিমখান সৈন্যসহ আবার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত ত্রিরোহিনী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া দাউদ কুতলু লোহানী, গুজরখান এবং তাহার সেনাপতি শ্রীহরির পরামর্শে লোদীখানের প্রতি বিনীত অনুরোধ করিয়া তাহাকে নিজ শিবিরে আহ্বান করেন। লোদীখান তাহার শিবিরে আসিলে তাহাকে হত্যা করা হইল। এই ঘটনা আফগানদের মধ্যে ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্বের শুরু হয়।

আকবর বিপুল সৈন্যসহ নিজেই বিহারে আসিয়া উপস্থিত হন এবং পাটনার ওপারে হাজিপুর দুর্গ অধিকার করেন। ইহাতে অত্যন্ত ভয় পাইয়া দাউদ জল-পথে বঙ্গদেশের দিকে পলায়ন করেন। বিনাবাধায় প্রচুর ধনরত্নসহ মোগলরা পাটনা অধিকার করে। এর পর আকবর মুনিমখানকে পাঠানদের অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া ফিরিয়া যান। তিনি বিনা বাধায় তেলিয়াঘেরির গিরিপথের নিকট উপস্থিত হইলেন। এইখানে দাউদ যখন তাহার সৈন্যসামন্ত লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন মুনিমখান স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে রাজমহল পর্বতমালার মধ্যদিয়া তেলিয়াঘেরির দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইলেন। এবারও আফগানরা যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিল। মুনিমখান বিনা বাধায় মালদহের নিকটবর্তী বঙ্গদেশের রাজধানী তাণ্ডা অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

দাউদ তখন হুগলীর সাতগাঁও-এর মধ্যদিয়া উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করিলেন। মুনিমখান রাজা টোডরমল ও মহম্মদকুলি খানকে তাহার পশ্চাৎধাবন করিতে পাঠাইলেন। অন্যান্য অফগান নায়কেরা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কালাপাহাড়, সুলেমান খান প্রভৃতি ঘোড়াঘাটে গেলেন। তাহাদের দমন করিবার জন্য মুনিমখান মজনুনখান কাকশালকে পাঠাইলেন। এইখানে সুলেমান খান নিহত হইলে অন্যান্যরা কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে মোগল সেনাবাহিনী বর্ধমান হইতে গড়মান্দারনে উপস্থিত হইল। তখন রাজা খবর পাইলেন দাউদ মেদিনীপুর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ডেবরাকাসারি নামক স্থানে রহিয়াছেন। মোগল সৈন্যের আগমনের খবর শুনিয়া দাউদ দাঁতনের ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গড় হরিপুরে আশ্রয় নেন। এইখানে মোগল সেনানায়ক মহম্মমকুলি দেহত্যাগ করিলে মোগল সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন টোডরমল প্রত্যাবর্তন করেন। এই সংবাদে মুনিম খান একদল সৈন্যসহ বর্ধমান হইতে মান্দারনের

পথে রওনা হইলেন। মোগল সৈন্যরা প্রথমে যুদ্ধ করিতে চাহিল না। মুনিম খান ও টোডরমল অনেক বুঝাইয়া তাহাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয় লোকেদের সাহায্যে মোরানের পথে জঙ্গলের মধ্যদিয়া দক্ষিণ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া দাঁতনের ১১ মাইল পূর্বে নানজুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এইবার দাউদকে পশ্চাত হইতে আক্রমণ করিবার সুযোগ আসিল। দাউদ পূর্বেই তাহার পরিবারবর্গকে কটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উপায়ন্তর না দেখিয়া সুবর্ণরেখা নদীর তীরে দাঁতনের ৯ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত তুখরই গ্রামে দাউদ মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিলেন (১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রবল যুদ্ধের পর নিজের নির্বুদ্ধিতায় শেষ পর্যন্ত দাউদ পরাজিত হইলেন। তাহার প্রধান সেনাপতি গুজরখান অসংখ্য সৈন্যসহ নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে অসংখ্য মোগল সৈন্য নিহত হয়। সেইজন্য সাধারণ লোকের নিকট এই স্থান মোগলমারি নামে প্রসিদ্ধ। দাউদ সৈন্যসহ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলে তাহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মোগল সৈন্যরা তাহাদের পশ্চাতধাবন করিয়া বিনাবাধায় নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, করিয়া বহু আফগানকে হত্যা করিল। বৃদ্ধ (৮২ বৎসর) মোগল সেনাপতি অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বন্দী আফগানদের হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্নমুণ্ড দ্বারা আটটি উচ্চ মিনার তৈরী করিলেন।

টোডরমল দাউদের পাশ্চাত ধাবন করিলেন। তিনি কোথাও স্থিতি হইতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত কটক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া দাউদ নিজে মুনিম খানের নিকট আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মুনিম খান দাউকে উড়িষ্যার জায়গীর দান করিয়া তাণ্ডায় ফিরিয়া আসিলেন।

মুনিম খানের অনুপস্থিতির সুযোগে আফগান নায়ক কালাপাহাড় ও আরও একজন কোচবিহার হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোড়াঘাটে মোগল সৈন্যদের পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। এই খবর শোনামাত্র তিনি সৈন্যসহ ঘোড়াঘাটের পথে রওনা হইলেন। ঘোড়াঘাটে পৌছিবার পূর্বে তিনি প্রাচীন গৌড় অধিকার করিলেন। তিনি মনে মনে গৌড়ে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করিবেন চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুকাল পরিত্যক্ত থাকায় গৌড় খুবই অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। ফলে মোগল সৈন্যরা অসুস্থ হইয়া দলে দলে মারা যাইতে লাগিল। ফলে মুনিম খান তাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঠিক তাহার দশদিন পরে ৮২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

এইবার আকবর হোসেন কুলিবেগ ওরফে খানই জাহানকে বঙ্গের শাসনকর্তা

নিযুক্ত করেন। তিনি সংবাদ পাইলেন দাউদ কররাণী আবার বিদ্রোহ করিয়াছেন এবং ভদ্রক, জলেশ্বর প্রভৃতি মোগল অধিকৃত অঞ্চল জয় করিয়া পুনরায় সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছেন। যুদ্ধে অনিচ্ছুক মোগল সেনাদের টোডরমল মিষ্টিবাক্য, চতুর ব্যবহার এবং অকৃপণ অর্থদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া শেষ পর্যন্ত বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা সহজেই তেলিয়াঘেরি অধিকার করিলেন। দাউদ তখন রাজমহলে পরিখা খনন করিয়া সৈন্যসহ অবস্থান করিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহলে মোগল ও আফগানদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উড়িষ্যার শাসনকর্তা জাহানখানের মৃত্যু হয়। কালাপাহাড় এবং কুতলু খান আহত অবস্থায় পলায়ন করেন। দাউদ বন্দী হন এবং সন্ধিভঙ্গের অপরাধে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাহার ছিন্ন মস্তক আকবরের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বঙ্গের প্রথম আফগান শাসক শের শাহ এবং শেষ শাসক দাউদ কররাণী। তাহারা ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দাউদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে আফগান যুগ শেষ হইল। তবে অবশ্য ইহার পরেও বিভিন্ন অঞ্চলে আফগান নায়কেরা আঞ্চলিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে চাহিয়াছিল। তাহাদের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে আরও অনেক সময় লাগিয়াছিল।

এইভাবে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদের পরাজয়ের ফলে বঙ্গদেশে মোগল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হইল। অর্থাৎ বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। উড়িষ্যায় মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা টোডরমল সেই সময়ে যে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে উড়িষ্যা প্রদেশ ৫টি সরকার ও ৯৯টি মহলে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ অঞ্চলই "সরকার জলেশ্বরের" অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত ২০টি মহলই ছিল মেদিনীপুর জেলায়। এই ২০টি মহল হইল (১) বগড়ী, (২) ব্রাহ্মণভূম, (৩) মহাকালঘাট (কুতুবপুর), (৪) মেদিনীপুর, (৫) খড়্গপুর, (৬) কেদারকুণ্ড, (৭) কাশিজোড়া, (৮) সবঙ্গ, (৯) তমলুক, (১০) নারায়ণপুর, (১১) তরকোল, (১২) মালঝিটা, (১৩) বালিশাহী, (১৪) ভোগরাই, (১৫) দ্বারশরভূম, (১৬) জলেশ্বর, (১৭) গাগনাপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই বা কেরৌলী এবং (২০) বাজার। এছাড়া সেকালের বাঙ্গলার 'সরকার' মান্দারনের অন্তর্গত চিতুয়া, সাহাপুর মহিষাদল ও হাভেলি মান্দারন নামে আরো চারটি মহাল মেদিনীপুরে যুক্ত হইয়াছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। History of Bengal, Vol. II (D.U.), Pp. 168-195

২। বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ১১৪-১৩১

৩। Muslim Administration in Orissa, M. A. Haque, Pp. 64-77

৪। History of Medieval Bengal, R. C. Mazumdar, Pp. 68 79

৫। মেদিনীপুরের ইতিহাস, যোগেশচন্দ্র বসু, পৃঃ ১৭৭-১৮২

৬। District Gazetteer, Midnapur (1921), O'Malley Pp. 21-24

চতুর্থ অধ্যায়

মোগল শাসন

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার পরবর্তী প্রায় ২০ বৎসর এই প্রদেশে মোগল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তখন বঙ্গদেশে একজন মাত্র মোগল সুবাদার ও অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফলে শুধু রাজধানী এবং ঐ সমস্ত সেনানিবাসের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ মোগল শাসন মানিয়া চলিত। দেশের অন্যসব অঞ্চলে তখনও বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলিতেছিল। নেতৃত্বহীন আফগান সৈন্যদল দেশের সর্বত্র লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। আঞ্চলিক জমিদারগণ প্রায় স্বাধীন অবস্থায় যে যার নিজস্ব খুশিমত শাসন চালাইত। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল।

দাউদের মৃত্যুর পর তিন বৎসরের অধিককাল দক্ষতার সহিত খান-ই-জাহান বঙ্গদেশ শাসন করিবার পর মারা যান (১৫৭৮ খ্রীঃ)। পরবর্তী সুবাদার মুজাফ্ফর খান এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। এই সময় আকবর মোগল সাম্রাজ্যের নূতন শাসন নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি সমগ্র প্রদেশকে কতকগুলি সুবায় বিভক্ত করিয়া প্রতি সুবায় একজন করিয়া শিপাহশালার বা সুবাদার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষদের দিল্লী হইতে নির্বাচন করিয়া পাঠাইলেন। রাজস্ব আদায়ের নূতন ব্যবস্থা হইল। ইহার ফলে বঙ্গ ও বিহারে মোগল কর্মচারীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কাবুলের শাসনকর্তা আকবরের ভ্রাতা মীর্জা হাকিমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার জন্য যাহারা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মুজাফ্ফর খান বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। বিদ্রোহীরা মীর্জা হাকিমকে সম্রাট ঘোষণা করিল। ফলে বঙ্গ ও বিহার মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বঙ্গদেশে মোগল সেনা-বাহিনীর প্রধান সামরিক ঘাটিও সরকারী আবাস ছিল মালদহে ১৫ মাইল দূরে তাণ্ডায়। এখান হইতে দক্ষিণ দিকে বর্ধমান হইয়া হুগলী পর্যন্ত শাসনক্ষমতা বিস্তৃত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল আরামবাগ মহকুমা। তখন যাহার নাম ছিল মান্দারন সরকার। আধুনিক যুগের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ইহার অন্তর্গত ছিল এবং ইহা ছিল মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্যে ঝাড়খণ্ডের প্রধান পথ। কিন্তু বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ ঘাটাল তখনও ছিল বঙ্গসুবার অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষিণ অংশ (মেদিনীপুর শহরের কিছু অংশ) উড়িষ্যা সুবার জলেশ্বরের অন্তর্গত ছিল। অর্থাৎ এই সময়ে মেদিনীপুর নামে কোন পৃথক জেলা ছিল না।

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর খান-ই-আজমকে বঙ্গের সুবাদার করিয়া পাঠান। খান-ই-আজম মাসুম কাবুলীর অধীন সম্মিলিত পাঠান বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন। কিন্তু তাহাতেও বিদ্রোহ একেবারে দমিত হইল না। মাসুম কাবুলী অন্য আফগান বিদ্রোহী নায়ক ঈশাখানের সহিত যোগ দিলেন। পরবর্তী সুবাদার শাহবাজ খান বহুদিন ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তেমন সুবিধা করিতে না পারিয়া রাজধানী তাণ্ডায় ফিরিয়া যান। এই সুযোগে মাসুম ও অন্যান্য পাঠান নায়কেরা মালদহ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষ পর্যন্ত মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন (১৫৮৪ খ্রীঃ)।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আফগান বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য আকবর অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। তখন শাহবাজ খান যুদ্ধের পরিবর্তে তোষণ ও উৎকোচ দিয়া বিদ্রোহী অনেক পাঠান নায়কদের বশীভূত করিলেন। কিন্তু উড়িষ্যায় আফগান নায়ক কতলু খান নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তিনিও বঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলেন না, শাহবাজ খানও তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন না। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বঙ্গদেশে ও অন্যান্য মোগল প্রদেশের ন্যায় নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যবস্থায় ওয়াজির খান প্রথমে সিপাহশালার নিযুক্ত হইলেন (সুবাদার)। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইলে সৈয়দ খানকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। তাহার দীর্ঘ শাসনের কালে (১৫৮৭-৯৪ খ্রীঃ) বঙ্গদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আফগান শাসকগণ খুবই শক্তিশালী হইয়া ওঠেন।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সেনাবাহিনীর মধ্যে এক বিদ্রোহের সুযোগে উড়িষ্যার আফগানগণ কতলু খানের নেতৃত্বে ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ জয় করিয়া নেন। এই বিদ্রোহকে দমন করিয়া বঙ্গ ও বিহারকে পুনরায় সংহত করিতে মোগলদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই সময়কালের মধ্যে উড়িষ্যার আফগানরা সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গসহ দামোদর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত অঞ্চলের উপর শাসন কার্য চালাইয়া ছিলেন। অবশেষে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সেনাবাহিনী ফিরিয়া আসিলে তখন আফগানদের বিরুদ্ধে এক বিপুল মোগল সেনাদল প্রেরণ করা হইল। এই সংবাদে কতলু খান সমগ্র অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। পরের বৎসর (১৫৮৪ খ্রীঃ) আফগানরা পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু মোগল বাহিনীর আগমনের

সংবাদে তাহারা পিছু হটিয়া "তুকরায়" (মোগলমারি) দুর্গে আশ্রয় নেয়। ইহার পর বঙ্গদেশের মোগল শাসক কতলু খানের সহিত সন্ধি করেন। সর্তানুসারে কতলু খান মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলে তাহাকে মেদিনীপুরসহ উড়িষ্যার শাসনভার চালাইবার অধিকার দেওয়া হইল।

রাজা মানসিংহ

আফগানদের নিকট হইতে উড়িষ্যা জয় করিবার উদ্দেশ্যে বিহারের মোগল শাসক মানসিংহ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে এক অভিযান প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে বর্ষা আরম্ভ হইলে তিনি বাধ্য হইয়া জাহানাবাদে (বর্তমান আরামবাগ) অপেক্ষা করেন, ইহাই ছিল তখন উড়িষ্যার সীমান্ত। কারণ উড়িষ্যার আফগানদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল মেদিনীপুর। মানসিংহ তাহার পুত্র জয়সিংহের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল উড়িষ্যার দিকে প্রেরণ করিলেন। তাহার অনভিজ্ঞ পুত্র আফগানদের দ্বারা প্রতারিত হইয়া নিজের কর্তব্য ভুলিয়া যখন মদ্যপানে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় আফগানদের দ্বারা অতর্কিত আক্রমণে তিনি পরাজিত ও আহত হন। আহত অবস্থায় বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর তাহাকে রক্ষা করেন। এই যুদ্ধে কয়েকজন বিখ্যাত মোগলবীর (বিকর রাথো, মহেশ দাস, নরুচরণ প্রভৃতি) নিহত হন। এই ঘটনার ঠিক দশদিন পরে কতলু খান মারা যান এবং তাহার কনিষ্ঠ পুত্র নাসির খানকে তাহার বিজ্ঞ উজির খাজা ঈশা সিংহাসনে বসান। তিনি মোগলদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন যাহাতে আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত জগন্নাথদেবের মন্দির ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ সম্রাট আকবরকে ছাড়িয়া দিবার অঙ্গীকার করা হয়। বালক রাজা মানসিংহের নিকট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া ১৫০টি হস্তিসহ প্রচুর ধনসম্পদ উপঢৌকন দেন। এই সাফল্যের পর মানসিংহ বিহারে ফিরিয়া যান।

কিছুদিনের মধ্যে বিচক্ষণ উজির খাজা ঈশার মৃত্যু হইলে বালক আফগান রাজা অন্যান্য আফগান আমীরদের সংযত করিতে পারিলেন না। তাহারা সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিয়া মোগল প্রতিনিধির হাত হইতে জগন্নাথ মন্দির দখল করিলেন এবং মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য মল্লরাজ বীরহাম্বীরের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন। মানসিংহ পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিহার পরিত্যাগ করিয়া তিনি বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহার সেনাবাহিনীর একটি দল গঙ্গা হইয়া জলপথে, অন্য একটি দল স্থলপথে বঙ্গদেশের শাসক সৈয়দ খানের নেতৃত্বে অগ্রসর হইতে লাগিল। আফগানরা

মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহলের দিকে সমবেত হইলেন এবং তাহাদের সহিত শেষ পর্যন্ত ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী 'বেনাপুর' নামক স্থানে (যাহা জলেশ্বরের প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত) যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে আফগানরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। এইবার মানসিংহ সসৈন্যে জলেশ্বরের দিকে অভিযান শুরু করেন এবং ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের মধ্যে তিনি মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অধিকার করিয়া নেন। এইভাবে বিজয়কার্য সমাপ্ত করিয়া মানসিংহ আকবরের নামে খুৎবা পাঠ করেন এবং মুদ্রা প্রচলন করেন।

মানসিংহ শাসন ব্যাপারে কিছু রদবদল করিয়া উড়িষ্যায় আফগানদের সংযত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার আফগানগণ ওসমান সুজাওয়ারের নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হইল, এবং উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চল অধিকার করিয়া লইল। এই সংবাদে মানসিংহ আজমীর হইতে দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে শেরপুরের নিকট (বীরভূম) ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে ওসমান আরও এক বৃহৎ সৈন্যদলকে সংগঠিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পর আফগানরা মোগলদের বিরুদ্ধে আর বিদ্রোহ করিবার সাহস পায় নাই।

আফগান শাসনের কালে এই অঞ্চলের শাসনভাগ মোটামুটি দুইটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা জলেশ্বর ও মান্দারন। ইহার উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে যথাক্রমে চেতুয়া, মণ্ডলঘাট এবং হিজলী মহল। আর মেদিনীপুর জেলার বাকি অঞ্চলটি (২৩-২৪টি মহল) হয় পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত ছিল।

এইভাবে রাজা মানসিংহ যখন বিহারে মোগল শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে (১৫৯০-১৫৯৩ খ্রীঃ) উড়িষ্যা বিজয় সমাপ্ত করেন। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশেও মোগল শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তখন তিনি রাজমহলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন যাহার নাম দেন "আকবর নগর"। রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আফগান ও হিন্দু শক্তিশালী জমিদারদের (যাহারা ইতিহাসে বারভূইঞা নামে পরিচিত— ইশাখাঁ, মুশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি) বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। তাহাদের কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করিলেও আকবরের কঠিন অসুস্থতার সংবাদে তিনি ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী ফিরিয়া যান।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গের মোগল শাসক ছিলেন ইসলাম খাঁ (১৬০৫-১৩ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। সেজন্য তিনি ক্রমাগত এই ভূইঞাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে বঙ্গদেশে মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তাহার এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় এবং ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে মোগল প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। যদিও মানসিংহই তাহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন তথাপি বঙ্গদেশের জয়ের গৌরব এবং মোগল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার গৌরব তাহারই প্রাপ্য। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমদিকে মোগল শাসনের সীমা খুব একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলে সুরক্ষিত মোগল ঘাটিগুলি সম্পর্কে এবং তথাকথিত বারভূইঞাদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ দুইটি গ্রন্থে পাওয়া যায় (১) আবুল ফজলের "আকবর নামা" ও (২) মীরজা নাথান রচিত "বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবি" নামক গ্রন্থে।

এই 'বাহারিস্তান' হইতে জানা যায় জাহাঙ্গীরের বঙ্গদেশের রাজ্যসীমার পশ্চিমে পরস্পর নিকটবর্তী তিনটি শক্তিশালী জমিদারদের উপস্থিতি। ইহাদের একজন হইলেন বীরভূম, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের বীরহাম্বীর। একজন দক্ষিণ-পশ্চিমের পাঁচেৎ অঞ্চলের শাসক শামস খান। অন্যজন পাঁচেৎ-এর দক্ষিণ-পূর্বে হিজলীর শাসক সেলিম খান। ইহারা প্রত্যেকেই ইসলাম খাঁর প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিতেন। অথচ ইহারা কেহই ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্য প্রকাশের জন্য মোগল শাসকের নিকট উপস্থিত হন নাই। মনে হয় ইসলাম খাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই ইহারা সকলেই মোগলদের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। ফলে পরবর্তী শাসক কাসিম খাঁ তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণ করিয়াও তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সেলিম খাঁর মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর খাঁ হিজলীর শাসক হন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মোগলবাহিনীর স্থলপথে আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত চট্টগ্রাম আক্রমণ। এই আক্রমণে মোগলবাহিনী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল।

ইসলাম খাঁ-এর মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাসিম খাঁ (১৬১৪-১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গদেশের সুবাদার হন। তাহার বুদ্ধি ও যোগ্যতা একেবারেই ছিল না। ফলে তাহার নেতৃত্বে প্রেরিত মোগল সৈন্যরা তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর আমলে পুনরায় মোগল রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিল। ইব্রাহিম খাঁ যখন আরাকান অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় হিজলীর শাসক বাহাদুর খাঁ উড়িষ্যার প্রদেশ-পাল মুকারাম খানের সাহায্য লাভ করিয়া মোগল শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাহাদুর খাঁর এই অভিযানে মেদিনীপুর জেলার কিছু ছোট জমিদারও তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। চন্দ্রকোনার জমিদার বীরভান (মতান্তরে চন্দ্রভান) এবং তাহার নাবালক আত্মীয় বড়দা ও সম্ভবতঃ ঝাড়গ্রামের জমিদার দলপতও মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযানে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র সাহজাহান বিদ্রোহী হইয়া পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পরাজিত হইলে বঙ্গদেশের দিকে চলিয়া আসেন। সাহজাহান বঙ্গদেশে বিদ্রোহী আফগানদের ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের সাহায্যে এই অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করেন। স্বাভাবিক কারণে পিতাপুত্রের এই বিবাদের ফলে ইব্রাহিম খাঁ খুবই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ইব্রাহিম খাঁর সহিত সাহজাহানের রাজমহলের নিকট প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ পরাজিত হইলে সাহজাহান জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) অধিকার করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তখন ইব্রাহিম খাঁ তাহার এক আত্মীয় মহম্মদ বেগ আবাকাশকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠান। তাহার সৈন্যবাহিনীতে ২০০টি রণতরীও ছিল। এই সংবাদ পাইয়া বাহাদুর খাঁ তাহার বন্ধু মুকারাম খানের নিকট হইতে ১০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সাহায্য হিসাবে পাইলেন। তাহার সাহায্যে হিজলীর দুর্ভেদ্য দুর্গ মোগলদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হন। ঠিক একই সময়ে যশোর অঞ্চলে ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের আক্রমণও শুরু হইল। এই দ্বৈত বিপদের মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে ইব্রাহিম খাঁ ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ফিরিঙ্গীদের সহিত অভিযানে জলপথে দিক হারাইয়া পাঁচদিন সময় নষ্ট করিলেন। ফলে ভগ্ন মনোরথ অবস্থায় তিনি যশোহর হইতে দিল্লীর দিকে রওনা হইলেন। ইব্রাহিম খাঁ যশোহরে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র মীরজা আহম্মদ খানের নিকট হইতে বিপুল সৈন্য সাহায্য লাভ করিলেন। ইহাদের আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য মনে করিয়া বাহাদুর খাঁ ব্যক্তিগতভাবে শান্তির প্রস্তাব করিলেন। তাহাকে তিন লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড করা হইল কিন্তু তাহার জায়গীর ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

রাজমহলের যুদ্ধ জয়ের পূর্বেই সাহজাহান উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে তখনকার মোগল শাসকদের কাপুরুষতার জন্য তিনি বিনাযুদ্ধে উড়িষ্যা

জয় করিয়াছিলেন। সাহজাহান প্রথমে খুরদার দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার রাজা পুরুষোত্তমদেব ও অন্যান্য জমিদারগণ তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তখন তিনি কটকের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি হুগলী ও পিপলির পর্তুগীজ শাসকদের প্রেরিত মূল্যবান উপহারসহ রাষ্ট্রদূতদের সহিত মিলিত হন। কটক হইতে সাহজাহান বিনাবাধায় মেদিনীপুর অধিকার করিয়া পরে বর্ধমানের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। এখানেই তিনি প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হন। বর্ধমানের ফৌজদার তাহার সহিত যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়া নিজের দুর্গ সুরক্ষার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি দীর্ঘদিন অবরোধ ব্যবস্থা রক্ষা করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। সাহজাহান বর্ধমান জয় করিয়া বৈরামবেককে ইহার শাসনভার অর্পণ করিয়া উত্তর দিকে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। সেই সময়ের বর্ধমানের ভূতপূর্ব ফৌজদার আহাম্মদ বেগ ঢাকার মোগল শাসকদের নিকট বিদ্রোহী রাজপুত্রের গতিবিধির সংবাদ পাঠাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া ইব্রাহিম খান রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। সাহজাহান মুশা খাঁর পুত্র ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের সাহায্যে প্রবল যুদ্ধের পর ইব্রাহিম খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া জাহাঙ্গীর নগর অধিকার করিলেন (১৬২৪ খ্রীঃ)।

এইভাবে বঙ্গদেশের রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) জয় করিয়া বিদ্রোহী সাহজাহান স্বাধীন সুলতানের ন্যায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অবশ্য রাজধানীতে অল্প কয়েক সপ্তাহ থাকিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা জয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে বিহারও অধিকার করিলেন। এইবার বিহার হইতে তিনি পশ্চিমদিকে সৈন্যসহ যাত্রা করিলেন। পথে জৌনপুর, কাশী, চুনার, এলাহবাদ, অযোধ্যা প্রভৃতি অধিকার করিয়া রাজধানী আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে মোগলবাহিনীর নিকট যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন এবং দাক্ষিণাত্যের দিকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

সাহজাহান খান-ই-খানান আবদুল রহিমের পুত্র দরাব খানকে (Darab Khan) বঙ্গদেশের শাসক নির্বাচিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে ইহার সংক্ষিপ্ত শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি কিছুদিনের মধ্যে মোগলদের সহিত হাত মিলাইবার ফলে বঙ্গদেশে সাহজাহানের শাসনকালের আর কোন চিহ্ন রহিল না। সাহজাহান অবশ্য দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লইবার পূর্বে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে একবার ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে দাক্ষিণাত্যের দিকে চলিয়া যান।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে সেনাপতি মহবত খানকে বঙ্গদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া যুবরাজ পারভেজ দাক্ষিণাত্যে সাহজাহানকে মোকাবিলা করিবার জন্য রওনা হইলেন। মহবত খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে পূর্ববর্তী শাসক দরাব খানকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। মহবত খান যদিও একজন অত্যন্ত সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ সেনানায়ক ছিলেন তথাপি সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও তাহার ভ্রাতা আসফ খানের কৌশলে তাহাকে নানাভাবে অপদস্থ করিবার চেষ্টা হইল। ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হন এবং দাক্ষিণাত্যের যুবরাজ সাহজাহানের নিকট চলিয়া যান। মহবত খানের পুত্রকেও শাসনভার হইতে অপসারিত করা হয়। ইহাদের শাসনের পর মোকারাম খান নামক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বঙ্গদেশের শাসনভার দেওয়া হয়। কিন্তু তাহারও আকস্মিক-ভাবে জলে ডুবিয়া মৃত্যু হয় (১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

জাহাঙ্গীর এইবার ফিদাই খানকে (Fidai Khan) বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি সম্রাটকে এবং সম্রাজ্ঞীকে পৃথক পৃথকভাবে পাঁচলক্ষ টাকার উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬২৮ খ্রীঃ)। তিনি কাশিম খানকে বঙ্গদেশের শাসক নিয়োগ করেন।

সাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরবর্তী ৮০ বৎসর (১৬২৪-১৭০৭ খ্রীঃ) বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দীর্ঘ এই ৮০ বৎরর বঙ্গদেশের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি পূর্বেকার অপেক্ষায় একেবারে স্বতন্ত্র ছিল। মোগল শাসন আরম্ভ হইবার পর সাহজাহানের সিংহাসন আরোহণ করা পর্যন্ত বঙ্গদেশে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিয়া মোগল শাসন সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যয় হইয়াছিল। পরবর্তী প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে অভ্যন্তরীণ কোন রকমের বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। দীর্ঘদিন শান্তির ফলে যে সমৃদ্ধির সূচনা হইয়াছিল তাহা মোগলদের উত্তর এবং দক্ষিণ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সাফল্যপূর্ণ আক্রমণাত্মক নীতির মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায়।

এই পরিবর্তন সম্ভবতঃ আরও একটি কারণে ঘটিয়াছিল। ১৬৩৯-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ এই ৬৮ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে তিনজন মাত্র শাসক ছিলেন যেখানে পূর্বে কোন শাসকই দুই অথবা তিন বছরের অধিককাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। যুবরাজ সুজা দীর্ঘ ২১ বৎসর প্রায় বঙ্গদেশের শাসক ছিলেন। শায়েস্তা খানও ২৩ বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন এবং যুবরাজ মহম্মদ আজিম

(পরবর্তীকালে আজিম-উস্-শান) দশ বৎসর শাসন চালাইয়া ছিলেন। দীর্ঘদিন শাসন পরিচালনার দায়ীত্ব ছাড়াও তাহারা ছিলেন হয় মোগল রাজপরিবারের সন্তান অথবা খুবই উচ্চপদস্থ কর্মচারী অথবা রাজপরিবারের নিকট আত্মীয়। ফলে তাহারা সব সময়ই মোগল সম্রাটদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন।

সাহজাহানের রাজত্বের তিনটি বিশেষ ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হইল পর্তুগীজদের নিকট হইতে মোগলদের হুগলী বন্দর অধিকার, দ্বিতীয়টি হইল তাহাদের আসাম অভিযান, যাহা শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক কারণে বিফল হইয়াছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বশেষ ঘটনা হইল সাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

সাহজাহান কর্তৃক প্রেরিত বঙ্গদেশের শাসক কাশিম খান তাহার রাজত্বের প্রথমভাগ পর্তুগীজদের হুগলী বন্দর হইতে বিতাড়িত করেন (১৬৩২ খ্রীঃ) অহম রাজাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর মোগলেরা জয়ী হয় (১৬৩৮ খ্রীঃ)।

সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রীঃ) বঙ্গদেশের শাসক হইয়া আসেন। দীর্ঘদিন মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিলেও তাহার সুদীর্ঘ শাসনকালে বঙ্গদেশে ব্যবসা, বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। সুজাকে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার শাসনের দায়ীত্ব দেওয়া হইয়াছিল। তিনি পূর্বেই বঙ্গ ও বিহারের দায়ীত্ব পাইয়াছিলেন। সুজা নিজেই সীমান্তবর্তী রাজমহলের নিকট থাকিতেন এবং তাহার প্রতিনিধিরা উড়িষ্যায় থাকিয়া শাসনকার্য চালাইতেন। তিনি উড়িষ্যা শাসনের জন্য ঢাকা হইতে মহম্মদ জামান তেহরানীকে (Muhammad Zaman Teharani) পাঠাইলেন এবং ঢাকার শূন্যপদে মীর আবদুল কাশিমকে নিযুক্ত করিলেন। দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন এবং পরে সেথান হইতে আরাকানের দিকে পলায়ন করেন। গোলন্দাজ বাহিনীতে পর্তুগীজ এবং হুগলী তমলুক ও নোয়াখালির সুদক্ষ সেনাগণ নিয়মিত থাকিলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে বিশেষ সুবিধ করিতে না পারায় বাধ্য হইয়া তাহাকে আরাকানের দিকে পলায়ন করিতে হয়। মোগল সেনাপতি মীরজুমলা তাহার পশ্চাৎধাবন করিয়া ঢাকা নগরী অধিকার করেন (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ)।

শাহসুজার সময়কালে বঙ্গদেশের শান্তি বিরাজিত ছিল। কিন্তু ইহার বর্ণনা তেমন কোন সমসাময়িক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সম্রাটের পুত্র হিসাবে তাহার ক্ষমতা ও মর্যাদা ছিল এমন, যাহাতে সকলেই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত।

ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মীরজুমলাকে বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত করেন। মীরজুমলা অহম রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম সাফল্যলাভ করিলেও পরে বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় অহমদের বিরুদ্ধে আক্রমণে খুবই বিপর্যস্ত হইয়া পড়েন। এমত অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হইয়া মীরজুমলা রাজধানীতে পৌছিবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে হিজলীর বাহাদুর খাঁ যাহার জমিদারীর সীমা রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী উপকূলরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি বারভুইঞাদের একজন শেষ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি নিজেকে একজন স্বাধীন সুলতান বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজের নামের সহিত "মসনদ-ই-আলা" এই গৌরবসূচক উপাধি ব্যবহার করিতেন। ফাদার সেভাষ্টীয়ন ম্যানরিক তাহাকে দেশের সম্রাটদের ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার রাজ্যাঞ্চল ভৌগোলিক দিক হইতে অনিয়ন্ত্রিত উড়িষ্যা সুবার অন্তর্গত ছিল। সেইজন্য তিনি নিরাপদে বঙ্গদেশের শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন।

১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সুজা যখন বঙ্গের সহিত উড়িষ্যার শাসনভার পাইলেন তখন এই গর্বিত পাঠানের চৈতন্যের উদয় হইল। সাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিক ওয়ারিস (Waris) লিখিয়াছেন যে হিজলীর জমিদার উড়িষ্যার সুবাদারের অধীনে কাজ করিতেন এবং তাহাকে কর দান করিতেন। যখন উড়িষ্যা যুবরাজ সুজার শাসনাধীনে আসিল তখন তিনি তাহার নিকট হইতে অতিরিক্ত কর দাবি করিলেন। কিন্তু তিনি কর দিতে বিলম্ব করিলেন। তখন সুজা উড়িষ্যায় তাহার সহকারী শাসক জানবেককে (Janbek) হিজলীর জমিদারকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন এবং হিজলী অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোগল সৈন্যদল হিজলী অধিকার করিয়া বাহাদুর শাহকে বন্দী করিলেন। সম্ভবতঃ তাহাকে ঢাকাতে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে যুদ্ধ বাধিলে যে শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় সেই সুযোগে বাহাদুর শাহ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া নিজের জমিদারী উদ্ধার করেন (১৫৫৯ খ্রীঃ)। পরে মীরজুমলা আবার তাহাকে পরাস্ত করেন।

সুজাকে উড়িষ্যা অঞ্চলে অতিরিক্ত শাসনভার অর্পণের সময় সাহজাহান তাহাকে একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাট পুত্রকে রাজমহল হইতে মাঝে মাঝে বর্ধমান, মেদিনীপুর পর্যন্ত সরকারী কাজে ভ্রমণের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ সীমান্তে মেদিনীপুরে থাকাকালীন উড়িষ্যায় নিযুক্ত তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের সহিত শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করিতে

উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে প্রথমে মেদিনীপুর হইতে জাহানাবাদ (আরামবাগ) এবং সেখান হইতে হুগলীর সাতগাঁও এবং মুকস্থদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) হইয়া রাজধানী রাজমহলে ফিরিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার দেশ ও জনগণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের সুযোগের সহিত প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার ও শিকারের সুযোগ হইবে বলিয়া সম্রাট বিশ্বাস করিতেন।

সুজা অবশ্য বঙ্গদেশে খুব বেশী সুখী ছিলেন না। যদিও তিনি এখানে খুবই আলস্যে এবং আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিন কাটাইতেন। একই সঙ্গে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী ছিলেন।

মীরজুমলার মৃত্যুর পর (১৬৬৩ খ্রীঃ) প্রায় এক বৎসরকাল বঙ্গদেশের শাসনে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ যখন বঙ্গদেশে সুবাদার হইয়া আসেন তখন তাহার বয়স ৬৩ বৎসর। মাঝে এক বৎসর বাদে তিনি মোট ২২ বৎসর ঐ পদে আসীন ছিলেন। তিনি রাজকীয় ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের সহিত নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতেন। তাহা ছাড়া, তিনি ছিলেন সম্রাটের সম্মানীয় মাতুল। উপযুক্ত কর্মচারীর সাহায্যে তিনি কঠোর হস্তে দেশশাসন করিতেন। তাহার সময় পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চট্টগ্রাম জয় করা হয় এবং ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে তাহার নাম "ইসলামাবাদ" রাখা হয়। শায়েস্তা খাঁ-এর নাম এখনও পর্যন্ত বঙ্গদেশে অধিক পরিচিত। সেই সময় বঙ্গদেশে টাকায় পাঁচমণ (মতান্তরে আটমণ) চাল পাওয়া যাইত। তাহার দৈনিক আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা, ব্যয় ছিল এক লক্ষ টাকা। তিনি সর্বদা সম্রাটকে অধিক পরিমাণে অর্থ প্রেরণ করিতেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার কার্যকাল সমাপ্ত হয়।

শায়েস্তা খাঁর পর ঔরঙ্গজেবের ভাতৃপুত্র অপদার্থ খান-ই-জাহান বাহাদুর বঙ্গদেশের সুবাদার হন। এক বৎসর পর তাহাকে ঐ পদ হইতে অপসারিত করা হয়। কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার সময় বঙ্গদেশ হইতে প্রায় দুই কোটি টাকা লইয়া যান।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের হুগলীকে ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কুঠি স্থাপন করে। সেই সময় ভারতের পূর্বদিকে তাহাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উড়িষ্যার বালাশোর কুঠিটি। প্রথমে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ ওলন্দাজদের অপেক্ষা এক-দশাংশ ছিল। ১৬৩২-১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডে যে গৃহযুদ্ধ হয় এবং তাহার পরবর্তীকালে ইংরেজদের সহিত

ওলন্দাজদের যুদ্ধের ফলে এই অঞ্চলে ব্যবসা খুবই মন্দা হইয়া পড়ে। সেই সময় কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের বঙ্গদেশে ব্যবসা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছিল।

ইহার অনতিকাল পরে ভারতবর্ষে ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভ ও ইংলণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব শুরু হওয়ায় ইংরেজ বণিকদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং তাহাদের বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হেজেস (William Hedges) হুগলীতে ইংরেজ কোম্পানীর এজেণ্ট হইয়া আসিলে তিনি বঙ্গদেশে বাণিজ্য ব্যবস্থায় মোগল কর্মচারীদের অবস্থা খুবই খারাপ দেখিলেন। এই অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি ব্যক্তিগতভাবে শায়েস্তা খাঁ-এর দরবারে আবেদন জানাইলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না।

ইংলণ্ডের কোর্টের কর্তৃপক্ষ বঙ্গদেশে অস্ত্রের সাহায্যে মোগল কর্মচারীদের অত্যাচারের মোকাবিলা করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাহারা রাজা দ্বিতীয় জেমসের অনুমতিক্রমে এই উদ্দেশ্যে সৈন্য বোঝাই জাহাজ প্রেরণ করিলেন।

এই সংবাদে ক্ষুব্ধ শায়েস্তা খাঁ তাহাদের বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোগল ফৌজদারকে হুকুম দিলেন। ইংরেজগণ অবশ্য এই যুদ্ধের পরিণতি শুভ হইবে না ভাবিয়াই হুগলী পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাহারা ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া আরও ২৪ মাইল দক্ষিণে সুতানুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে ইংরেজ এজেণ্ট জব-চার্নক শায়েস্তা খাঁ-এর সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জবচার্নক সুতানুটি পরিত্যাগ করিয়া মোগলদের দুর্গ থানা (বর্তমান গাডের্নরিচ) অধিকার করিলেন এবং মেদিনীপুর উপকুলে হিজলী অধিকার করিলেন। ইহার পরে তাহারা আরও অগ্রসর হইয়া মোগল দুর্গ বালাশোর অধিকার করিলেন।

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে শায়েস্তা খাঁর সেনানায়ক আব্দুল সামাদ সৈন্যসহ হিজলীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাহা অধিকার করিলেন। ইংরেজরা তখন তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ হিজলী পরিত্যাগ করিল। ইহার অল্প কিছুদিন পর শায়েস্তা খাঁ ইংরেজদের উলুবেড়িয়াতে দুর্গ নির্মাণ করিয়া বঙ্গদেশে ব্যবসা করিবার নির্দেশ দিলেন। কাজেই জবচার্নক তাহার লোকজনসহ পুনরায় সুতানুটিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে আবার এক গোলযোগ। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জবচার্নক দ্বিতীয়বার সুতানুটি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশের ব্যবসা গুটাইয়া লইয়া মাদ্রাজে যাত্রা করেন। শায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ

করিবার পর ঔরঙ্গজেব ইংরেজদের প্রতি অনেকটা নমণীয় নীতি গ্রহণ করেন এবং তিনি বঙ্গদেশের নূতন শাসককে ইংরেজদের পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসা করিবার নির্দেশ দিলেন।

ইহার পর বঙ্গদেশের শাসক হইয়া আসেন ইব্রাহিম খাঁ। তিনি সাহজাহানের রাজত্বকালে বিখ্যাত আলীমর্দানের পুত্র। তিনি ঢাকায় পৌছিয়া সেখানে ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দেন এবং সম্রাটের আদেশে মাদ্রাজে আশ্রয়কারী ইংরেজ-বণিক জবচার্নককে বঙ্গদেশে আসিয়া পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিতে আদেশ দেন। এর শাসনকালে জবচার্নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট হুগলী জেলার সুতানুটিতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কুঠি স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। তাহার মন্ত্রী আসরফ খানের নিকট হইতে ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক ৩০০০ টাকার বিনিময়ে বিনাশুল্কে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার পান। এইভাবে পরবর্তী ইংরেজ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল কলিকাতার গোড়াপত্তন হইল।

একই সময়ে চন্দননগরে ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র ও চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ইব্রাহিমের শাসনকালে প্রধান ঘটনা হইল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল, চন্দ্রকোনা বিভাগে চেতুয়া, বরদার জমিদার শোভারাম সিংহ-এর বিদ্রোহ (১৬৯৫ খ্রীঃ) রাজ কৃষ্ণরাম সিংহ নামক একজন পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয় বর্ধমান জেলার রাজস্ব আদায়ের ইজারা লইয়াছিলেন। শোভারাম সিংহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে লুণ্ঠন আরম্ভ করিলে বর্ধমানের কৃষ্ণরাম সামান্য সৈন্যসহ তাহাকে বাধা দেন। যুদ্ধে রাজা কৃষ্ণরাম নিহত হন এবং শোভারাম সিংহ বর্ধমান দখল করিয়া তাহার স্ত্রী ও কন্যাদের বন্দী করেন (১৬৯৬ খ্রীঃ)। বর্ধমান রাজ্যের বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি লাভ করিয়া বিদ্রোহী শোভারাম সিংহ খুবই শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। তাহার অনুচর সংখ্যা প্রভৃত পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি নিজে রাজা উপাধি ধারণ করেন। উড়িষ্যার আফগান নেতা রহিম খাঁ তাহার সহিত যোগদান করিলে তাহার শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ বিভিন্ন অঞ্চলের উপর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন ও অধিকার আরম্ভ করেন।

রাজা কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পর পুত্র জগত রায় ঢাকায় পলায়ন করিয়া ইব্রাহিম খাঁ-এর নিকট আশ্রয় নেন। ইব্রাহিম খাঁ প্রথমে এই বিপদকে তুচ্ছ মনে করিয়া উপেক্ষা করেন। সে জন্য তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন মনে করিলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন বিদ্রোহীরা লুণ্ঠন করিয়া ধনসম্পদ আত্মসাৎ করিবার পর নিজেরাই এই কার্য হইতে বিরত

হইবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের ফৌজদার নূরুল্লাখানকে শোভারাম সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। নূরুল্লাখানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি। সেইহেতু তিনি নিজে আক্রমণ করিয়া হুগলীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা এই দুর্গকে অবরোধ করিল এবং শহর লুণ্ঠন করিতে শুরু করিল। উপায়ন্তর না দেখিয়া কাপুরুষ নূরুল্লা গোপনে পলায়ন করিল। এই অবস্থায় ওলন্দাজ বণিকেরা হুগলীর প্রজাদের কাতর প্রার্থনায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিল। শোভারাম সিংহ হুগলী ত্যাগ করিয়া বর্ধমানের দিকে পলায়ন করিলেন। তবে গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ প্রায় সমস্ত ভূভাগ বিদ্রোহীদের হাতে রহিয়া গেল। তাহারা প্রায় প্রত্যেকদিন বিভিন্ন গ্রামে এমনকি চন্দন-নগরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত লুণ্ঠন ও আক্রমণ চালাইতে লাগিল। এইভাবে শোভারাম সিংহ গঙ্গার পশ্চিমে হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ১৮০ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। এই অঞ্চলের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে ছিল হুগলী। তিনি স্থল ও জলপথে চলাচলকারী লোকেদের এবং ব্যবসায়ীদের উপর টোল-শুল্ক আদায় করিতেন।

হুগলী পরিত্যাগ করিয়া শোভারাম রহিম খাঁকে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া বর্ধমানে গেলেন। এইখানে তিনি রাজা কৃষ্ণরায়ের এক কন্যার উপর বলাৎকার করিতে উদ্যত হইলে এই তেজস্বিনী মহিলার ছুরিকাঘাতে নিহত হন এবং ঐ মহিলা পরে আত্মহত্যা করেন। শোভারাম সিংহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ তাহার উত্তরাধিকার লাভ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই অপদার্থ। ফলে বিদ্রোহী সৈন্যগণ রহিম খাঁকে তাহাদের দলপতি মনোনিত করিল এবং তিনি নিজে রহিমশাহ নাম ধারণ করিয়া রাজপদ অধিকার করিলেন। চারিদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোক তাহার দলে যোগদান করিবার ফলে তাহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দশসহস্র অশ্বারোহী, ৬০ হাজার পদাতিকে দাঁড়াইল। এই বিপুল সৈন্যসহ তিনি নদীয়ার মধ্যদিয়া মুকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই শহরের উপকণ্ঠে নমাত খান নামক একজন জায়গীরদার তাহাকে বাধাদানের চেষ্টা করিলে তিনি এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েই নিহত হইলেন। ৫০০০ মোগল সৈন্যকে পরাজিত করিয়া রহিম মুকসুদাবাদে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন শুরু করিলেন। ইহার নিকটবর্তী বিখ্যাত রেশম উৎপাদন কেন্দ্র মুকসুদাবাদের বণিকগণ প্রচুর অর্থদান করিয়া লুণ্ঠনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। এইবার তাহার সৈন্যবাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে লুণ্ঠন করিতে শুরু করিল। এইভাবে

বৎসরের শেষ দিকে (১৬৯৭ খ্রীঃ) রাজমহল ও মালদহ অধিকার করিলেন। মনে হয় রহিম যখন এইভাবে উত্তর দিকে অভিযান চালাইতে ছিলেন তখন হিম্মৎ সিংহ সম্ভবতঃ বর্ধমানে ছিলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব শোভাসিংহ রহিম খাঁ-এর ব্যাপারে কর্তব্যের অবহেলার সংবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিয়া নিজ পৌত্র আজিমুদ্দিনকে বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন (১৬৯৭ খ্রীঃ)। যুবরাজ বঙ্গদেশে পৌছিবার পূর্বেই তিনি ইব্রাহিম খাঁ-এর পুত্র জবরদস্ত খানকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। এই তরুণ উৎসাহী যুবক সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় উপস্থিত হইলেন রহিম খাঁ গঙ্গার বাম উপকূলবর্তী ভগবানগোলা পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষা করিলেন এবং সেখানে জবরদস্ত তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিলেন। দুইদিন যুদ্ধে মোগল গোলন্দাজবাহিনীর আক্রমণে আফগানরা পরাজিত হইল এবং এখানকার ঘাটি দখল করা হইল। দ্রুতগামী মোঘল অশ্বারোহীবাহিনী মালদহ, রাজমহল, মুকসুদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লইল। জবরদস্ত খানের জোরালো অভিযানের ফলে হিম্মৎ সিংহ ও রহিম খান মুকসুদাবাদ ও বর্ধমান হইতে পলায়ন করিয়া চন্দ্রকোনার জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

এই সময় বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হইল। জবরদস্ত খান বর্ধমানে এবং যুবরাজ অজিম-উস-সান মুর্শিদাবাদে নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে যুবরাজ বর্ধমানে পৌছিয়া জবরদস্ত খানের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করিয়া তাহাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিলেন। ইহাতে জবরদস্ত খান বর্ধমান ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট চলিয়া যান।

অজিম-উস-সান প্রায় এক বৎসর বর্ধমানে ছিলেন। এই সময়ে তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ফলে বিদ্রোহীরা লুণ্ঠন কার্য শুরু করিল। রহিম নদীয়া, হুগলী জেলা লুণ্ঠন করিতে করিতে বর্ধমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ প্রথমে তাহাকে আলোচনার মাধ্যমে নিরস্ত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধির প্রস্তাব আলোচনার ছলে যুবরাজের প্রধানমন্ত্রী খাজা আনোয়ারকে রহিম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করেন। অবশেষে যুবরাজ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। চন্দ্রকোনার নিকট এক যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল এবং তাহাদের বিদ্রোহী নেতা রহিমকে হামিদ খান কুশেরী হত্যা করিল। এইবার বিদ্রোহীদের দল সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের কেহ কেহ মোগল সৈন্যদলে যোগদান করিল, কেহ বা গ্রামে ফিরিয়া

কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করিল। আফগান বিদ্রোহীদের এই যুদ্ধ ১৬৯৮ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে সংগঠিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের ইতিহাসে শোভা সিংহ ও পরবর্তীকালে রহিম খানের বিদ্রোহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীরা যথেচ্ছাভাবে লুণ্ঠনের ফলে যে বিশৃঙ্খল ও অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে এই সময়ে মোগল শাসন ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বলা চলে। এই অবস্থায় বঙ্গদেশে অবস্থিত তিনটি ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কোম্পানী (ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ) ঢাকায় সুবাদার ইব্রাহিম খানের নিকট নিজেদের বাণিজ্য কুঠিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ তাহাদের এই অনুমতি মঞ্জুর করিলেন। এইভাবে ইংরেজ অধিকৃত কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, চন্দননগরে ডি-ওরলিয়েন্স দুর্গ ও ওলন্দাজ অধিকৃত চুঁচুড়ায় রক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। বর্তমান ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকট ইংরেজ বণিকেরা দুর্গপ্রাকার তৈরী করে এবং প্রাকারের উপর কামান বসাইয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করে। ইংরেজ বণিকগণ ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯৮ হাজার টাকার বিনিময়ে বঙ্গের যুবরাজ আজিম-উস-শানের নিকট হইতে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার দখলীসত্ব লাভ করে। এইভাবে কলিকাতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

চন্দননগরে একইভাবে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যানপয়েস মার্টিন নদীর তীর বরাবর প্রাকার নির্মাণ করাইয়া, তাহারই মধ্যে চন্দননগরে ছোট ছোট দুর্গ নির্মাণ করিলেন। একইভাবে ওলন্দাজগণও তাহাদের চুঁচুড়ার বাণিজ্য কুঠির একধারে দেওয়াল তৈয়ারী করাইয়া সুরক্ষার ব্যবস্থা করিল।

মুর্শিদকুলী খান

ঔরঙ্গজেবের পৌত্র যুবরাজ মহম্মদ আজিমুদ্দীন (পরবর্তীকালে আজিম-উস-শান) ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের শাসক নির্বাচিত হইয়া বর্ধমানে আসেন। কিন্তু বৎসর তিনেকের মধ্যে বঙ্গদেশে মুর্শিদকুলী খান নামক একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ঔরঙ্গজেব ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। মুর্শিদকুলী খান ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্য অবস্থায় তাহাকে হাজি সফি ইস্ফাহানী ক্রয় করিয়া মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। তখন তাহার নাম হয় মহম্মদ-হাদি। বাল্যকালে তাহাকে পারস্যে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি নিজবুদ্ধি ও মেধা বলে রাজস্ব বিভাগে সুদক্ষ কর্মচারীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজ দক্ষতার জন্য ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন।

মুর্শিদকুলী খান দেওয়ান হিসাবে বঙ্গদেশের রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, সিলেটের ও পরে ফৌজদার হইয়াছিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে অবশ্য তিনি শাসনক্ষমতা তেমন কিছু লাভ না করিলেও নিশ্চিতভাবে তিনি ছিলেন সেই সময়ে বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত শাসক। আজিম-উস-শানের শাসনকাল বৃদ্ধি করিয়া ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত করা হয়। ইহার অধিকাংশ সময়ে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। মুর্শিদকুলীর সহিত আজিম-উস-এর খুব মধুর সম্পর্ক ছিল না। একই কারণে তিনি যুবরাজের নিকট হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে নিজ দপ্তর অনেক দূরে মুকসুদাবাদে লইয়া যান। সম্রাটের অনুমতি অনুসারে পরে ইহার নাম রাখা হয় মুর্শিদাবাদ। তবে যতদিন ঔরঙ্গজেব জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি বিনা বাধায় নিজ কাজ করিতেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র বাহাদুর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার শাসনকালে পুত্র আজিম-উস-শান অধিকাংশ সময়ে দিল্লীতে থাকিতেন। বঙ্গ ও বিহারের শাসন তাহার পুত্ররাই চালাইতেন। এই সময়ে মুর্শিদকুলীকে বঙ্গের সহকারী সুবাদার করা হয়। কিন্তু আজিম-উস-শানের ইচ্ছা অনুসারে সম্রাট বাহাদুর শাহ অবশ্য মুর্শিদকুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এইভাবে তিনি দুই বৎসর (১৭০৮-১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গদেশের বাহিরে থাকিতে বাধ্য হন।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের নূতন দেওয়ান জিয়াউল্লা মুর্শিদাবাদের বিদ্রোহী সৈন্যদের হাতে নিহত হইলে মুর্শিদকুলীকে পুনরায় উচ্চ সম্মান দান করিয়া দেওয়ান পদে পুনর্বহাল করা হয়। ফারুকশায়ার সম্রাট হইয়া মুর্শিদকুলী খানকে সহকারী সুবাদার পদে নিয়োগ করেন (১৭১৩ খ্রীঃ) এবং ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে বঙ্গদেশের সুবাদার পদে নিয়োগ করা হয়। এই পদে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আসীন ছিলেন (১৭২৭ খ্রীঃ)। মোগলদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া যে আত্মকলহ শুরু হইয়াছিল তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ শাসন ব্যবস্থায়ও শৈথিল্য আসিয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে দেওয়ান ও পরে দেওয়ান ও সুবাদাররূপে মুর্শিদকুলীর সুযোগ্য শাসনের ফলে তিনি বঙ্গদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিধান শুধু করেন নাই একই সঙ্গে প্রায় স্বাধীন নবাবী বংশের পত্তন করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

মর্শিদকুলী খান তাহার রাজস্ব সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি যে নূতন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন তাহাকে মালজমিনি ব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থা তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের ১৩টি চাকলা ও অনেকগুলি পরগণায় ভাগ

করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তিনি ইজারাদারদের দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বে প্রচলিত বঙ্গদেশে মোগল-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সমস্ত জায়গীর অধিকার করিয়া বিনিময়ে উড়িষ্যার অনুর্বর অঞ্চলে জমি দিয়াছিলেন। তাহার ব্যবস্থায় নূতন ইজারাদারদের তিনি মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের অধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়াছিলেন এইভাবে তিনি বঙ্গদেশে একটি নূতন ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকেই কর্ণওয়ালিসের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

মুর্শিদকুলীর ব্যবস্থা অনুযায়ী দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলকে তিনি তিনটি চাকলাতে ভাগ করিয়াছিলেন। যথা হিজলী (লবণ মহলসহ হুগলী এবং বর্ধমান) ইহার সঙ্গে ছিল তমলুকের জমিদারী। এই চাকলাগুলিকে তিনি অনেকগুলি পরগণায় ভাগ করিয়াছিলেন। পুরানো যুগের ভূস্বামীদের মধ্যে বিষ্ণুপুর ও বীরভূম অক্ষত রহিয়াছিল। মল্ল বীরহাম্বীর রাজাদের বংশধরদের দ্বারা শাসিত বিষ্ণুপুর ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র। সম্ভবতঃ সে জন্য তাহাদের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। এই বিখ্যাত জমিদার বংশ ছাড়াও আরও কয়েকটি আঞ্চলিক শাসকদের নিয়মিত রাজস্বের পরিবর্তে তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী বঙ্গদেশে আগমনের কিছু পরে চন্দ্রকোনার শাসক রহিম আফগানের অনুচরকে পরভূত করিয়াছিলেন।

অপুত্রক মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তাহার জামাতা সরফরাজ খান বঙ্গ ও উড়িষ্যার সুবাদরা পদে অধিষ্ঠিত হন। হাজি আহাম্মদ ও আলিবর্দী নামে দুই ভ্রাতা এবং রাজস্ব বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আমিচাঁদ (অথবা আলমচাঁদ) ও বিখ্যাত পাঞ্জাবী জগতশেঠ ফতেচাঁদ তাহার দরবারে খুবই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

নবাব সুজাউদ্দিনের অনেক গুণ থাকা সত্বেও তিনি বিলাসী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হওয়ায় রাজকার্য তেমন দেখাশুনা করিবার সুযোগ পাইতেন না। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বঙ্গসুবার সহিত যুক্ত হয়। ফলে সুজাউদ্দিন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের সুবাদার হইলেন।

শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য তিনি তাহার সুবাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরবঙ্গের কতক অংশের শাসনভার নিজহস্তে রাখিয়া পূর্ব দক্ষিণ-বঙ্গের অবশিষ্টাংশের জন্য ঢাকার একজন এবং বিহার ও উড়িষ্যা শাসনের জন্য

আরও দুইজন নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করিলেন। আলিবর্দী খান প্রথমে বিহারে নায়েব নাজিম হইলেন।

সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর (১৭৩৯ খ্রীঃ) তাহার পুত্র সরফরাজ খান বঙ্গের নবাব হইলেন। তিনি ছিলেন অপদার্থ এবং এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ফলে দেশে এক ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। হাজি আহম্মদ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে নবাবকে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট রাখিতেন। ইত্যবসরে তাহার ভ্রাতা আলিবর্দী খান নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। হাজি আহাম্মদ পরে পলায়ন করিয়া ভ্রাতার সহিত যোগ দেন। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সহিত আলিবর্দীর যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন। আলিবর্দী এইভাবে প্রভুকে হত্যা করিয়া বঙ্গের নবাবী লাভ করিলেন (১৭৪০ খ্রীঃ)। বঙ্গদেশের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় নাদিরশাহের আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত মোগল সম্রাটের করিবার মত কোন ক্ষমতাই ছিল না।

আলিবর্দী খান

গিরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বঙ্গদেশের শাসনভার লাভ করিলেও আলিবর্দী তখনও উড়িষ্যার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। নবাব সুজা-উদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ পূর্বে যাহার নাম ছিল মুর্শিদকুলী খান (দ্বিতীয়) তিনি সসৈন্যে কটক হইতে আলিবর্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। আলিবর্দী নিজেও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

তিনি প্রথমে মেদিনীপুরের জমিদারদের প্রচুর অর্থদান করিয়া নিজের দলে আনয়ন করেন। কিন্তু সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করিবার সময় ময়ূরভঞ্জের রাজা রঘুনাথ ভঞ্জ তাহাকে প্রবলভাবে বাধা দেন। তিনি দ্রুতগতিতে এই বাধা অগ্রাহ্য করিয়া নদী অতিক্রম করিলেন এবং বালেশ্বরের চার মাইল উত্তরে ফুলওয়ারী নামক জায়গায় শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময়ে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা খুবই বিঘ্নিত হওয়ায় খাদ্যাভাবের জন্য তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মেদিনীপুর ও তাহার পার্শ্ববর্তী জমিদারগণ তাহাকে নিয়মিত ও যথেষ্ঠ পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় আলিবর্দী রুস্তম জঙ্গের সহিত একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয় বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু তাহার বিশ্বস্ত কর্মচারী তাহাকে বর্ষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

এই সময়ে রুস্তম জঙ্গের অল্পবয়স্ক জামাতা মীর্জা ববর হঠাৎ আলিবর্দীর

শিবির আক্রমণ করায় প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে মির্জা ববর গুরুতর আহত হইলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। নিজ স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের পরিত্যক্ত বরবাটি দুর্গে রাখিয়া পলায়ন করিলেন। খুরদার জমিদারদের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে আলিবর্দীর সৈন্যরা তাহাদিগকে বন্দী করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

আলিবর্দী উড়িষ্যা জয় করিয়া সেখানে তাহার ভাতৃপুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খানকে নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। এই নূতন নায়েব নাজিম ছিলেন এই পদের অযোগ্য এবং তাহার দুর্ব্যবহারে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হওয়ায় রুস্তম জঙ্গ একদল মারাঠা সৈন্যের সাহায্যে উড়িষ্যা দখল করিলেন। নূতন নায়েব নাজিম সপরিবারে তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। মেদিনীপুর এবং হিজলী অনতিবিলম্বে ইহাদের অধিকারভুক্ত হইল।

এইবার আলিবর্দী পুনরায় উড়িষ্যা অভিযান করিলেন। তিনি রুস্তমের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া পুনরায় উড়িষ্যা অধিকার করিলেন (১৭৪১ খ্রীঃ)। এইবার তিনি তাহার বন্ধু শেখ মাসুমকে উড়িষ্যার নবাব নাজিম নিযুক্ত করিলেন এবং দোলতরামের পুত্র রাজা জানকীরামকে তাহার সহকারী নিযুক্ত করিলেন। বঙ্গদেশে ফিরিবার পথে তিনি ময়ূরভঞ্জের রাজাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে কিছুকাল বালাশোরে অপেক্ষা করিলেন। যখন তিনি মেদিনীপুরের নিকট জয়গড়ে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় খবর পাইলেন নাগপুর হইতে ভোঁশলা রাজার মারাঠা সৈন্যরা দলে দলে বঙ্গদেশের দিকে আসিতে শুরু করিয়াছে।

মারাঠাদের বঙ্গদেশের এই হাঙ্গামা দীর্ঘ প্রায় ১০ বৎসর চলিয়াছিল (১৭৪১-১৭৫১ খ্রীঃ)। ইহার ফলে আলিবর্দী সুখে ও শান্তিতে বঙ্গদেশে নবাবী করিতে পারেন নাই। মারাঠা আক্রমণের ফলে (যাহা বর্গীর হাঙ্গামা নামে পরিচিত) বঙ্গদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বহুলোকের জীবন ও ধন-সম্পদ নষ্ট হইয়াছিল। যাহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। ইহার পরিণামে মারাঠারা মেদিনীপুরে কিছু অংশসহ সমগ্র উড়িষ্যা অঞ্চলে নিজেদের অধিকার স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

যুদ্ধক্লান্ত আলিবর্দী শেষপর্যন্ত মারাঠাদের সঙ্গে এক সন্ধিতে উপনিত হন (১৭৫১ খ্রীঃ)। তাহার রাজত্বের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর তিনি মারাঠা আক্রমণে বিধ্বস্ত বঙ্গদেশের পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করিয়াছিলেন। শাসনতান্ত্রিক দক্ষ পরিচালনার জন্য তিনি কতকগুলি নূতন পদ সৃষ্টি করেন। এতকাল পরে তাহার

গুপ্তচর বিভাগের প্রধান রাজারাম সিংহকে মেদিনীপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। বিহারের উপশাসক রাজা জানকীরামের মৃত্যুর পর (১৭৪২ খ্রীঃ) রামনারায়ণকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। রাজা জানকীরামের পুত্র দুর্লভরামকে সামরিক বিভাগে দেওয়ান পদে নিয়োগ করা হয়।

বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী শোকে-তাপে খুবই বিব্রত হইয়া শেষ পর্যন্ত ৮০ বৎসর বয়সে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বঙ্গদেশে মারাঠা অভিযান

প্রথম অভিযান (১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ দ্বিতীয়বার উড়িষ্যা অভিযান শেষ করিয়া ফিরিবার পথে আলিবর্দী খান কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকায় তাহার সৈন্যবাহিনীকে গৃহে ফিরিবার অনুমতি দেন। তিনি নিজে মাত্র ৫ থেকে ৬ হাজার সৈন্যসহ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার নিকটবর্তী একটি অঞ্চলে (মুবারক মঞ্জিল অথবা শাহিনবন্দী) যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন হঠাৎ খবর পাইলেন নাগপুর হইতে একদল মারাঠা সৈন্য ময়ূরভঞ্জ পাচেতের মধ্য দিয়া বর্ধমানে পৌঁছিয়া লুণ্ঠন শুরু করিয়াছে (১০৪২ খ্রীঃ)। এই খবর পাইবামাত্র তিনি দ্রুতগতিতে বর্ধমানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে অসংখ্য মারাঠা কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় মারাঠারা তাহার রসদ সরবরাহের পথও বন্ধ করিয়া দিল। নবাব খুব শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এক সপ্তাহকাল বর্ধমানে থাকিতে বাধ্য হইলেন। মারাঠাদের একটি দল ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে এই অবরোধ ব্যবস্থা রক্ষা করিল এবং অন্য আর একটি দল ৪০ মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া লুণ্ঠন শুরু করিল।

মরিয়া হইয়া নবাব আলিবর্দী মারাঠা ব্যূহ বহুকষ্টে ভেদ করিয়া মুর্শিদাবাদের পথে কাটোয়াতে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি প্রয়োজনীয় সরবরাহ লাভ করিলেন এবং মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হইলেন। মারাঠাবাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত এই সময়ে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গের বিচক্ষণ নায়েব মীর হাবিবের পরামর্শ ও সাহায্যে তাহারা পুনরায় যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তিনি তাহার প্রভু রুস্তম জঙ্গের প্রতি আলিবর্দীর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য মারাঠাদের সহিত হাত মিলাইলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং তাহার স্থানীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক জ্ঞান তাহাকে এই অভিযান পরিচালনার কাজে খুবই সাহায্য করিয়াছিল। তাহার এই বিচক্ষণতা ও আলিবর্দীর বিরুদ্ধে তাহার প্রচণ্ড বিদ্বেষ

মারাঠাদের বঙ্গদেশ অভিযান যেমন দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল তেমনি নৃশংস ও রক্তক্ষয়ী বিভীষিকাময় এক দুঃসহ ঘটনায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

নবাব আলিবর্দী কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মীরহাবিবের পরামর্শে ৭০০ জন বাছাইকরা মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতগতিতে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল এবং শহর আক্রমণ করিয়া নিকটবর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করিল ও বাজার পোড়াইয়া দিল। এইবার মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা জগতশেঠের বাড়ি হইতে তিনলক্ষ টাকা লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া গেল। এই ঘটনার পরের দিন আলিবর্দী খান মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। মারাঠাদের অন্য একদল সৈন্য-বাহিনী আলিবর্দীর পশ্চাৎধাবন করিয়া চতুর্দিকে গ্রামাঞ্চল জ্বালাইয়া ধনসম্পদ লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে ফিরিলে মারাঠারা কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করিল। পথে তাহারা হুগলী অধিকার করিয়া লইল।

এই সময়ে মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলের কার্যত প্রধান আস্তানা হইল কাটোয়া। মীরহাবিব ছিলেন মারাঠাদের প্রধান পরামর্শদাতা। তাহাদের আক্রমণের ফলে গঙ্গার দক্ষিণপার্শ্বস্থ অনেকটা অঞ্চল মারাঠাদের অধিকারে চলিয়া গেল। তাহারা রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরে ঘাঁটি স্থাপন করিল। মেদিনীপুরের ফৌজদার মীরকালান্দার কোনমতে তাহার দুর্গটি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই জেলার অধিকাংশ গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ সমস্ত অঞ্চল মারাঠাদের অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ আলিবর্দীর শাসন কার্যত গঙ্গার পূর্বতীরে বজায় ছিল। ইহাও প্রায় মারাঠাদের আক্রমণের কবলে পড়িত।

মারাঠাদের শাসনাধীন ভূখণ্ডে তাহাদের অকথ্য অত্যাচারে জনসাধারণের ধন, প্রাণ, মান বিপর্যস্ত হইল। এখানকার ব্যবসাবাণিজ্য শিল্প প্রায় লোপ পাইতে বসিল। সমসাময়িক ইংরেজ ও বাঙালী লেখকেরা মারাঠাদের অত্যাচারের এই সমস্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙালী জনজীবনে মারাঠাদের এই আক্রমণ বর্গীর হাঙ্গামা নামে পরিচিত। যাহাদের অত্যাচারে নির্মম নৃশংসতার কাহিনী এখনও লোকেদের মধ্যে শিহরণ সৃষ্টি করে।

১৭৪২ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে বর্ষা শেষ হইলে নবাব আলিবর্দী বিরাট সৈন্য-বাহিনীসহ মারাঠাদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান শুরু করিলেন। তিনি প্রথমে কাটোয়া আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে মারাঠারা লুণ্ঠনের অর্থে জাঁকজমকসহ কাটোয়াতে দুর্গাপূজা করিতেছিল। আলিবর্দী অতর্কিতে আক্রমণ করায় তাহারা বিনাযুদ্ধে পশ্চাৎধাবন করিতে বাধ্য হয়। ভাস্কর পণ্ডিত মেদিনীপুর

অঞ্চল লুণ্ঠন করেন এবং বিখ্যাত রেশম শিল্পকেন্দ্র রাধানগর লুণ্ঠন করিয়া জ্বালাইয়া দেন এবং শেষপর্যন্ত নারায়ণগড়ে শিবির স্থাপন করেন। পথে তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু মীরহাবিবের নেতৃত্বে তাহারা বিষ্ণুপুরের মধ্যদিয়া চন্দ্রকোনা অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরের নিকট উপস্থিত হন। পরে তিনি কটক অধিকার করেন। আলিবর্দী সৈন্যসহ অগ্রসর হইলে মারাঠারা মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া পাঁচেত হইয়া পলায়ন করিল। তখন তিনি কটক পুনরুদ্ধার করিলেন এবং মারাঠারা চিল্কাহ্রদের দক্ষিণে পলাইয়া গেল।

দ্বিতীয় অভিযান (১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ দিল্লীর সম্রাট মারাঠা ছত্রপতি শাহুকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা চৌথ আদায় অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মারাঠারাজ শাহু নাগপুরের মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁশলাকে এই অধিকার দান করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট পেশোয়া বালাজী রাওকে তাহার ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষ রঘুজী ভোঁশলার বঙ্গদেশ আক্রমণের হাত হইতে নবাব আলিবর্দীকে রক্ষার জন্য আবেদন করিলেন। পোশোয়াও তাহাকে আশ্বাস দিলেন তিনি রঘুজী ভোঁশলার মারাঠাবাহিনীকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

১৭৪৩ খ্রীঃ প্রথমদিকে রঘুজী ভোঁশলা ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া বিপুল সৈন্যসহ বঙ্গদেশ অভিযান করিয়া কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন। অপরদিকে পেশোয়া বালাজীরাও বিশাল সৈন্যসহ কাশী, সাসারাম, দাউদনগর, চিটকারী, গয়া, মুঙ্গের প্রভৃতি হইয়া সাঁওতাল পরগনা অতিক্রম করিয়া বীরভূমের মধ্যদিয়া মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হইলেন। পথের দুধারে তাহার সৈন্যরা লুণ্ঠন করিয়া ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিল। যাহারা পেশোয়াকে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া খুশী করিতে পারিয়াছিল একমাত্র তাহারাই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে চৌরিয়াগাছি গ্রামে আলিবর্দী ও বালাজীরাও-এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে নবাব মারাঠা ছত্রপতি শাহুকে নিয়মিত চৌথ দেবেন স্থির করিলেন এবং পেশোয়ার সৈন্যবাহিনীর ব্যয় বাবদ তাহাকে ২২ লক্ষ টাকা নগদ দিতে স্বীকৃত হইলেন। বিনিময়ে পেশোয়া কথা দিলেন তিনি রঘুজী ভোঁশলার হাত হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবেন।

রঘুজী ভোঁশলা এই সংবাদ পাইয়া কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া বীরভূমের দিকে চলিয়া গেলেন। পেশোয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহীবাহিনীর সাহায্যে রঘুজী ভোঁশলাকে বঙ্গদেশের বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

মারাঠাদের এই গোলযোগের সুযোগে কলিকাতার ইংরেজ বণিকেরা প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া শহর রক্ষার জন্য বিখ্যাত মারাঠা খাল খনন করিল

(Maratha ditch)। ইহার পরবর্তী নয় মাস বঙ্গদেশে মারাঠাদের আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই।

তৃতীয় অভিযান (১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের মধ্যদিয়া বঙ্গদেশ অভিযান শুরু করিলেন। পূর্বে দুই বৎসর এই অঞ্চল হইতে লুণ্ঠন করিতে না পারায় এবং উপরন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন তাহার প্রধানতম শত্রু পেশোয়া বালাজী বাজিরাও বঙ্গদেশ হইতে ২২ লক্ষ টাকা অল্প সময়ের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়াছেন তখন তিনি ক্ষোভে-দুঃখে দিশেহারা হইয়াছিলেন।

মাঝখানে মারাঠা ছত্রপতি শাহু ভোঁশলা ও পেশোয়াকে ব্যক্তিগতভাবে দরবারে আহ্বান করিয়া তাহাদের বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বঙ্গের চৌথ আদায়ের ভার দুইজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে বিহারের পশ্চিম অঞ্চলের চৌথ আদায়ের ভার পড়িল পেশোয়ার উপর এবং উড়িষ্যা, বঙ্গ ও বিহারের পূর্বভাগের আদায়ের ভার পড়িল ভোঁশলার উপর। স্থির হইল যে উভয়ে নিজেদের অংশে যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করিতে পারিবে। একজন অপরজনকে বাধা দিতে পারিবে না। ইহার ফলে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুর অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদে নবাব আলিবর্দী খুবই বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি পেশোয়াকে যে উদ্দেশ্যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। দেশে পুনরায় মারাঠাদের বর্বর অত্যাচার শুরু হইল। এদিকে নবাবের রাজকোষ প্রায় শূন্য। এই অবস্থায় তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত শঠতার নীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত লইলেন।

চৌথ বিষয়ে একটি বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাহার বিশ্বাসভাজন গোলাম মুস্তাফা খানের পরামর্শে তিনি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজ শিবিরে আহ্বান জানাইলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে তাহার ২১ জন সেনানায়ক অনুচরসহ তাহাকে হত্যা করা হইল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মারাঠা সৈন্যরা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রঘুজী ভোঁশলার প্রত্যাবর্তন (১৭৪৫ খ্রীঃ)

নবাব আলিবর্দী মুস্তাফা খানকে ভাস্কর পণ্ডিতের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যোদ্ধার হইলে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন না করায় মুস্তাফা বিহারে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং রঘুজী ভোঁশলাকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করে।

রঘুজী ভোঁশলা বঙ্গদেশে আসিয়া বর্ধমানের রাজকোষ লুণ্ঠন করেন এবং বীরভূমে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া মুস্তাফার সহিত যোগদান করেন। আলিবর্দী সৈন্যসহ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহী মুস্তাফাকে বিহার হইতে বিতাড়িত করেন। ইত্যবসরে রঘুজী উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া জানকী রামের পুত্র দুর্লভ রামসহ কটক অধিকার করেন। এইভাবে সমস্ত উড়িষ্যাসহ মেদিনীপুর অঞ্চল রঘুজীর হস্তে চলিয়া যায়। রঘুজী ইহার পর শোন অতিক্রম করিয়া বিহারে পুনরায় প্রবেশ করেন। নবাবের সৈন্য যখন বিহারের বিদ্রোহীদের পশ্চাৎধাবন করে তখন উড়িষ্যার ভূতপূর্ব নায়েব মীরহাবিবের সহায়তায় মারাঠাগণ রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে এবং চারিপার্শ্বের অঞ্চল লুণ্ঠন শুরু করে। এই সংবাদ পাইবামাত্র নবাব দ্রুতগতিতে মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া আসিলে রঘুজী কাটোয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে নবাবের হস্তে পরাজিত হন। এইবার তিনি নাগপুরে ফিরিয়া যান। কিন্তু মীরহাবিব মারাঠা সৈন্যসহ কাটোয়ায় অবস্থান করিতে থাকেন এবং তিনিও শেষপর্যন্ত এখানে নবাবের নিকট পরাজিত হন (১৭৪৬ খ্রীঃ)। নবাব তাহার দুইজন আফগান সেনানায়ককে মারাঠাদের সহিত গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় পদচ্যুত করেন ও তাহাদের নিজেদের বাসস্থান দ্বারভাঙ্গায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেন।

আলিবর্দী বিহার হইতে মারাঠাদের বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর ও হিজলীর ভূতপূর্ব ফৌজদার মীরজাফরকে সেনানায়ক করিয়া বিশাল একদল সৈন্য উড়িষ্যার দিকে প্রেরণ করিলেন (১৭৪৬ খ্রীঃ)। এই সৈন্যদল সহ মীরজাফর মেদিনীপুর শহরে মীরহাবিবের অনুচর সৈয়দ নূরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই সংবাদে মীরহাবিব বালেশ্বরের দক্ষিণদিকে সৈন্যসহ অগ্রসর হন এবং শীঘ্রই তাহার সহিত রঘুজী ভোঁশলার পুত্র জানকী ভোঁশলা কটকে উপস্থিত হন। তাহাদের এই মিলিত সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদে মীরজাফর মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া বর্ধমানের দিকে পলায়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরে মীরজাফর রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লার সহিত একযোগে আলিবর্দীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এই সংবাদে নবাব উভয়কে পদচ্যুত করেন। তখন ৭১ বৎসরের বৃদ্ধ নবাব নিজেই মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং বর্ধমানের নিকট জানোজীকে পরাজিত করেন (১৭৪৭ খ্রীঃ)। পরাজিত মারাঠাগণ মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও মেদিনীপুর হইতে পলায়ন করে। নবাব এই যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ১৭৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মারাঠারা উড়িষ্যার সমস্ত অঞ্চলের উপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগান রাজ আহাম্মদ শাহ দুররানী পাঞ্জাব আক্রমণ করিবার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের উপর এক দুর্যোগ নামিয়া আসে। এই সুযোগে আলিবর্দী'র পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগানগণ তাহাদের বাসস্থান দ্বারভাঙ্গা হইতে অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করে এবং বিদ্রোহীদের হস্তে নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহাম্মদ ও তাহার পুত্র জৈনউদ্দীন নিহত হন এবং আলিবর্দী'র কন্যাকে বন্দী করে। দলে দলে আফগান সৈন্য এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে। উড়িষ্যা হইতে মীরহাবিবের নেতৃত্বে একদল মারাঠা সৈন্য ইহাদের সহিত যোগদানের জন্য রওনা হয়।

পাটনার এই দুর্ভাগ্যজনক সংবাদে নবাব আলিবর্দী পুনরায় সৈন্যসহ অগ্রসর হইয়া ভাগলপুরের নিকট মীরহাবিবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গঙ্গার দক্ষিণতীরে কালাদিয়ারা নামক জায়গায় বিদ্রোহী আফগানদের ও তাহাদের সাহায্যকারী মারাঠাদের পরাজিত করিয়া পাটনা অধিকার করিয়া কন্যাকে উদ্ধার করেন (১৭৪৮ খ্রীঃ)।

মারাঠাদের বিরুদ্ধে শেষযুদ্ধ

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দী উড়িষ্যা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য পুনরায় অভিযান শুরু করেন। কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে মীরহাবিবের নেতৃত্বে মারাঠারা তাহা পুনরায় অধিকার করে। এইবার নবাব মারাঠা অভিযান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে মেদিনীপুরে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি বিনাবাধায় কাঁসাই অতিক্রম করিয়া অপর পারে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন যাহাতে শত্রুরা ভবিষ্যতে তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে সুযোগ না পায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেনাদের সুরক্ষিত ঘাঁটি তৈরী করিলেন এবং তাহার সেনাবাহিনীর সিরাজদৌল্লার ব্রিগেডের নায়ক আলিকুলি খানকে সেখানে প্রহরায় নিযুক্ত করিলেন। তাহার নাতি সিরাজ একটি ছোট বাহিনীসহ বালাশোরের দিকে সফল অভিযান সমাপ্ত করে। ইহার পর তিনি সৈন্যসহ পিতামহের সাহত সাক্ষাতের জন্য নারায়ণগড়ে উপস্থিত হন। ইহাদের দুই মিলিত বাহিনী তখন মেদিনীপুরে স্থায়ী শিবির প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু মারাঠা আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা পুনরায় বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে শুরু করিল এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকট উপস্থিত হইল। নবাবের সৈন্যবাহিনীর সম্পুর্ণ অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎদিক হইতে লুণ্ঠন করিতে করিতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইল। এই সংবাদ

পাওয়ামাত্র নবাব রাজধানী রক্ষার জন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। তখন মীরহাবিব যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব পুনরায় মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

এই বৎসরই তাহার নাতি সিরাজ হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া পাটনা অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধ এবং অসুস্থ নবাব আলিবর্দী এই সংবাদে দারুণ গ্রীষ্মে পাটনায় ছুটিয়া যান এবং সেখানে গিয়া গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাহাকে চিকিৎসার জন্য নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে আনা হয়।

কিন্তু এই অবস্থায়ও তাহার বিশ্রাম মিলিল না। মেদিনীপুরে তাহার দুইজন প্রতিনিধি মীরজাফর ও রাজা দুর্লভরাম মারাঠাদের ভয়ে এত ভীত ছিলেন যে শারিরীক অসুস্থতা সত্বেও তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে আর একবার মীরহাবিবকে বিতাড়িত করিবার জন্য এই অঞ্চলে যাইতে হইল। সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বে তিনি পুনরায় কাটোয়াতে ফিরিয়া আসিলেন (১৭৫১ খ্রীঃ)।

মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে নবাব আলিবর্দী যে সাহস, রণকৌশল ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ নবাব আর যুদ্ধ চালাইতে পারিতেছিলেন না। তাহার সৈন্যদল যুদ্ধক্লান্ত, কোষাগারও শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, অন্যদিকে মারাঠারাও রণক্লান্ত ছিল। প্রতিহিংসা পরায়ণ মীরহাবিব মারাঠাদের সাহায্যে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করিয়া তেমন কিছু লাভবান হইতে পারে নাই। অনুর্বর উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের উপর আধিপত্য তেমন কিছু লাভজনক ছিলনা। কাজেই উভয়পক্ষ সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। সেইজন্য উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর মারাঠাদের নাগপুর দরবারের সম্মতি লাভ করিয়া ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত স্থির হয় (১) মীরহাবিব আলিবর্দীর অধীন উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হইবেন। কিন্তু এই প্রদেশের উদ্বৃত্ব রাজস্ব তিনি মারাঠা সৈন্যদের ব্যয়বাবদ রঘুজী ভোঁশলার দরবারে প্রেরণ করিবেন। (২) ইহা ছাড়া বঙ্গদেশের রাজস্ববাবদ চৌথ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা রঘুজী ভোঁশলাকে দেবেন। (৩) মারাঠা সরকার কখনও আর আলিবর্দীর রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। বঙ্গদেশের সীমান্ত জলেশ্বরের নিকট সুবর্ণরেখা বরাবর নির্ধারিত করা হইল এবং মারাঠারা কখনও পুনরায় ইহা অতিক্রম করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিল। এইভাবে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ পুরোপুরি বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত রহিল। অবশ্য সুবর্ণরেখা বাস্তবক্ষেত্রে সত্যিকার

সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত হয় নাই। কারণ মারাঠারা এই নদীর উত্তর-পূর্বে কিছু কিছু পরগনা যেমন—ভোগরাড়ি, কামারদা, পটাশপুর, সাহাবন্দ এবং গোপিবল্লভপুর থানার কয়েকটি গ্রাম নিজেদের অধিকারভুক্ত রাখিয়াছিল। একজন ঐতিহাসিক (B. C. Roy) তাহার "Orissa Under Marathas" (1960) পুস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন এই সন্ধি তিনটি বিবদমান শক্তির মধ্যে একটা পরস্পর বোঝাপড়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। রঘুজী ভোঁশলা অর্থের লোভে এবং মীরহাবিব তাহার সম্মান ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে নবাব আলিবর্দী নামে মাত্র উড়িষ্যার উপর স্বীয় আধিপত্য স্বীকৃতির বিনিময়ে দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর বৃদ্ধ বয়সে শান্তি চাহিয়াছিলেন। পরস্পর বিরোধী এই সমস্ত মানসিকতার মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ফলে এই সন্ধি শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

বর্গীরা চন্দ্রকোনা থানার মধ্য দিয়া মেদিনীপুরে প্রবেশ করিত। পরে মেদিনীপুরে সুবর্ণরেখার ওপারে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া তাহারা পরে পরে নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, বেলদা, নারায়ণগড়, পটাশপুর, ভগবানপুর, বায়েন্দা, ময়না, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে হানা দিয়াছিল। পটাশপুরে ইহাদের বেশ শক্ত ঘাঁটি ছিল।

মীরকাসেম মেদিনীপুরের রাজস্ব আদায়ের দায়ীত্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিলেও (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে) তখনও কাঁথি মহকুমায় পটাশপুর থানা মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার একবৎসর পর জানোজী ভোঁশলার মারাঠা সৈন্য কর্তৃক মীরহাবিব নিহত হন তখন রঘুজী এক সভাসদকে (মুশালিউদ্দীন মহম্মদ খানকে) উড়িষ্যার নবাব নাজিম পদে নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে আলিবর্দী উড়িষ্যার নিয়মতান্ত্রিক অধিকারও হারাইয়া ছিলেন এবং উড়িষ্যা স্থায়ীভাবে মারাঠারাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ মারাঠা আক্রমণের ফলে উড়িষ্যার হাতছাড়া হওয়াই ছিল একটি অন্যতম স্থায়ী ফল (১৭৫১ খ্রীঃ)।

সূত্র নির্দেশ

১। History of Bengal, (D.U.), Vol. II, Pp. 200-204, 206-213, 234-236, 304-313, 332-334, 343-386, 391-396, 404-414, 423-424, 442-446, 455-467.

২। বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ১৩২, ১৩৪, ১৪৬, ১৫০, ১৫১, ১৫৪-১৬২

৩। History of Mediaeval Bengal, R. C. Majumdar, Pp. 98-99, 102-104

৪। Muslim Administration in Orissa (1568-1751), M. A. Haque, 1980, Pp. 129, 145, 155, 157, 177, 194, 214

৫। মেদিনীপুরের ইতিহাস, যোগেশচন্দ্র বসু, পৃঃ ১৮৫-১৮৮

৬। District Gazetteer Midnapore, O'Malley, Pp. 25-32

৭। ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত, প্রবোধচন্দ্র বসু, ১৯৭৬, পৃঃ ৭-৯

৮। বাংলার অর্থ নৈতিক জীবন (১৭৫৭-১৭৯৩), নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ১৯৬৭, পৃঃ ১-১৩

৯। Studies in the History of Bengal Subah (1936), K. K. Dutta, Pp. 353-422

১০। Alivardi and his Times, K. K. Dutta, 1939, Pp. 50-74

পঞ্চম অধ্যায়

শাসন-ব্যবস্থা

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

বখতিয়ার, খিলজীর বঙ্গবিজয়ের পর হইতে ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এবং তাহার পরবর্তী শাসকগণ দিল্লীর প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। তাহাদের এই বিজয় উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ লক্ষ্মণাবতী নামে অভিহিত অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল। অর্থাৎ ইহা রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমিতে সীমাবদ্ধ ছিল। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে মোগল রাষ্ট্রশক্তি অনেকদূর প্রসারিত হয়। পঞ্চদশ শতকের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে অনেক হিন্দুরাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। সুলতান হোসেন শাহের আমলে কামরূপ ও ত্রিপুরাসহ উড়িষ্যার কিছু অংশ ও বিহারের হাজিপুর মুসলমান সুলতানের অধীনে আসে। বঙ্গদেশের কররাণী শাসকগণ প্রথমে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করেন।

১২২৭ হইতে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের শাসকদের দিল্লীর প্রতি এই মৌখিক আনুগত্য সাধারণভাবে বজায় ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের "ওয়ালীম" বা "যাবিদ" বলা হইত। যদিও তাহারই মধ্যে বেশ কয়েকজন মাঝে মাঝে নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতেন। ১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইশত বৎসরকাল বঙ্গদেশের শাসকরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই দেশ শাসন করিয়াছিলেন।

শেরশাহ এবং তাহার বংশধরদের আমলে বঙ্গদেশ পুনরায় দিল্লীর শাসনাধীনে আসে। শূরবংশীয় একজনকে অপসারিত করিয়া আফগান কররাণী বংশ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের দক্ষিন-পশ্চিমসহ উড়িষ্যা জয় করে। এই বংশের সুলতান দাউদ কররাণীকে পরাজিত করিয়াই মোগলরা বঙ্গদেশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হন।

এই সময় সীমার মধ্যেই দেশের শাসনব্যবস্থা কি ছিল তাহার সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য বখতিয়ার খিলজী তাহার অধিকৃত অঞ্চলকে কয়েকটি "ইক্তাতে" ভাগ করেন। এই শাসনতান্ত্রিক অঞ্চল-গুলির দায়ীত্বে "মুক্তা" নামে এক শ্রেণীর শাসক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই

সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল লক্ষণাবতী, গৌড়, দেবকোট, কখনও তাণ্ডা (সুলেমান কররাণীদের শাসনকালে), পাণ্ডুয়া, একডালায়। এই নামগুলি মুসলমান শাসকদের রাজধানী হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কোন কোন সময়ে পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁও কিছুদিনের জন্য রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শাসনের সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন সুলতান। সাধারণ শাসন, বিচার এবং রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কিছুর শেষ কথা বলার অধিকার ছিল কেবল তাঁহারই। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। প্রদেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তিনিই দায়ী ছিলেন। উচ্চপদস্থ সকল কর্মচারী তাহার দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। রাজার একান্ত সচিবকে বলা হইত "দবীর"। "দবীর খাস" ছিলেন ইহাদের প্রধান। সরকারী কর্মচারী হিসাবে আরব, পাঠান, মোগল এবং বাঙালী সকলকেই নিয়োগ করা হইত।

তখন সৈন্যবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও নৌবহর এই চারভাগে বিভক্ত ছিল। বঙ্গদেশের স্থানীয় জনগণের দ্বারা গঠিত "পাইকগণ" পদাতিক যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আগ্নেয়অস্ত্রের ব্যবহার পঞ্চদশ শতকের পর হইতে শুরু হয়। মোগলপূর্ব যুগে বঙ্গদেশের গোলন্দাজবাহিনীর দক্ষতার কথা বাবর তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের হস্তী-বাহিনী ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল।

বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজিরাই বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাহারা সাধারণত ইসলামিক আইন-কানুন অনুসারে বিচার করিতেন। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সুলতান নিজেও বিচার করিতেন।

তুর্কী-আফগানযুগের শেষদিকে বঙ্গদেশে ১৯টি সরকার বা বিভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে। এই ১৯টি সরকারের মধ্যে ১০টি হিন্দু ও ৯টি মুসলমান নাম। এইগুলি ৬৫০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজস্ব বিভাগ ও মহলে বিভক্ত ছিল যাহার অধিকাংশই হিন্দু নাম। ইহাতে মনে হয় বঙ্গের সুলতানগণ দীর্ঘকাল প্রচলিত হিন্দু আমলে রাজস্ব ব্যবস্থার তেমন কোন গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তন সাধন না করিয়া তাহাকে চালু রাখিয়াছিলেন।

বীরভূম, পাচেত, হিজলী, চন্দ্রকোনার জমিদারদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের অপেক্ষা আরও কম শক্তিমান বরদা, ঝাকড়া প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারগণও একই সময়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করায় তাহাদের জমিদারী জায়গীর হিসাবে শাসন করিবার অধিকার তাহারাই লাভ করেন। গোপীমঙ্গল

দাসের 'রসিক মঙ্গল' কাব্যে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে বলভদ্রদাস নামে প্রায় স্বাধীন হিজলীর শাসকের নাম পাওয়া যায়।

এই সরকারগুলির মধ্যে সরকার মান্দারন অন্যতম। এই মান্দারন সরকার পশ্চিমে বীরভূম হইতে দামোদরের কোল ঘেঁসিয়া রাণীগঞ্জের পাশ দিয়া রূপনারায়ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে ঝাড়গ্রাম ও সাঁওতাল পরগনার অংশবিশেষ এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের আর কোন অঞ্চলের তেমন স্পষ্ট কোন উল্লেখ অন্যান্য সরকারের বিস্তৃত বিবরণীতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অনেকটা অঞ্চলই বহুদিন পর্যন্ত উড়িষ্যা রাজাদের অধীনে ছিল। বঙ্গদেশের সুলতানগণ গঙ্গা অতিক্রম করিয়া যখনই দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেন তখনই অনিবার্যরূপে উড়িষ্যা রাজাদের সহিত যুদ্ধ বাধিত। অন্যদিকে উড়িষ্যা রাজারা যখনই বঙ্গদেশের দিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেন তখনই দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তাহাদের বঙ্গদেশের সুলতানদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। এইজন্য মনে হয় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র অঞ্চলের উপর সুলতানদের আধিপত্য তেমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায় নাই। সাময়িক ব্যবস্থার দ্বারাই এই অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থার কাজ চালানো হইত।

মোগল যুগ ঃ তুর্কী-আফগান যুগে বঙ্গদেশের শাসন ছিল মোটামুটি-ভাবে সামন্ততান্ত্রিক। হুসেন শাহ যদিও শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাপি তাহার সেই প্রচেষ্টা খুব সার্থক হয় নাই। সেই হেতু মোগল পূর্বযুগে বঙ্গদেশের শাসনের চরিত্রে সামন্ততান্ত্রিক ছাপ থাকিয়া গিয়াছিল। ইহাদের শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণ যে ধরণের অধিকার ভোগ করিতেন মোগলরা তাহা পরিবর্তন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করাই মোগলদের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছাইতে মোগলদের বঙ্গদেশে দীর্ঘদিন আঞ্চলিক ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

উড়িষ্যায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে মেদিনীপুরও মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। রাজা টোডরমল এই অধিকৃত অঞ্চলকে রাজস্ব আদারের জন্য ৫টি 'সরকার' ও ৯৯টি 'মহালে' বিভক্ত করেন। ইহার অধিকাংশই ছিল মেদিনীপুরের অন্তর্গত। সেই সময় মেদিনীপুরের প্রায় সবটাই সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত ছিল। এই সরকার জলেশ্বরের ২০টি মহাল মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। যথা—(১) বাগড়ী, (২) ব্রাহ্মণভূম, (৩) মহাকাল ঘাট (কুতুবপুর), (৪) মেদিনীপুর, (৫) খড়কপুর, (৬) কেদারকুণ্ড, (৭) কাশীজোড়া,

(৮) সবঙ্গ, (৯) তমলুক, (১০) নারায়ণপুর, (১১) ভোগরাই, (১২) তারাকোন, (১৩) মালঝিটা, (১৪) বালিসাহি, (১৫) দ্বারসরভূম, (১৬) জলেশ্বর, (১৭) গাগনাপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই (করৌলী) ও (২০) বাজার।

ইহা ছাড়া সেকালের বঙ্গদেশে সরকার মান্দারনের অন্তর্গত চিতুয়া, সাহাপুর, মহিষাদল, হাবেলী মান্দারন এই চারটি মহালও পরে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়।

প্রত্যেক মহালের শাসন সংরক্ষণ ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব একজন জমিদারের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। টোডরমল প্রাচীন 'দণ্ডপাট' বিভাগগুলি ভাঙ্গাগড়া করিয়াই মহালগুলি গড়িয়াছিলেন। মোগল শাসনে পাঠানদের আমলে দুর্বলতা ছিল না। সেই সময় হইতে জমিদারগণ মোটামুটি সংযত হইয়া চলিতে আরম্ভ করে। জমিদারী সনন্দদানের প্রথাও মোগলরাই প্রথম চালু করিয়াছিল।

মোগল যুগে বঙ্গদেশের শাসনে তিনটি বৈশিষ্ট্য খুবই লক্ষণীয়। প্রথমত, দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে খুবই কঠোর নিয়মে রাখিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, যে অঞ্চলগুলি মোগলদের প্রত্যক্ষ অধীন ছিল তাহার শাসনব্যবস্থার চেহারা ছিল অন্যান্য প্রদেশের মত। তৃতীয়ত, বঙ্গদেশের বহু অঞ্চলে স্থানীয় জমিদারদের সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে নিজেদের অঞ্চলে অনেকটাই অধিকার ভোগের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে প্রাদেশিক শাসক ইসলাম খাঁ-এর নেতৃত্বে বঙ্গদেশের জমিদারদের অধিকাংশই মোগলদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

মোগল আমলে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম সুবায় পরিণত হয়। এই শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইত। ইহার ভিত্তি ছিল প্রশাসনিক দায়ীত্বের পৃথকীকরণের মধ্যে। এই শাসনব্যবস্থার কাঠামোটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। সুবাদার, দেওয়ান, মীরবক্সি, কাজী প্রভৃতি প্রদেশের প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। ইহাদের সম্রাট তাহার মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ করিতেন। সুবাদার ছিলেন প্রদেশের শাসনতান্ত্রিক প্রধান, দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব বিভাগের প্রধান। এই দুইটি পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরা একে-অন্যের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিত। সুবাদাররা যদিও শাসনতান্ত্রিক প্রধান ছিলেন তবুও সামরিকক্ষেত্রে তিনি মোটামুটি সেনাধ্যক্ষদের পরামর্শ মানিয়া চলিতেন। সরকারী অনেক কর্মচারীও সেনানায়ককে জায়গীর দান করা হইত। অস্বাভাবিক

পরিস্থিতি ব্যতীত এই জায়গীর পরিচালনার ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করা হইত না।

প্রত্যক্ষ শাসনের বাহিরে যে সমস্ত অঞ্চল স্থানীয় শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হইত স্বাভাবিক কারণে সেখানকার শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সর্বত্র একই রকম ছিল না। এই ধরনের স্থানীয় শাসন পরিচালনার অধিকার বঙ্গদেশের অনেক পুরানো জমিদার পরিবার লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকজন জমিদার-দের আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রাদেশিক শাসকদের দরবারে উপস্থিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। এই বিরল ব্যতিক্রমের যাহারা শরিক হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বীরভূম, পাচেৎ, চন্দ্রকোনা এবং হিজলীর জমিদারদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জমিদারদের মধ্যে কাশিম খাঁর আমলে চন্দ্রকোনা জমিদার বীরহান বিদ্রোহী হইলে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠানো হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার বরদা ও ঝাঁকড়ার ক্ষুদ্র জমিদারগণ কাশিম খাঁয়ের অধীনতা স্বীকার করিলে তাহাদের জায়গীরে নিজস্ব শাসন বজায় রাখিতে দেওয়া হইয়াছিল। যুবরাজ সুজার আমলে হিজলীর শাসক বাহাদুর খান বিদ্রোহী হইলে তাহাকে বন্দী করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তিনি বার্ষিক এক লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হওয়ায় শায়েস্তা খাঁ তাহাকে মুক্ত করিয়া তাহার জমিদারী ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

এই সমস্ত জমিদারদের অধীন অঞ্চলসমূহে প্রশাসনিক কি ব্যবস্থা ছিল তাহা স্পষ্টভাবে বলা খুবই মুশকিল। সাহজাহানের সময় তিনি এক ফরমান জারি করিয়া তাহার রাজকীয় কর্মচারীদের জানাইয়াছিলেন যে, নারায়ণগড় অঞ্চলের রাজাকে (জমিদার) নির্দিষ্ট বার্ষিক রাজস্বদানের প্রতিশ্রুতিতে তাহার অধীনস্থ অঞ্চলের শাসনকার্যে মোগলেরা হস্তক্ষেপ করিবে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে অথবা ঐ অঞ্চলে শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে মোগলরা অভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করিবে।

টোডরমল মোগল অধিকৃত রাজ্যগুলিকে কতকগুলি সরকারে বিভক্ত করেন। এই অবস্থায় বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৯২টি মহালে এবং উড়িষ্যাকে ৫টি সরকার ও ৯০টি মহালে বিভক্ত করা হয়। এই পাঁচটির মধ্যে একটি হইল জলেশ্বর। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ সেই সময় এই জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের অবশিষ্ট সামান্য অংশই সরকার মান্দারনের অন্তর্গত ছিল। এই মান্দারন সরকার অর্ধবৃত্তাকারে আরম্ভ হইয়া বর্ধমান জেলার

রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার জাহানাবাদ, হাওড়া জেলার পশ্চিমাংশ ও মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া (ঘাটাল) ও মহিষাদল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মান্দারন সরকারের ১৬টি মহালের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অংশ চারটি মহালের অন্তর্গত (১) চেতুয়া (দাসপুর থানা), (২) সাহাপুর (ডেবরা থানা), (৩) মহিষাদল (নন্দীগ্রাম থানা), (৪) চন্দ্রকোনা বরদা পাড়া এবং বর্তমান হুগলী জেলার কিছু অংশ।

উড়িষ্যার জলেশ্বর সরকারের ২৮টি মহালের মধ্যে ২০টি ছিল,বর্তমান মেদিনী-পুর জেলায়। 'আইন-ই-আকবরীতে' তমলুক মহালের উল্লেখ আছে। সুজা টোডরমলের এই বিভাগের কিছু পরিবর্তন ঘটান। তিনি উড়িষ্যার জলেশ্বর, কটক ও ভদ্রক সরকারকে নূতনভাবে সাজান। এই বিভাগ অনুসারে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই সরকার মালঝিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান তমলুক মহকুমার প্রায় সম্পূর্ণ টি জঙ্গল মহালের কিয়দংশ এবং দাঁতন বাদে সদর মহকুমার সমস্ত অংশই সরকার গোয়ালপাড়া এবং এগরা, রামনগর থানা ব্যতীত কাঁথি মহকুমার অবশিষ্টাংশ সরকার মালঝিটা এবং রামনগর থানা ও বালেশ্বর জেলার (সরকার মুজকুড়ি) কিয়দংশ সরকার মুজকুড়ি এবং দাঁতন ও এগরা থানার এবং বালেশ্বর থানার কতক অংশ সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উড়িষ্যা রাজ্য ৩১টি দণ্ডপট্ট বা দণ্ডপাটে বিভক্ত ছিল। প্রতি দণ্ডপাটে একজন শাসনকর্তা থাকিতেন। তাহার উপাধি ছিল দণ্ডপাট। প্রাচীনকালে উড়িষ্যা ৩১টি পাট ও ১১০টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে ৬টি দণ্ডপাট মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। যথা—টানিয়া, জৌলিতি, নারায়ণপুর, নৈগাঁ, মালঝিটা ও ভঞ্জভূম বারিপাদা। টানিয়া দণ্ডপাটের ভিতর কাঁকড়া চোর, বালেশ্বর চোর, দাঁতুনিয়া চোর, নারাঙ্গা চোর, বিনিসারা বা বালিসারা চোর ও বোড়ই চোর নামে ৬টি বিশি ছিল। এই নামের কয়েকটি জায়গা বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলার রেকর্ডে দেখা যায়। জলেশ্বর এখনও টুনিয়া জলেশ্বর নামে পরিচিত। বর্তমান কাঁথি মহকুমার অনেকাংশই মালঝিটা দণ্ডপাটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেশপুর, শালবনী, খড়্গাপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও ময়ূরভঞ্জ জেলার অনেকাংশ লইয়া ভঞ্জভূম বারিপাদা অঞ্চল গঠিত ছিল। বিশিগুলি বিশিরই অধীন শাসিত হইত। বিশিরই অধীন একজন খণ্ডাইৎ ও একদল পাইক থাকিত। ইহারা অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিত। প্রতি গ্রামে একজন চৌকিদারও ছিল। ভুঁইমূল নামক একশ্রেণীর রাজস্ব কর্মচারীও ছিলেন। সামাজিক বাদ-বিসংবাদ বেহারা (বেরা) নামক এক শ্রেণীর প্রধানেরা মীমাংসা

করিয়া দিতেন। ব্যবর্ত্তা বা মন্ত্রীর উপর রাজসরকারের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিত। বর্তমান ভূইঞা, মণ্ডল, বেরা, ব্যবর্ত্তা, দণ্ডপাট, বিষয়ী প্রভৃতি উপাধিগুলি পূর্বপুরুষের পদমর্যাদার পরিচায়ক।

শাসনের সঙ্গে যুক্ত এই ধরনের আরও কতকগুলি উপাধির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সামরিক উপাধি, সেনাপতি, সামন্ত, হাজরা, খাঁড়া, তেউরাল, হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ই, সিংহ, নায়ক, পট্টনায়ক, বল, বনঝাপ, পাইক, কপাট, বাটুল প্রভৃতি।

সাহজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে পর্তুগীজদের উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় সরকার বঙ্গোপসাগর উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার নির্দেশক্রমে উড়িষ্যার অন্তগত পূর্বে উল্লিখিত চারটি সরকারের মধ্যে কয়েকটিকে পুনর্বিন্যাস করিয়া হিজলী ফৌজদারী ও বন্দর বালেশ্বর ফৌজদারী গঠিত হইয়াছিল। এই সময় হিজলী ফৌজদারীকে উড়িষ্যা সুবা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং সেই সময় হইতে মেদিনীপুর জেলার এই অংশ বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

মুর্শিদকুলী খান এই বিভাগগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। তখন হইতে মহালগুলি পরগনা নামে অভিহিত হইতে থাকে। চাকলা হিজলী ও চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত অনেকগুলি পরগনা বহুদিন পর্যন্ত উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে নবগঠিত চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধির শর্তানুসারে মীরকাশিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চাকলা মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম ছাড়িয়া দেন। ফলে এইসব অঞ্চলে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম মোগল সুবাদারদের রাজধানী ছিল গৌড় ও তাণ্ডা। মানসিংহ বঙ্গের প্রাদেশিক রাজধানী তাণ্ডা হইতে আকবর মহলে (রাজমহল) স্থানান্তরিত করেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খান রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং তাহার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগরে। সুজা বঙ্গের সুবাদার হিসাবে রাজমহলে তাহার আবাসিক রাজধানী স্থানান্তরিত করেন যদিও প্রাদেশিক রাজধানী আকবর মহলে থাকে। মুর্শিদকুলী খান সরকারের দেওয়ানী বিভাগ মুর্শিদাবাদ স্থানান্তরিত করেন। তিনি এবং তাহার পরবর্তী নবাবদের বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছিল।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর ফলে বঙ্গদেশের রাজনীতিতে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। বঙ্গ ও উড়িষ্যার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান নিজেই প্রায় স্বাধীন নিজামত প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল দরবারে রাজনৈতিক অবস্থা ও বিশৃঙ্খলার ফলে সুবাদারগণ নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং সেই

সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া মুর্শিদকুলী খান বঙ্গদেশে প্রায় স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় বঙ্গদেশের নবাবদের দিল্লীর সম্রাটের সহিত সম্পর্ক মৌখিক আনুগত্য ও নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মোগল সম্রাটদের এই সমস্ত অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না।

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে মনে হয় মোগল পূর্বযুগে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাজস্ব প্রথাসমূহই আকবর বজায় রাখিয়া ছিলেন। এই রাজস্ব প্রথার প্রধান দিকগুলি ছিল : (১) রাষ্ট্র ও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ, (২) প্রজা কর্তৃক সরকারকে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান, (৩) গাল্লাবক্স (ফসল ভাগাভাগি) প্রথার প্রচলন, (৪) জমিজরিপ প্রথার প্রচলন দ্বারা সেই যুগে রাজস্ব ধার্য করা হইত নির্দিষ্ট কোন জমির কয়েক বৎসরের উৎপন্ন ফসলের ভিত্তির উপর।

মুসলমান শাসনের সময়কাল হইতেই বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক জমিদার ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ডিহিদার প্রভৃতি অনেক দালালদের সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। ইহা ছাড়াও জায়গীরদারদের সংখ্যাও খুব কম ছিল না। সেই যুগে বঙ্গদেশে কয়েক প্রকার জমি ছিল (১) জমিদারী, (২) ইজারাদারী, (৩) শিকদার বা তামিলদের অধীন জমি, (৪) জায়গীর ও আয়মার জমি।

বঙ্গদেশে দুই প্রকার জমিদার ছিলেন : (১) পেশকাশ বা করপ্রদানকারী জমিদার, (২) রাজস্বের ইজারাদার। বঙ্গদেশে জায়গীর জমির পরিমাণ খুব ব্যাপক ছিল। কারণ সে যুগে বেশীর ভাগ সামরিক ও বে-সামরিক রাজকর্মচারী-দিগকে জায়গীর দানের মাধ্যমে তাহাদের বেতন দানের ব্যবস্থা ছিল। ইহাই 'ইক্তা' নামে পরিচিত। খালসা জমির ক্ষেত্রে জমিদারগণ হয় করদাতারূপে অথবা রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে থাকিতেন।

বঙ্গদেশের অর্থনীতি তখনকার দিনেও ছিল এখনকার মত কৃষি নির্ভর, অধিকাংশ লোকেরা ছিল গ্রামবাসী। তাহাদের চাষের জমিবাদে বাস্তু ও গোচারণ জমি ছিল (যৌথ বা এককভাবে)। সাধারণতঃ এই জমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল (১) খিল অথবা অনুর্বর অথবা লাল (চাষযোগ্য জমি)। সাধারণ চাষযোগ্য জমির উপর রাজস্ব ধার্য করা হইত। এই যুগে জমি পরিমাপ করার পদ্ধতি কি ছিল তাহাও সঠিক বলা সম্ভব নয়। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতার বর্ণনায় মনে হয় যাহারা নদীর তীরে বাস করিতেন তাহারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ও অন্যান্য উপঢৌকনসহ রাজস্ব দিতেন। প্রায় একই সময়ে চৈনিক রাষ্ট্রদূতে

ওয়াং-তা-ইউয়ানের লেখা হইতে মনে হয় বঙ্গদেশে রাজস্বের হার ছিল মোট উৎপন্ন ফসলের দুই-দশমাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ। মনে হয় এই হার কখনও সর্বত্র সমান ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভূমির উর্বরতার তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্বের হার আলাদা আলাদা হইত।

এই যুগে জমির প্রকৃত মালিকানা কাহার ছিল ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড (Moreland) মনে করেন মুসলিম যুগে সুলতানরাই ছিলেন জমির মালিক। সমসাময়িক ইতিহাসে ইহার সঠিক উত্তর পাওয়া খুবই কষ্টকর। মনে হয় যদিও সুলতান আইন মাফিক জমির মালিক ছিলেন তথাপি কৃষকরাও বংশানুক্রমে কতকগুলি অধিকার ভোগ করিত। সুলতানী আমলে কৃষকদের এই অধিকার কিভাবে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করিত তাহা জানা যায় না। কারণ আমরা জানি কৃষকদের স্বীকৃতিস্বরূপ 'পাট্টা' বিতরণের কাজ মোগলযুগেই শুরু হইয়াছিল।

সুলতান আইনগতভাবে তাহার রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি এই জমিকে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করিতেন। বঙ্গদেশের বিজেতা মুসলমানগণ আসলে ছিলেন সৈনিক। তাহারা রাজস্ব আদায়কারীর ভূমিকা প্রথম অবস্থায় তেমন পছন্দ করিতেন না। সেইজন্য সেইযুগে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রধান বা ভূস্বামীদের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায়সহ খাজনা আদায় করিয়া তাহার নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব হিসাবে জমা দিত। এই কাজের কোন ত্রুটি ঘটিলে তখনই তাহার শাস্তি বিধান করা হইত।

প্রধান ভূস্বামীদের পরেই ছিলেন অগণিত রাজস্ব আদায়কারী জায়গীরদার। এই সমস্ত ইক্তাদার বা মুক্তাদারই নির্দিষ্ট জমিকে রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহা হইতে খাজনা আদায় করিতেন। তাহাদের কি পরিমাণ খাজনা দিতে হইত সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না।

পূর্বে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর ভূমি ব্যতীত আর একশ্রেণীর জমিও সুলতানরা ভোগ করিতেন, তাহার নাম 'খালসা'। যাহা সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হইত। এই খালসা জমির শাসনভার দুইশ্রেণীর কর্মচারীর উপর ছিল (১) তামিল ও (২) মোকাদ্দম।

সুলতানী আমলে বঙ্গদেশে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদানের প্রথা চালু ছিল। ইহা ছাড়া কিছু জমি ছিল নিষ্কর। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য এই জমি দান করা হইত। এই জমির অর্থ হইতে

কোন প্রকার খাজনা না দিয়া সেই অর্থে নির্ধারিত ধর্মীয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার নির্বাহ হইত।

তর্কী আফগান সুলতানদের ঠিক বিপরীত ধর্মী মনোভাব ছিল মোগল সম্রাটদের। বঙ্গদেশে অধিকার ও শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। বঙ্গদেশ অধিকার করিবার পর আকবর তাহার বিশেষজ্ঞ রাজা টোডরমলকে বঙ্গদেশে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করিতে নির্দেশ দেন। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশের যে পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা বহুকাল আসল জমা "তুমার" নামে পরিচিত ছিল। টোডরমলের এই ব্যবস্থা সরাসরি জমিদারদের সঙ্গে হইয়াছিল। যাহাদের সম্পর্কে আবুল ফজল বলিয়াছেন "ইহারা ধনী, ক্ষমতাবান ও সংখ্যায় প্রচুর"। প্রকৃতপক্ষে মোগল রাজস্ব ব্যবস্থা সর্বত্র একই রকম ছিল না। সেজন্য ইহার নির্দিষ্ট নীতি বা পরিষ্কার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 'আইন-ই-আকবরীতে' বঙ্গসুবার ১৯টি সরকার ও ৬৮৮টি মহালের প্রত্যেকটি রাজস্বের হিসাব আছে। আবুল ফজলের এই হিসাবের মধ্য হইতে দেখা যায়। 'সরকার মান্দারনের' মহাল ছিল ১৬টি ও তাহার বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৯,৪০৩,৪০০।

মোগল যুগে খালসা ও জায়গীর এই দুই রকম জমিতে জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। এমন কি রাজমহল, পুর্ণিয়া, রংপুর এবং মেদিনীপুরের মত সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বঙ্গদেশের ভূমিরাজস্ব এই জমিদারদের মারফৎ আদায় হইত এবং জমিদাররা ইহা সংগ্রহ করিতেন রায়তদের নিকট হইতে। টোডরমলের "তুমার জমা" মুর্শিদকুলীর সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

ভূমিরাজস্ব সংগ্রহে নিদারুণ কঠোরতা দেখা যায় মুর্শিদকুলীর সময়ে। তিনি অবশ্য মোট রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করেন নাই। তাহার কঠোর ব্যবস্থা, খুঁটিনাটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাজস্ব সংগ্রহে নিয়মিত করিয়াছিল এবং পূর্বেকার অনেক বিশৃঙ্খলা দূর করিয়াছিল। মুর্শিদকুলীর কঠোরতায় প্রকৃত-পক্ষে জমিদারী ব্যবস্থা আরও জোরদার হইয়া উঠিল। কারণ যতদিন পর্যন্ত জমিদার তাহার পাওনা মিটাইয়া দিতেন ততদিন জমিদারীকে চিরস্থায়ী ও বংশানু-ক্রমিক ধরা হইত। সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দীর সময় এই নীতি লক্ষণীয় ছিল। কেবল জমিদারদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার মুর্শিদকুলীর মত কঠোর ছিল না।

মুর্শিদকুলীর সময়ে বঙ্গদেশের গ্রামের সংখ্যা ছিল প্রায় একলক্ষ। এই গ্রাম-

গুলি ১৬৬০টি পরগনায় গঠিত হইয়াছিল। আকবর ও তাহার পরবর্তী সম্রাটদের সময়ে ১৬৬০টি পরগনা হইতে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য ৩৪টি সরকার গঠিত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী ইহা বাতিল করিয়া দেন। তিনি পৃথক পৃথক ফৌজদার বা তামিলদের অধীনে ১৬৬০ পরগনা বা ১৩টি চাকলা গঠন করেন। তিনি বড় জমিদারী গঠনে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তাহার ভূমিরাজস্বের অধিকাংশ আসিত ৬টি বড় জমিদারদের নিকট হইতে।

মেদিনীপুর জেলাতেও ১৫০০টি ছোট জমিদার ছিলেন। এই জমিদার বা তালুকদাররা রায়তদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখিতেন এবং তাহারা অনেকেই ছিলেন যোগ্য ও দক্ষ। মুর্শিদকুলী খান বড় জমিদারী যেমন চাহিয়াছিলেন তেমন তাহাদের ক্ষমতা অধিক বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

আলিবর্দীর সময়ে জমিদাররা সমৃদ্ধশালী ছিলেন। মীরজাফরের আমলে সর্বব্যাপী যে নৈরাজ্য দেখা দেয় তাহার অপদার্থতায় আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা বঙ্গের নবাবের নিকট ২৪ পরগনার জমিদারী পায়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন নবাব মীরকাশেম বর্ধমান ও চট্টগ্রামসহ মেদিনীপুর ইংরেজদের হাতে অর্পণ করেন। মেদিনীপুর সমর্পনের সময় যে চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে জমিদার ও রায়তদের পূর্বেকার অবস্থা বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।

কৃষকদের অবস্থা

জমির মালিক অথবা তাহাদের কর্মচারীদের সহিত কৃষকদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি ছিল তাহা সঠিকভাবে বলা খুবই মুশকিল। বিভিন্ন নথিপত্র অনুসারে মনে হয় কৃষকরা তাহাদের জমিতে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। যুবরাজ শাহসুজার সময়ে বঙ্গদেশে শাসনকালে দেখা যায় তিনি তাহার কর্মচারীদের বিশেষভাবে জমির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যথাসম্ভব পরিবর্তন না করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মনে হয় ভূস্বামীগণ এবং জায়গীরদারগণ সামন্ত প্রভুদের ন্যায় অধিকাংশ জমির নিয়ন্ত্রণ করিলেও আসলে জমি যাহারা চাষ করিতেন তাহারা ছিলেন মোটামুটি ভূমিহীন। জমির মালিকগণ ইহাদের জমি বিতরণ করিতেন এবং তাহাদের প্রতি অধিকাংশ সময়ই কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতেন। এমন কি অনেক সময় তাহাদের বলপূর্বক বেগার খাটিতে বাধ্য করা হইত। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীরা অধিকাংশই ভূস্বামী বা জায়গীরদারদের দয়ার উপর নির্ভরশীল

ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এই ভূস্বামীরা চাষীদের নিকট হইতে নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কর আদায় করিতেন এবং ইহার জন্য নৃশংসভাবে বলপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কাজেই বঙ্গের সমাজব্যবস্থার একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষক মোটামুটি এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ফলে ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা ছাড়া বৃহৎ জমির মালিকরা অনেক সময় জমির কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে স্ত্রী-পুরুষ ক্রীতদাস নিয়োগ করিতেন। বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক হিন্দু জোতদারদের সন্ধান পাওয়া যায়। যাহারা এযুগে খেতের কাজের জন্য অসংখ্য মজুর নিয়োগ করিতেন। স্বভাবতই বোঝা যায় ইহারা ছিলেন খুব ধনী। ইহাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তরফদার বলিয়াছেন, তাহাদের কাহারো কাহারো জীবনযাত্রা বর্তমান যুগের ধনী জমিদার-দের সহিত তুলনীয়। একদিকে ভূস্বামী অন্যদিকে কৃষকদের মধ্যে কাজের তদারকি করিবার জন্য একদল পরিদর্শক তদারককারী গোষ্ঠী সমৃদ্ধশালী অঞ্চল-গুলিতে দেখা যাইত। ইহাদের সহিত একদিকে ভূস্বামী ও অন্যদিকে কৃষক এই উভয় গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল তাহা কোথাও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ না থাকিলেও মোটামুটি অনুমান করা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মোগল ভারতের কৃষকদের জীবনের বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বঙ্গদেশের কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন বঙ্গদেশে লবণ ছিল খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য। সেইজন্য সেখানকার ব্যক্তিরা বাধ্য হইয়া কলাগাছের গোড়া পোড়াইয়া একধরনের উৎকট বস্তু প্রস্তুত করিত যাহার মধ্যে কিছুটা লবণের সন্ধান মিলিত।

আবুল ফজলের বর্ণনা অনুসারে বঙ্গদেশের ব্যাপক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা আচ্ছাদন বস্ত্র প্রয়োজন মত সংগ্রহ করিতে পারিত না। একধরনের সামান্য কৌপিন ছাড়া তাহাদের আর কিছুই জুটিত না। ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় বঙ্গদেশের সাধারণ কুঁড়েঘরগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ইহা ছিল খুবই ছোট এবং খড়ের ছাউনি। মাটি খুঁড়িয়া কাদার ভিতর দড়ি ও বাঁশ সহযোগে ইহা তৈয়ারী হইত। বঙ্গদেশের কৃষকদের এই বর্ণনা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য

প্রধানত পলিমাটিগড়া বিশাল বঙ্গদেশের সমতলভূমি খুবই উর্বর। ফলে এই অঞ্চল ছিলখুবই উর্বর ও শস্যশালী। বঙ্গদেশের কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান

ছিল প্রধান। চতুর্দশ শতকে ইবনবতুতা তাহার বিবরণে বঙ্গদেশে প্রচুর ধান উৎপাদনের কথা বলিয়াছেন। সপ্তদশ শতকের পর্যটক বার্ণিয়ের মতে বঙ্গদেশ ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শস্যশালী দেশ। ধান বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। তবে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে রোপণ করা ধানচাষের প্রচলন অধিক। আবুল ফজল বলিয়াছেন বঙ্গদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে বৎসরে তিনবার ধানের চাষ হইত। শূন্য পুরাণ ও শিবায়ন কাব্যে বঙ্গদেশে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের ধানের তালিকা আছে। উৎপন্ন ধান এমন কিছু কিছু অঞ্চলে এত উদ্বৃত্ত হইত যে তাহা স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার পরেও বিদেশে রপ্তানি করা হইত। একই ফসলের এত বিভিন্ন রকমফের জনগণকে বিভিন্ন কাব্যিক নামে অভিহিত করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। যথা বাদশাভোগ, দুর্গাভোগ, কুমারভোগ, সিন্ধুমুখি, দাদখানি, সীতাশাল, রূপশাল প্রভৃতি। ধান ছাড়া বঙ্গদেশে অন্যান্য শস্যের মধ্যে উৎপন্ন হইত নানা প্রকার তৈলবীজ, যথা, ডাল, গম, পাট আখ, তুলা, সুপারি ও নীল।

ধানের পরেই উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে তুলা ছিল প্রধান। বিশেষত নদীবিধৌত অঞ্চলে তুলার চাষ হইত প্রচুর পরিমাণে। ফ্রান্সিস, প্রিয়ার্ডের (Pryard) মতে বঙ্গদেশে এত তুলা উৎপন্ন হইত যে তাহা স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার পরও বহু দূর দূর দেশে রপ্তানি করা হইত।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন আম, পেয়ারা, নারিকেল, কলা, শসা প্রচুর পরিমাণে বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধরনের আম কোন কোন মোগল সম্রাটদের অধিক প্রিয় ছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে নারিকেলের ফলন খুবই বহুল ছিল। অর্থাৎ কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপণ্যের অনুপাত মনে রাখিলে বঙ্গদেশ যে খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল ইহা বলিতেই হইবে। ইবনবতুতার বিবরণ অনুসারে দেখা যায় মধ্য যুগে বঙ্গদেশে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ছিল অত্যন্ত অল্প।

কৃষিদ্রব্যের পাশাপাশি বঙ্গদেশে শিল্পেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎপাদনকে কেন্দ্র করিয়া শিল্প গড়িয়া উঠিত এবং এই শিল্প পরিচালনার কাজে যেমন স্থানীয় লোকেরা নিযুক্ত থাকিত তেমনি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালও ঐ অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হইত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রচেষ্টায় সহজ-সরল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল উৎপন্ন দ্রব্য শুধু স্থানীয় প্রয়োজনই মিটাইতে পারিত। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে

একই শিল্পে দীর্ঘদিন বংশানুক্রমিক নিয়োজিত থাকায় শিল্পিরা যে দক্ষতা অর্জন করিতেন তাহার ফলে এক একটি অঞ্চলে এক একটি বিশেষ শিল্প খুবই প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করিত।

বাণিজ্য (প্রধান ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্রসমূহ)

বঙ্গদেশে এই সময়ে শিল্পোৎপাদনে তিনটি বিশেষ পদ্ধতি চালু ছিল। প্রথমটি হইল ক্ষুদ্র হস্তশিল্প। ইহাতে নিজস্ব মূলধনে স্বাধীনভাবে উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলিত। দ্বিতীয়টি হইল কুটিরশিল্প উৎপাদন, যেখানে শিল্পী, বণিক, মহাজন, দালালদের নিকট হইতে অগ্রিম মূলধন গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট দামে ও নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্য যোগাইত। তৃতীয়টি হইল ইউরোপীয় বা এদেশীয় বণিক বা মহাজনদের বাড়িতে বা কারখানায় দলবদ্ধভাবে উৎপাদন করা হইত। এই ব্যবস্থায় শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন, কাঁচামাল এবং উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম সবই মালিকরা সরবরাহ করিত। এক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইত এবং তাহারা স্বল্প পারিশ্রমিক পাইতেন।

পলাশী পূর্ব যুগে বঙ্গদেশের শিল্পে বয়নশিল্প স্থান ছিল খুবই উর্ধ্বে। ইহার তিনটি বিভাগ, সুতিবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও চট। ইহাদের মধ্যে আবার সূক্ষ্ম ও মোটাবস্ত্র উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বঙ্গদেশে এযুগের অর্থনীতিতে বয়ন শিল্পের প্রসার ছিল অন্যতম। রবার্ট ওয়েন লিখিয়াছেন বঙ্গের প্রতি গ্রামে পুরুষ ও নারীরা বস্ত্রবয়নে অধিক সময় নিযুক্ত থাকিতেন। বঙ্গদেশ নানাধরনের বস্ত্র উৎপন্ন করিত। মোটা বস্ত্র হইতে অতি সূক্ষ্ম-মিহি মসলিন বস্ত্র পর্যন্ত এশিয়া ও ইউরোপে বঙ্গদেশের বস্ত্রের চাহিদা ছিল ক্রমবর্ধমান।

বর্ধমানের রাজা তিলকচন্দ্রের অধীনে মেদিনীপুরে ক্ষীরপাই ও রাধানগরে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার অধিকাংশই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সরবরাহ করা হইত।

বিদেশী বণিকদের বিভিন্ন সময়কার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকার ধাতব শিল্প, মৃৎশিল্প, তৈল ও কাগজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙালী নারীদের নানাপ্রকার স্বর্ণালঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে আর একটি শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা হইল জাহাজ নির্মাণ শিল্প। বিশেষ করিয়া সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ইহা খুবই দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ তৈয়ারী একটি বিখ্যাত ও সমৃদ্ধশালী শিল্প ছিল। একদিকে বালাশোর এবং অন্যদিকে চট্টগ্রাম ইহার মধ্যবর্তী হিজলী ও তমলুকে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। এই লবণের প্রতি ১০০ মণের মূল্য ছিল আলিবর্দী'র সময়ে ৪০, ৫০ এমন কি ৬০ টাকা পর্যন্ত। লবণ উৎপাদন-কারী জমিগুলি যে অঞ্চলে ছিল সেখানকার নাম ছিল 'জলপাই'। জলপাই জমিতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল উঠিলে তাহা খালারিতে বা খণ্ডে ভাগ করিয়া লবণ উৎপাদক মাঙ্গলীদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইত। এক একটি খালারীতে গড়ে ৭জন মাঙ্গলী প্রায় ২২৩ মণ লবণ প্রস্তুত করিত। এক মেদিনীপুর জেলাতে ৪০০০ খালারি ছিল। বর্গী'র আক্রমণের সময় এই মূল্য ১৫০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বঙ্গের নবাবরা লবণ ব্যবসায়ের উপর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেন। এবং তাহারা রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ইহাকে পছন্দমত নিয়ন্ত্রণ করিতেন। মেদিনীপুর ইংরেজদের অধিকারে আসার পর এই ব্যবসার বিরাট এক পরিবর্তন আসিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লবণ ব্যবসা পুরোপুরি দেশীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখানেও সূতি ও রেশম শিল্প ব্যবসার মত দাদন প্রথা চালু ছিল। বণিকদের নিকট হইতে দাদন অগ্রিম লাভ করিয়া প্রস্তুতকারীরা লবণ তৈয়ারী করিয়া নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিত। উৎপাদনকারীরা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদার-দের সাহায্যে কাজ করিতেন। অর্থাৎ এই সময়ে লবণের ব্যবসা পুরোপুরি একচেটিয়া অধিকার কাহারও ছিল না। মোগল সরকার ইহার উৎপাদনের উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও নজর রাখিতেন। বঙ্গের নবাবরা সাধারণত লবণ উৎপাদন ও বিতরণের দায়িত্ব নিজেদের প্রিয় অনুচরদের উচ্চমূল্যে দান করিতেন। তাহাদের অনেকে অবশ্য প্রায় ইহার উপরে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিত।

বঙ্গের অন্য একটি প্রধান শিল্প ছিল চিনি। এখান হইতে চিনি ছিল তৃতীয় রপ্তানীযোগ্য পণ্য। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে চিনির উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ মণ।

কেম্ব্রিজ ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের লেখকদের মতে মোগলযুগে মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর পরিমাণে ফুল হইতে সুগন্ধি ও গন্ধতৈল প্রস্তুত হইত এবং তাহা বহু দূর দূর দেশে রপ্তানি করা হইত।

বাণিজ্য

পলাশী পূর্বযুগে বঙ্গদেশের সামগ্রিক বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ, প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক এই তিনভাগে ভাগ করা সম্ভব। এ যুগে বণিক সমাজও তিনভাগে বিভক্ত। বড় ব্যবসায়ী, মহাজন, মাঝারি এবং ছোট ব্যবসায়ী। এই সময়ে

যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল বলা চলে। বাণিজ্যপোযোগী সুগম যোগাযোগের সঙ্গে প্রচুর নদী, নিকটবর্তী সমুদ্র, সস্তা পণ্যদ্রব্য এবং প্রভূত কৃষি উৎপাদন সব কিছু বঙ্গদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছিল।

সাধারণত শহর এবং আধা-শহরগুলি ছিল বঙ্গদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রা প্রধানত কৃষি নির্ভর ছিল। মধ্যযুগে এই শহরগুলিতে বহুদেশের লোকজন আসিয়া জড় হইত এবং তাহারা একই ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। সাধারণত প্রত্যেক শহরে বা নগরে স্থানীয় বাজারে কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও পাইকারী খরিদ্দাররা আসিয়া জড় হইতেন। এই শহরগুলি ছাড়াও বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক নদী-বন্দরও গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহার মাধ্যমে উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করা হইত।

মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তমলুক কিছুটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। যদিও ইহা পূর্বেকার গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে একেবারে পারে নাই। শিহাবুদ্দিন তালিশ-এর লেখা (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি) একটি ফার্সী বিবরণে দেখা যায় তমলুক সে যুগে দাস ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "আকবরের রাজত্বকাল হইতে প্রদেশপাল শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম জয় করা পর্যন্ত আরাকান হইতে মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুদের জলপথে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দস্যুতা ও লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। তাহারা ছোট বড়, হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে ধরিয়া লইয়া আসিত। তাহাদের বন্দী করিয়া হাতের তালু ফুটো করিয়া সেখানে বেত ঢুকাইয়া বাঁধিয়া রাখা হইত এবং বন্দীদের শুকনো চাল খাদ্য হিসাবে দেওয়া হইত। এই বন্দীদের উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের জন্য কখনও তমলুক, কখনও বালাশোরে লইয়া যাইত। এই অঞ্চল যদিও মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তখনও মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায় নাই। হতভাগ্য বন্দীদের এই অবস্থায় তমলুকের নদীর তীরে উপকূলের অদূরে আনিয়া উপস্থিত করা হইত এবং সেখান হইতে একজন তীরে নামিয়া ক্রীতদাস বিক্রয়ের সংবাদ জানাইয়া আসিত। স্থানীয় কর্মচারীরা দস্যুদের অত্যাচারের ভয়ে অনুচরবেষ্টিত অবস্থায় নদীর তীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একজনকে দস্যুদের নৌকায় পাঠাইত। দাম ঠিক হইলে সেই লোকটির সহিত ক্রীতদাসদের পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

মধ্যযুগে যখন তমলুক বন্দরের গুরুত্ব কমিতে ছিল সেই সময়ে হিজলী একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। Ralph Fitch-এর ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের

লিখিত বিবরণ অনুসারে দেখা যায় হিজলী বন্দরে সুমাত্রা, মালাক্কা, মেঘপট্টম হইতে প্রতি বৎসর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জাহাজ আসিত। এখানে যেসব পণ্য বিনিময় হইত তাহাদের মধ্যে ধান, তুলা, পশম, চিনি, কাগজ, মাখন ও অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা দেখা যায়। পর্তুগীজদের হিজলীতে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল যেখান হইতে মোগলরা ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের বিতাড়িত করে। সপ্তদশ শতক হইতে ওলন্দাজ বণিকরা এই অঞ্চলে ব্যবসা শুরু করে। এই শতকের শেষদিক হইতে ইংরেজরাও ওলন্দাজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। ইংরেজদের বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যতরী নিরাপদে হুগলীর অভ্যন্তরে বাণিজ্য করিতে না পারায় তাহারা অধিক পরিমাণে হিজলী বন্দর ব্যবহার করিতে শুরু করিল। পরবর্তীকালে তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরভাগে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের মতে (১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ) সে যুগে চন্দ্রকোনা ও রাধানগর তুলা, কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য তৈয়ারীর একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ফরাসী ও ওলন্দাজরাও পরে ঘাটাল মহকুমায় তাহাদের বাণিজ্য প্রতিনিধিকে প্রেরণ করিতে শুরু করে। যদিও তাহাদের বাণিজ্যের পরিমাণ ইংরেজদের মত এত বিপুল ছিল না।

ভ্যালেণ্টাইম (১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন যে হিজলী পূর্বে ওলন্দাজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এবং পর্তুগীজদেরও এখানে বাসস্থান ও গীর্জা ছিল। এখানে প্রধানত ধানই ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্য ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তাহারা (ওলন্দাজ) আরও অন্যান্য স্থানে ব্যবসা করিয়াছে যেখানে তাহাদের গীর্জা ও বাসস্থান ছিল। তাহাদের উল্লিখিত স্থানগুলির মধ্যে তমলুক (Tamboli) একটি। এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে তমলুক বন্দরের কাজকর্ম প্রাচীন যুগে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহা সঠিক নয়। পর্তুগীজরা এই অঞ্চল পুরোপুরি পরিত্যাগ করে নাই। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে Gamelli Careri-র এক বর্ণনায় এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য হইতে মনে হয় বঙ্গদেশে প্রধান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, দস্তা, মূল্যবান পাথর, শাঁখ, কার্পেট, আফিং ও আরবী ঘোড়া প্রভৃতি ছিল। স্থল ও জলপথে এই পণ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এবং তিব্বত, সিরিয়া, আরব, পারসিয়া, মালাক্কা, পেগু প্রভৃতির সহিত আদান-প্রদান হইত।

অর্থ নৈতিক অবস্থা

বিভিন্ন পর্যটকদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে মধ্যযুগে বঙ্গদেশের জনগণের অর্থ নৈতিক অবস্থা যথাযথ চিত্র পাওয়া খুবই মুশকিল। অর্থ নৈতিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে বঙ্গদেশের জনগণকে মোটামুটি তিনভাগে স্পষ্টতই ভাগ করা যায়। উচ্চবিত্ত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অপর আর সকল সম্প্রদায়। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অভিজাত আমীরগণ, ভূস্বামীগণ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। বণিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত প্রভৃতি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। অগণিত কৃষক, তাঁতি, মজুর, মৎসজীবি, গোয়ালা সূত্রধর, কুম্ভকার, ঘটক, জ্যোতিষী প্রভৃতি ছিল বাকি অন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উচ্চশ্রেণীর জনগণ সাধারণত ছোট বড় শহরে বাস করিতেন। তাহারা (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) মূল্যবান আসবাবপত্র ব্যবহার করিতেন। ভাল বাড়িতে থাকিতেন। এককথায় অনেক কিছু তাহারা ভোগ করিতে পারিতেন। বিভিন্ন চৈনিক ও অন্যান্য ভ্রমণকারীদের বর্ণনা হইতে ইহা জানিতে পারা যায়।

মধ্যবিত্তদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বারবসা কোন উল্লেখ করেন নাই। মোরল্যাণ্ড আকবরের সময় ইহাদের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া মনে করিলেও তিনি বলিয়াছেন বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের মর্যাদার উপযুক্ত জীবনযাত্রার উপযোগী জীবিকা নির্বাহ করিতেন যাহা মোটামুটি স্বচ্ছল বলা চলে।

তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা প্রধানত গ্রামাঞ্চলে বাস করিতেন। যেহেতু ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র সেই হেতু ইহাদের জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যধিক নিম্ন। ইবন-বতুতা বর্ণিত অতি অল্প মূল্যের পণ্য সামগ্রীও তাহাদের অনেকের পক্ষে ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে ছিল। তাহাদের খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্ন-মানের। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকিত না। এই শ্রেণীর লোকেদের দুর্দশার কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নিখুঁতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সূত্র নির্দেশ

১। History of Mediaeval Bengal, 1974, R. C. Majumdar, Pp. 80-82

২। বাংলার ইতিহাস (সুলতানি আমল, বাংলা দেশ), ৯৭৭, আব্দুল করিম, পৃঃ ৪৯০-৫১৫

। Husain Sahi Bengal, M. R. Tarafdar, 1965, Pp. 90-107, 135-136

৪। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, (ঢাকা-একাডেমি), এম, এ, রহিম, ১৯৮২, পৃঃ ৩৮-৩৯, ৪৭, ৫৯-৮৫, ১০৩-১২৩

৫। Bengal Under Akbar and Jahangir, 1953, T. K. Raychaudhuri, Pp. 17-24, 37

৬। District Gazetteer, Midnapore, 1911, O'Mally, Pp. 25-26

৭। মেদিনীপুরের ইতিহাস, যোগেশচন্দ্র বসু, পৃঃ ১১-১২, ১৮২-১৮৩

৮। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭০ সাল, পৃঃ ২১৭-২২৬

৯। মেদিনীপুর—১৯৭৯, তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৮-১৯

১০। History of Bangal, A. C. Roy, 1965, Pp. 319-323, 337-343

১১। বাংলার অর্থ নৈতিক জীবন, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ১৯৪৭, পৃঃ ১-১৫

১২। The Agrarian System of Muslim India, W. H. Moreland, Pp. 189-200

১৩। মুগল ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা, ইরফান হাবিব, ১৯৮৫, পৃঃ ১০০, ১০৩-১০৪, ২৪১-২৪২

১৪। The Salt Industry of Bengal, 1757-1800, Balai Barui, 1985, Pp. 6-7, 11-12

১৫। বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত, সুরেন্দ্রনাথ জানা, ১৯৭১, পৃঃ ৩০-৩১

১৬। The Cambridge Economic History of India, Vol. I, Raychaudhuri and Habibi, 1984, Pp. 273-275

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃতি

ইসলামের সম্প্রসারণ

রাজশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই উপায়ে সম্প্রসারিত হয়।

প্রত্যক্ষ উপায়গুলির মধ্যে চারটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। প্রথমতঃ সামরিক অর্থাৎ বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে বিজেতা মুসলমানগণ এক হস্তে তরবারি ও অন্য হস্তে কোরান লইয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে হিন্দুগণ যেখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শুধুমাত্র তরবারি দ্বারা ধর্মান্তরিত করা সহজ ছিল না। মুসলমান শাসন স্থাপিত হইবার পর বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের গতি বৃদ্ধি পায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় বলপ্রয়োগের কিছু ঘটনা ঘটিলেও তাহাই ধর্মান্তকরণের একমাত্র কারণ নহে। ইহার পশ্চাতে আরও রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ নিহিত আছে। মুসলমান ধর্মও সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে শাসকবর্গ, অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন।

পরোক্ষ উপায়গুলির মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি হইল স্বেচ্ছাপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণ। ইহা ছিল প্রত্যক্ষ উপায়ের একটি প্রশস্ত পন্থা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও প্রধানত এই ধর্মে নিম্নশ্রেণীর জনগণই অধিক পরিমাণে যোগদান করিয়াছিল। ইহা ছাড়া নানা সামাজিক কারণে হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ন্যায় পূর্ব-ভারতে ব্রাহ্মণধর্ম সুসংগঠিত অথবা সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণ পরিপূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিল না। মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে উহারা ভ্রষ্টাচারে পূর্ণ বৌদ্ধধর্মের এক বিকৃত অনুগামী ছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী সর্বজনবিদিত। পাল যুগের বৌদ্ধরা সেন যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের ফলে নিগৃহীত হইয়াছিল। ফলে সেই সময় বৌদ্ধধর্ম ছিল মৃতপ্রায়। সমাজে তন্ত্রমন্ত্রের প্রসার খুবই প্রবল হইয়াছিল। বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ অনুগ্রহ লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। পালযুগে সমাজের কোণশ্রেণী, বণিক, শিল্পী, কৃষক, চণ্ডাল কেহই অবজ্ঞাত হয় নাই। কিন্তু এখন কৃষককুলও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ অবহেলিত

হইতে লাগিল। বৌদ্ধ লেখক তারানাথের বিবরণী হইতে অনুমান করা যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ব্রাহ্মণদের প্রতি সহজাত ক্রোধে মহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর গুপ্তচরের কার্য করিয়াছিলেন। সেকশুভোদয় গ্রন্থের বিবরণে মনে হয় তুর্কী বিজয়ের ঠিক পূর্বে লক্ষণসেনের দরবারে একজন ঐসলামিক প্রচারক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বিজয়ীদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। স্বাভাবিক কারণে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মুসলমান বিজেতাদের মুক্তির দূত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে এখনও ধর্মপূজার প্রচলন রহিয়াছে। তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রীতি-নীতি একে অন্যের সহিত এখানে মিলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের ফলে ধর্মঠাকুর তাহাদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফলে হিন্দুর দেবদেবীগণের রূপান্তর ঘটিল। ধর্ম যবনরূপী, বিষ্ণু পয়গম্বর, ব্রহ্মা পাকাম্বর, শূলপাণি (শিব) আদম, গনেশ গাজী, কার্তিক গাজী, মুনি ফকির, চণ্ডিকাদেবী হায়াবিবি, নূর (জ্যোতিবিবি) প্রভৃতি এই হিন্দু দেবদেবীগণ ইসলামের বেশ পরিয়া জাজপুরে প্রবেশ করিয়া একাধিক মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া কাহিনী প্রচলিত আছে।

এইরূপে সামাজিক উৎপীড়ন এড়াইতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইসলামকে স্বাগত জানায়। এই অজ্ঞাত, অবহেলিত, মৎসজীবি, কৃষক, ব্যাধ প্রভৃতি অস্পৃশ্য ও অপবিত্র উপজাতির নিকট ইসলাম তাহার সাম্য ও একেশ্বরের বাণী লইয়া সামাজিক বাধানিষেধ মুক্ত উন্নতর জীবনের সন্ধান দেয়। এই জন্য মোল্লা মৌলবিদের প্রচারে প্রভাবিত হইয়া অনেকে ধর্মান্তরিত হইয়াছিল।

সামাজিক মর্যাদা ও বৈষয়িক সুবিধালাভের প্রলোভনে অনেকে ধর্মান্তরিত হইতেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক বৈষম্য অবলুপ্ত হইত। তখন জিজিয়াকর, তীর্থকর প্রভৃতি হইতে রেহাই পাওয়া যাইত। সময় বিশেষে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেন। বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে অধ্যাপক সুকুমার সেন তাহারও কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছেন। তবে ইহাদের আনুপাতিক সংখ্যা নির্ণয় করা মোটেও সহজ নহে। মনে হয় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় অনেক সময় অতি সহজে কল্পিত দোষে যথা—দৃষ্টিদোষ, স্পর্শদোষ, খাদ্যদোষ, ঘ্রাণদোষ প্রভৃতিতেও ধর্মান্তরিত হইত। হিন্দু সমাজের কঠোর অনুশাসনের ফলে ইহা সম্ভব হইত। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ খুলনা জেলার পিরালী ব্রাহ্মণদের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে।

(৩) ধর্মীয় বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মান্তরকরণ

সামরিক উপায়, বলপ্রয়োগ বা কৌশল ব্যতীত ধর্মীয় বা শান্তিমূলক উপায়েও ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার বহু পূর্বে মুসলমানগণ বঙ্গদেশের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, বিশেষত বণিক, অভারতীয়, আরব, তুর্ক, আফগান, মুসলিম ঔপনিবেশিক ও ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে। বঙ্গদেশে ইসলামিক সৈন্যবাহিনী পৌঁছাইবার বহু পূর্বেই ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাব ঘটে। ইসলামের প্রচারে তাহাদের কৃতিত্ব অস্ত্রশক্তি অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রচার বলপ্রয়োগ বা রক্তপাতের দ্বারা হয় নাই, সাধুসন্তদের দ্বারাই ইহার সূচনা হইয়াছিল। এই শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশের ফলে বঙ্গদেশে ইসলামের প্রসারে উত্তর ভারত অপেক্ষা প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতে ইসলামের প্রসার সাধারণত শহরাঞ্চল ও প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে ইসলাম প্রধানত গ্রামাঞ্চলেই প্রসারিত হয়। রিসলে (Risely) সাহেব এইজন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রধানত উপজাতিদের মধ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

ইসলাম ধর্মে পুরোহিত বা যাজক নাই। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মাত্রই প্রচারক। পীর, ফকির, গাজী ও মোল্লা পুরোহিতদের অভাব পূরণ করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন পীর, ফকির, দরবেশ ও সুফীসন্তদের অনাড়ম্বর জীবন ও জ্ঞান প্ররোচনার দ্বারা অনেকে প্রভাবিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন কবি, বিদ্বান ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ। তাহারা একদিকে যেমন বহির্বঙ্গের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন তেমনি কতকগুলি শিক্ষা ও ধর্মচর্চার নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বাণিজ্য প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে যেসব শহরগুলি গড়িয়া ওঠে তাহার অনেক-গুলিতে সাধুসন্তদের আবাসস্থল ছিল।

বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের স্বর্ণযুগ হিসাবে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করা যায়। সুফীসন্তদের দ্বারাই এই প্রচারকার্য সম্পন্ন হইত। মধ্যযুগের প্রথম পর্বে বঙ্গদেশে সুফী সম্প্রদায়ের এক শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। মুসলমান শাসনকালে বঙ্গদেশ ছিল সুফী অধ্যুষিত দেশ। ইহারা বঙ্গদেশে মুসল-মান ধর্ম সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। কি ইসলাম ধর্ম বিস্তারে, কি মুসলমান শাসন সম্প্রসারণে বিশেষ করিয়া সাধারণ বাঙালী অধি-বাসীদের মনে ঐসলামিক নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানে ইহাদের কৃতিত্ব সেনাপতি শাসকদের অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী ও কার্যকরী ছিল। তাহাদের

ধর্মীয় অনুরাগ, ধর্মপ্রচারের আদর্শ স্থানীয় চরিত্র ও মানব হিতৈষণামূলক কার্যাবলীর দ্বারা তাহারা জনমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বঙ্গদেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সুফীদের খান্‌না (আশ্রম)-গুলি ছিল আধ্যাত্মিক মানব কল্যাণমূলক কার্যাবলীর একটি প্রধান কেন্দ্র।

সুফী নামটি সাধারণত ইসলামের মরমীবাদী বা সাধুপুরুষদের নামের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। প্রথম যুগে আরব মুসলমানদের মধ্য হইতে উৎপত্তি লাভ করিলেও সুফীবাদ পারস্যে পরিপূর্ণ প্রসার লাভ করে।

ইসলাম অধ্যুষিত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত হইতে বিভিন্ন সময়ে শত শত সুফী দরবেশ বঙ্গদেশে আগমন করেন। সম্ভবতঃ একাদশ শতকে শাহ সুলতান রুমির সহিত ইসলামের সুফী মতবাদ ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে। তিনি ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তবে সুফী মতবাদের প্রভাব গভীর-ভাবে ভারতীয়দের মনে রেখাপাত করিতে শুরু করে ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে। এই সময়ে চিস্তি ও সুরাবর্দী এই দুই গোষ্ঠী ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চিস্তি গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন বিখ্যাত সাধক খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি। যিনি ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। সুরাবর্দী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়ক বাহা-উদ্দিন ডাকরিয়া মুলতানি, যিনি ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। সৈয়দ মহম্মদ খোথ গিলানি যিনি ১৪৮২ সালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তিনি হইলেন কোয়াদিরি (কাদোর) (Quadiri) সুফী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে খাজা মহম্মদ বাখ্‌ডি বিলাহ কর্তৃক নাকস্‌ বন্দী সুফী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়। চতুর্দশ শতকের আর একটি বিখ্যাত সুফী গোষ্ঠীর নাম হইল মাদারী গোষ্ঠী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাহাউদ্দিন শাহাই মাদার।

উপনিষদের একেশ্বর পন্থী রহস্যবাদ ও বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদী রহস্যবাদের সমন্বয়ে সহজতর পন্থায় যে আন্দোলন চলিতেছিল ভারতে প্রবেশ করিয়া সুফীবাদ প্রতিষ্ঠার ইহা ছিল একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। ইহার ফলে দ্রুতগতিতে দ্বাদশ শতকে সুফীবাদ ভারতবর্ষে দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই যুগের ইতিহাস ছিল রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিরোধ, বিসংবাদ ও সমন্বয়ের যুগ। এই যুগে সেই সমন্বয়ের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল সুফীবাদ। ফলে তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল।

উত্তর ভারতকে প্রভাবিত করিয়া বঙ্গদেশে সুফীবাদ প্রবেশ করিয়াছিল। এখানে সাতগোষ্ঠীর সুফীবাদ প্রচারিত ছিল। তাহার মধ্যে মগদুম শেখ জালাল-

উদ্দিন তাবরেজী (১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু) প্রতিষ্ঠিত সুরাবর্দী গোষ্ঠী সম্ভবতঃ প্রাচীন। উত্তর ভারতীয় সুফী, সন্ত শেখ ফরিদউদ্দিন সাকরা গঞ্জ (মৃত্যু ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে চিস্তি সুফীগোষ্ঠীর প্রবর্তক। পাণ্ডুয়ার শাহ সুফীউদ্দিন শাহী সম্ভবতঃ এই গোষ্ঠীর প্রচারক। সম্ভবতঃ মাদারী গোষ্ঠীর বঙ্গদেশে প্রসার শেখশাহ মাদার নিজেই করিয়াছিলেন। সুফীবাদ সমগ্র বঙ্গদেশে এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। বঙ্গের সুফীবাদ ছিল উত্তর ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার সুফীবাদের বিস্তৃতি। কিন্তু কালক্রমে তাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন। তাহারা হিন্দুদের 'যোগ' ও বৌদ্ধদের 'সন্ন্যাস' কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে এই উভয়ের সংযোগে বাউল নামে মরমী সম্প্রদায় এই দুই মিলনের পথকে প্রশস্ত করে।

বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত সুফী সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন জালালিয়া। বিখ্যাত শেখ জালালউদ্দিন তাবরেজীর নামে। পাণ্ডুয়ার খ্যাতনামা দরবেশ শেখ আলালের নামে আলাই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহা ছাড়া রুহানিয়া, কলন্দরিয়া এবং শাওরিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নামও বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে আর একটি জনপ্রিয় সুফীগোষ্ঠীর নাম হইল আদামী গোষ্ঠী। ইহাদের লৌকিক সাধারণ নাম হইল খিড়য়ারীগোষ্ঠী। সম্ভবতঃ শেখ হামিদ দানীশমন্দ সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশে নকশাবন্দী গোষ্ঠী নামে আর একটি সুফী দলের প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশে আর একটি সুফীগোষ্ঠী হইল কাদেরীগোষ্ঠী, যাহা সম্ভবতঃ আবদুল কাদের গিলানী ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সুফী, সন্ত দরবেশগন বঙ্গদেশে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারা দলে দলে জনগণকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সুফী ভাবধারা পরবর্তীকালে প্রথমে সহজীয়া ও পরে মরমী বাউল ভাবধারার সহিত একাত্ম হইয়াছিল। ইহাদের কেহ কেহ বহিরাগত, কেহ বা ভারতীয় ছিলেন। ইহাদের প্রভাব কেবলমাত্র তাহাদের আবাসগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষাদান, সুগঠিত প্রচারকার্যের মাধ্যমে এই সন্তগণ জনসাধারণ, শাসকশ্রেণী এমন কি সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতেন। বঙ্গদেশের ধর্মীয় চিন্তা, জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে ও বাঙালী মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে ইহাদের যথেষ্ঠ অবদান রহিয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুফীগণ বহু দরগা ও তাকিয়া (আশ্রম) নির্মাণ করেন। বঙ্গের দুই বিখ্যাত সুফী-আলা-উল-হক ও তাহার পুত্র নূরকুতুব আলমের উদ্দেশ্যে নির্মিত পাণ্ডুয়ার দরগা সেযুগে ছিল উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক শেখ

জালালউদ্দিন তাবরেজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি অনুসারে কোন কোন সুফীসন্ত (যেমন শ্রীহট্টের শাহজালাল) প্রয়োজনবোধে বিজয় অভিযানও পরিচালনা করিতেন। ইহা ব্যতীত অনেক উৎসাহী মুসলমান ও ধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করিতেন। সকলেই মনে করিতেন কোরানের বাণী বিশ্বে প্রচার করা প্রত্যেক বিশ্ববাসীর অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে বঙ্গদেশে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৪) বহিরাগত উপনিবেশিক অধিবাসন

শুধু ধর্মান্তরকরণই বঙ্গদেশে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নহে। বহুসংখ্যক বিদেশী মুসলমানও নানা সময়ে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে বিদেশী বহু মুসলমান (আরব, ফার্সী, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি) বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই বহিরাগতদের আগমন সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে। তাহারা অনেকেই হিন্দু নারী বিবাহ করেন এবং এই মিশ্র বিবাহের ফলস্বরূপ সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে বঙ্গদেশে চারশ্রেণীর মুসলমানের উদ্ভব হয়। (১) বহিরাগত উপনিবেশিক যাহারা সঙ্গে করিয়া স্ত্রী আনিয়াছিলেন। (২) বহিরাগত উপনিবেশিক যাহারা বঙ্গে আসিয়া বিবাহ করেন। (৩) স্থানীয় মিশ্র মুসলমান সম্প্রদায় ও (৪) স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায়। প্রত্যক্ষ এই উপরোক্ত চারটি কারণে বঙ্গদেশে ইসলামের প্রসার ও প্রচার খুব দ্রুত হইয়াছিল।

ইসলামের প্রচারের প্রত্যক্ষ উপায় ব্যতীত নীরব পন্থাও ছিল। এদেশ বিজয়ের পর বিজেতাগণ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা স্থাপন করিতেন। মসজিদের পরিচালক ইমাম ও মাদ্রাসার পরিচালক আলিম ও মৌলবি সমাজে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ফলে সমাজজীবনে ইহাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন পীর, ফকিরের কবরে নিকটবর্তী অঞ্চলে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইত সেখানে ধর্মমত নির্বিশেষে হিন্দুরাও দলে দলে যোগদান করিতেন। মসজিদ সংলগ্ন ইয়াতিমখানা (অনাথালয়) ও মেহেমান খানায় (অতিথিশালা) দরিদ্র, আশ্রিত বালক-বালিকাদিগকে ও চিকিৎসাধীন রুগ্ন ব্যক্তিগণকে অনেক সময় ধর্মান্তরিত করা হইত। পীর, ফকিররা বহু জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। অনেক পীর ফকিরদের অলৌকিক কার্যাবলীর কাহিনী শুনিয়া বহু অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু প্রভাবিত হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুরে দীর্ঘ কাঁসাই নদীর উপর সেতুর নিকটবর্তী হজরত-পীর লোহানীর সমাধি অবস্থিত। ইহার অলৌকিক কাহিনীর বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছে ইনি শ্রদ্ধার পাত্র। মেদিনীপুর শহরে মুসলমানদের আরও একটি স্থান আছে উহা সুবিখ্যাত পীর হজরত মুর্শেদ আলি শাহ সাহেবের দরগাহ এবং খানকা সরিফ নামে পরিচিত। এখানে প্রতিবৎসর শাহ সাহেবের উরস বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে উভয়বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মুসলমান পুণ্যার্থীর সমাগম হয়।

মেদিনীপুর জেলায় উত্তরবিল গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে নাসির খান নামক জনৈক পীরের উরস উপলক্ষে বিরাট জমিতে তিনদিন তিনরাত্রি ব্যাপি বিশাল মেলা বসে। এই জেলায় পটাশপুর থানার অন্তর্গত অমর্ষি গ্রামে পীর মগ্‌দুম সিহাবুদ্দিন চিস্তির আস্তানা আছে। তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী শুনা যায়। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকেন মগ্‌দুম শাহ হিজলীর তাজ-ই-আলার গুরু ছিলেন। তিনি এই মসজিদটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। হিজলীর মসজিদে ফার্সী পুস্তকখানিতে আছে যে মগ্‌দুম তাজ খাঁ-এর গুরু ছিলেন। অমর্ষির কশবা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ পীর মগ্‌দুম শাহের তিরোধান উপলক্ষে পীরের সমাধি পার্শ্বে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরেরও প্রাচীন।

শাসকবর্গ, অভিজাত শ্রেণী, এমন কি কর্মচারীগণও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারে সাহায্য করিতেন। ঐসলামিক মানসের বিকাশে (Sprit) মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগাসমূহ নির্মাণে অভিজাত শ্রেণী ও কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ আনুকুল্য ছিল। মুসলমান সাধুসন্ত ও বিদগ্ধজনেরা তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। ইহারা নানা জনকল্যাণমূলক কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। ইসলাম ধর্ম বিস্তারের সঙ্গে রাজ্যবিস্তার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শাসিত সংখ্যাগুরু অমুসলমান ধর্মান্তরিত হইলে মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিত। সুতরাং মুসলিম রাজ্যবিস্তারে ধর্মান্তকরণ একটি উৎকৃষ্ট উপায় ছিল। এইভাবে বঙ্গদেশে ইসলামের জোরদার প্রচার অতিব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব ধর্ম

বিভিন্ন কারণে বঙ্গদেশে যখন ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছিল সেই সময়ে ইহার প্রতিরোধকল্পে একটি বিরুদ্ধ শক্তির উদয় হয় যাহা কিছুকাল অন্তত কার্যকরী ছিল। নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁহার প্রচারিত ভক্তিধর্মের বন্ধনে বাঙালী এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হয়। চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব গুরুদের আবির্ভাব ও ধর্ম-প্রচার এবং বৃন্দাবনে ষড় গোস্বামীকৃত বিশেষ ধর্মতত্ত্বের বিকাশের ফলে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আবার প্রবলভাবে শুরু হয়। ইহার ফলে বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং আসামের হিন্দুসমাজের মধ্যে নবজাগরণ ও নবরূপায়ণ ঘটে। বিশেষত সত্যানুশীলন, সঙ্গীত-বিকাশ ও আধ্যাত্মক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্ম সবার উপরে মানুষ সত্য এই মানবিকতার জয়গান করিয়া সাধারণ নিম্ন দরিদ্র জনগণের মনেও নূতন মর্যাদাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ছাড়া এই ধর্ম উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সকল শ্রেণীর জনগণের নৈতিক উন্নতি বিধান করিয়াছিল। নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে চৈতন্যের অনুরাগীরা সমাজের নিম্নশ্রেণীর ও নিরক্ষর জনগণকে আত্মমর্যাদা ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য প্রেম ও ধর্মের মধ্য দিয়া জাগতিক অনেক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে পৃথক উড়িষ্যাকে তিনি বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূত্রে বিধৃত করিয়াছিলেন। এই প্রেমধর্মের মাধ্যমে তিনি দূর দূর দেশকে নিকটতর করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলে ইসলামের অগ্রগতি রোধ করিতে সমর্থ হয়। সুফী প্রচারকদের ঠিক বিপরীত আর একটি গ্রহণযোগ্য ধর্মমত প্রচারের ফলে তাহাদের প্রভাবও হ্রাস পাইতে থাকে। তাহারা মধ্যযুগে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। বৈষ্ণব ধর্মের দুর্বার গতিরোধ করিতে পারে এরূপ সুফীসন্তের সংখ্যা অধিক ছিল না। ফলে বহিরাগত সুফী, ও সন্ত ধর্ম-প্রচারকদের সংখ্যা ক্রমশ কমিতে থাকে। ইসলাম ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল তত্ত্বসমূহকে সাধারণ বাঙালী সমাজে বোধগম্য করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকদের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন ধর্মীয় বাধার সৃষ্টি হয় নাই। তাহা ছাড়া বৈষ্ণবদের আবেদন ছিল খুবই সহজ ও সরল।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বঙ্গদেশে আর একটি সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ফলে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর সমাজ শাসনে পূর্ববর্তী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ হিন্দু সমাজে একান্তভাবে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। নবপ্রচলিত ধর্মে বর্ণাশ্রম বিচার ছিল না। পূর্বে সমাজভ্রষ্ট, জাতিভ্রষ্ট এই সব নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসংঘে আশ্রয় লাভ করিত। বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় হইলে ইহারা নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে এই সমস্ত আশ্রয়হীন নরনারী বঙ্গদেশে 'নেড়ানেড়ি' নামে পরিচিত ছিল। বৈষ্ণব

আচার্যগণ এই সকল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণকে নবীন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং তাহার ফলে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি বঙ্গদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের 'কড়চায়' জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' কাব্যে চৈতন্যদেবের তীর্থযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে। চৈতন্য দেব নীলাচল যাইবার পথে দামোদর অতিক্রম না করিয়া কাশীনাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হন। সেখান হইতে হাজিপুর হইয়া তিনি মেদিনীপুরের নিকট উপস্থিত হন। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে গিয়া সেখানকার শিবদর্শন করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে জলেশ্বর গিয়া সেখানকার শিবও দর্শন করেন। চৈতন্যমঙ্গল পাঠে মনে হয় শ্রীচৈতন্য সিয়াখালা দিয়া তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে দাঁতন হইয়া জলেশ্বরের দিকে গমন করেন। কড়চায় লিখিত বিবরণের সহিত চৈতন্য মঙ্গলের বিবরণ মিলাইলে মনে হয় চৈতন্যদেব হাজিপুর হইয়াই তমলুক আসিয়াছিলেন এবং তমলুক হইতে পরে নারায়ণগড় ও দাঁতন হইয়া উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করেন। হাজিপুরের বর্তমান নাম ডায়মণ্ডহারবার।

পরম বৈষ্ণব কীর্তনিয়া ও পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তমলুকে বালচৈতন্যের মূর্তি স্থাপনকর্তা। পরবর্তীকালে তমলুকের রাণী হরিপ্রিয়া দেবী কর্তৃক নির্মিত বর্তমান মহাপ্রভু মন্দিরে ঐ বালমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বলা হয় মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হইলে বাসুদেব যখন অত্যন্ত শোকাকুল হন তখন বাৎসল্য ও স্নেহের বশবর্তী হইয়া তিনি ঐ স্থানে মহাপ্রভুর মূর্তি নির্মাণ করিয়া কিছুটা শোকের শান্তনা লাভ করেন। চৈতন্যদেবের ধর্মগত প্রাণ শিষ্যগণ হরিনামের যে ঢেউ তুলিয়া ছিলেন তাহা সমগ্র বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার প্রভাব মেদিনী-পুর জেলাতেও বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। এই জেলার বহুসংখ্যক পরিবার বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব আন্দোলন

অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী তাহার সম্প্রতি প্রকাশিত গভীর গবেষণামূলক গ্রন্থে 'Vaisnavism in Bengal'—1486-1900, মেদিনীপুর ওউড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার আন্দোলনে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার অনেকটাই জঙ্গলে আবৃত ছিল। সেই সময় মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা, ক্ষীরপাই, তমলুক ও হিজলী প্রভৃতি হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। পুরো জেলার অনেকটাই ছিল উড়িষ্যার মধ্যে। এই জেলার অধিবাসীদের

অনেকেই আদিবাসী। তাহাদের সহজ-সরল জীবনযাত্রা খুবই প্রশংসনীয় ছিল। এই জেলার স্থানীয় প্রধান ও ভুইঞাগণ বেশীর ভাগই বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন।

শ্যামানন্দ নামে একজন সদ্‌গোপ ছিলেন রসিক মুরারীর শিষ্য। তিনি বঙ্গদেশে এবং উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। শৈশবে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে তিনি নিত্যানন্দগোষ্ঠীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানেই তিনি অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন।

শ্যামানন্দ নরোত্তম দত্ত এবং শ্রীনিবাস আচার্যকে সঙ্গে করিয়া যখন প্রচুর বৈষ্ণব পুঁথিসহ বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়া ফিরিতেছিলেন তখন রাজা বীর হাম্বীরের অনুচরবর্গ কর্তৃক ঐ সকল পুঁথি লুণ্ঠিত হয়। শ্যামানন্দ খড়্গপুরের নিকটবর্তী তাহার জন্মস্থান ধারেন্দার কাছে নৃসিংহপুরে এক আস্তানা স্থাপন করেন। সুবর্ণরেখা ও দোলন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিপতি রাজা অচ্যুতের পুত্র রসিকমুরারী ছিলেন তাহার প্রথমদিকের প্রধান শিষ্য। আর দুইজনের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন দামোদর যোগী এবং পাঠান শাসক শের খাঁ। এই রসিকমুরারী শ্যামানন্দের বৈষ্ণব আন্দোলনকে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় প্রায় গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। মনে হয় পাঠান শের খাঁ-এর বৈষ্ণব ধর্মে অনুরক্তির ফলে রসিকমুরারী বা রসিকানন্দ মেদিনীপুরে বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব উৎসব পালন করিতে সক্ষম হন এবং তাহারই মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এই ধর্ম প্রচারে বিশেষ সুবিধা হয়। তিনি যে সমস্ত জায়গায় এই উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া ছিলেন তাহাদের মধ্যে বাদাকোলা, আলমগঞ্জ, নৈহাটী, নরসিংহপুর, গোপীবল্লভপুর, শ্যামসুন্দরপুর, গোবিন্দপুর, ধারেন্দা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলমগঞ্জে দ্বিতীয় বৈষ্ণব উৎসবটি স্থানীয় মুসলমান শাসকের অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গোপীবল্লভপুরে তিনি মহারাস যাত্রা বিপুল উৎসাহে পালন করেন। তাহাতে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের জীবিত শিষ্যদের আহ্বান জানানো হয়। এই উৎসবগুলির মাধ্যমে শ্যামানন্দ ও রসিকমুরারীর বহু ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেন। এই উৎসবের বিপুল অর্থ সম্ভবতঃ স্থানীয় ভূস্বামীগণ যোগান দিতেন।

শ্যামানন্দের এই অঞ্চলে বৈষ্ণব আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তোলা। তিনি ঘাটশীলার জমিদার, গোবিন্দপুরের জমিদার, জঙ্গলাকীর্ণ বগড়ী অঞ্চলের ভূস্বামী রাজ্যধারা রায় এবং উদন্দ রায় তাহা ছাড়া পূর্বে উল্লিখিত অচ্যুত ও শের খাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে

দিক্ষীত করিয়াছিলেন। রসিকমুরারী ময়ূরভঞ্জের শাসক বৈদ্যনাথভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা গজপতি, পাচেতের রাজা হরিনারায়ণ, ময়নার রাজা ভানুচন্দ্র, ধারেন্দার দুইজন অত্যাচারী ভূইঞা ভীম এবং শ্রীকর, উড়িষ্যার সুবাদার ইব্রাহিম বেগের ভ্রাতষ্পুত্র আহমক বেগকে বৈষ্ণব ধর্মে দিক্ষীত করেন। রসিকমুরারী বঙ্গদেশের সুবাদারকে ২০টি হস্তি উপহার দিয়াছিলেন। এই অসামান্য দানে সুবাদার খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই জেলার সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের ফলে এই দুইজন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকের স্থানীয় জনগণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে শক্তিশালী শ্যামানন্দ বৈষ্ণব আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে বড়কোলা, বড়গ্রাম, বসন্তপুর, বানপুর, ভঞ্জভূম, রায়গড়, ভোগরাই, চাকুলিয়া, ধারেন্দা, বাহাদুরপুর, ফতেপুর, গোপীবল্লভপুর, ঘাটশীলা, হরিহরপুর, হিজলী, ময়না, কেওনঝার, কাশীপুর, ঝাতিদা, মুক্তাপুর, কেশিয়ারী, নরসিংহপুর, শ্যামসুন্দরপুর রায়নি (Rayani), রঘুনাথবাটি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শ্যামানন্দের কয়েকজন শিষ্য বিভিন্ন অঞ্চলে খুবই প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ শিষ্য (ভজন অধিকারী) ফতেপুর গ্রামে বাস করিতেন। তিনি তাহার প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্ম বর্তমান কাঁথি ও কেশিয়ারীতে প্রচারিত ও প্রসারিত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে শ্যামানন্দের ৩১ জন শিষ্যের কথা উল্লেখ আছে। আর 'রসিক মঞ্জরী' গ্রন্থে রসিকমুরারীর ২০৩ জন শিষ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফলে তাহাদের ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে খুব কমই বাধা আসিয়াছিল।

শ্যামানন্দের বৈষ্ণব আন্দোলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল এই সময়ে মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলে নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর বৈষ্ণব ধর্ম বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। ইহাদের সহাবস্থান খুবই বিস্ময়কর। গড়বেতাতে পুরুষোত্তম দাসের একজন বংশধর কানুঠাকুরের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম এখানে খুবই প্রবল ছিল। এখানে রামদাস অভিরামের বৈষ্ণব ধর্ম ঘাটাল মহকুমায় বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্যামানন্দের মৃত্যুর পরে রসিকমুরারী এই বৈষ্ণব গোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা হন।

রসিক মঞ্জুরী সম্ভবতঃ বৈষ্ণব নেতাদের মধ্যে জনগণকে ধর্মান্তরিত করিবার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাহার এই বিপুল সংখ্যক ধর্মান্ত-

করণের কি পদ্ধতি ছিল সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন একজন শাসকের পুত্র। স্বভাবতই শাসক সম্প্রদায়ের সমর্থন ইহার সম্প্রসারণের অন্যতম একটি কারণ। শ্যামানন্দের বৈষ্ণব আন্দোলনে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ফল দেখা যায়। এত সংখ্যক লোক এই ধর্মে দিক্ষীত হইয়াছিল যে মেদিনীপুরে বৈষ্ণবগণ একটি অন্যতম গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছিল। অব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগুরু ও গোস্বামীগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণদের মত শক্তিশালী হইয়া নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন।

হাণ্টার লক্ষ্য করিয়াছেন যে মেদিনীপুর জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ভূমি ব্যবস্থার একটি সম্পর্ক আছে। তিনি তাহার 'A Statistical Account of Bengal' পুস্তকে এই জেলায় ২৭২টি বৈষ্ণবোত্তর জমির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই জমি স্থানীয় জমিদারগণ গুরু বা শিষ্যদের দান করিতেন, যাহা তাহারা বিনা কর প্রদানে ভোগ করিতে পারিতেন।

বৈষ্ণবদের প্রভাব বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণ ও মহাপ্রভূ চৈতন্যের উপাসনা বিভিন্ন স্থানীয় উপজাতির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ঝাড়গ্রামে সাঁওতাল ঝুমুর গানের মধ্যে ইহার অবিসংবাদিত প্রভাব দেখা যায়।

শ্যামানন্দ বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুর জেলায় একটি সহাবস্থানের উপযোগী সহনশীল মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেজন্য দেখা যায় বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মের লোকেরাও শান্তিতে বসবাস করিতেছে। ধর্মঠাকুরের অনুচরদের ঘাঁটাল ও তমলুক মহকুমার অসংখ্য অনুরাগী ছিল। ঠিক একইভাবে কর্ণগড়, মেদিনীপুর শহর ও চন্দ্রকোনায় শাক্তধর্মেরও প্রধান ঘাটি ছিল। বৈষ্ণব শাক্তদের মধ্যে সহজ মিলনের সুর রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন' কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই কাব্যে চৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং আরও কয়েকজন বৈষ্ণব গোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই অঞ্চলে বৈষ্ণব মরমী ও মুসলমান কবিদের মধ্যে একটা সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের বোধ লক্ষ্য করা যায়। শ্যামানন্দ ও রসিক মঞ্জরীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সংখ্যায় তাহার গুণগত উৎকর্ষে নয়। সেইজন্য তাহাদের শিষ্যদের সংখ্যা প্রচুর হইলেও গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির ন্যায় কোন পদকর্তা এই আন্দোলনের মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

এই দুইজন যেহেতু বিবাহিত ছিলেন তাই তাহারা গৃহীভক্তদের কথা বিশেষ-ভাবে বলিয়াছিলেন। সামন্ত প্রভুদের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ সম্ভবতঃ বৈষয়িক উদ্দেশ্য ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের বৈষ্ণব আন্দোলন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ও

সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতাকে দৃঢ় করিয়াছিল। রাজা এবং ভূস্বামীগণ সম্ভবতঃ তাহাদের দুইটি কারণে সমর্থন করিয়াছিল। প্রথমত বৈষ্ণব ধর্ম তাহাদের জাতিগত স্তরে উন্নীত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই ধর্মে অহিংসার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে নিম্নশ্রেণীর জনগণ খুবই কোমল স্বভাবের হইয়াছিল।

শ্যামানন্দের আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুর জেলায় বিশেষ কীর্তনগানের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল যাহা পরবর্তীকালে খুবই প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। এই ধর্মের ব্যাপক প্রসারের আর একটি ফল হইল এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষ্ণবোত্তর জমিতে বৈষ্ণব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। এই মন্দিরগুলি বঙ্গদেশে চিরাচরিত রীতিতে (শিখর, চালা, রত্ন প্রভৃতি) কোন ব্যতিক্রম আনয়ন করেনি। এই মন্দিরগুলিতে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের মত পোড়ামাটির অলঙ্করণ উল্লেখযোগ্য নহে। মেদিনীপুর জেলায় যে সমস্ত অঞ্চলে বৈষ্ণব মন্দিরগুলি দেখা যায় ডেভিস মেক্কাচনের হিসাব অনুসারে তাহার সংখ্যা ১০০টির অধিক। তাহার হিসাব মত বিভিন্ন থানায় মন্দিরের সংখ্যা এইরূপ—ভগবানপুর-৫, বিনপুর-১, চন্দ্রকোনা-১৫, কাঁথি-১, দাসপুর-২৬, দাঁতন-৩, ডেবরা-৮, ডিহিবল্লভপুর-১, এগরা-১১, ঘাটাল-১০, গড়বেতা-৬, গোপীবল্লভপুর-১, কেশপুর-৬, মহিষাদল-২, মেদিনীপুর শহর-১৪, ময়না-১, পটাশপুর-২ সবং-৩, পিংলা-৩, শালবনী-১।

অর্থাৎ এই সমস্ত তথ্য হইতে মেদিনীপুর জেলায় একসময় বৈষ্ণবধর্ম যে বেশ প্রবল একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ভাবধারার (বৈষ্ণব ও সুফী) প্রভাব ও প্রতিফলন

মুসলমান রাজশক্তির ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে বিজয়লাভের প্রধান কারণ হইল হিন্দুদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির অভাব। তুর্কীদের দ্বারা বৌদ্ধমঠ ও ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলি আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য লুণ্ঠন হইলেও এই আঘাত জনসাধারণের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অনেকেই মিথিলা, নেপাল, উড়িষ্যা, কামরূপ এমনকি তিব্বতে পলাইয়া গিয়াছিলেন। ধর্মঠাকুরের গাজনের শেষ অনুষ্ঠান 'ঘরভাঙ্গা' ছড়ায় এই সময়কার ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের নিকটস্থ উড়িষ্যার জাজপুরে এই দেউল-দেহারা ভাঙার কাহিনী ঈশ্বরের অমোঘ বিধান (মার) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।

চতুর্দশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী বংশের প্রতিষ্ঠা হইলে দেশের সৃজনীমূলক সাহিত্য রচনার দিকে প্রথম নজর পড়ে। ষোড়শ শতকের শেষ-

দিকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের বাস্তবচিত্র অঁাকিয়াছেন কবি-কঙ্কন মুকুন্দরাম তাহার 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। মধ্যযুগের পৌরাণিক বাংলা সাহিত্য প্রধানত রাজসভাশ্রিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' প্রধানত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত। বীরখান সনাতনের জন্য লিখিত ভাগবতের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুলতান হোসেন শাহের কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ছিলেন দবীর খাস সনাতন। সাকর মল্লিকরূপ (রূপ সনাতন), কেশব খান ছত্রী, রামচন্দ্র খান ও যশোরাজ খান প্রভৃতি বিখ্যাত। নসরৎ শাঁর পুত্র ফিরোজ শাহ শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখাইয়াছিলেন। নাসির-উদ্দিন-নসরত শাহের অনুগত ছিলেন 'কবিশেখর' দেবকীনন্দন সিংহ হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান এবং তাহার পুত্রও বাঙালী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহারা কেবল বৈষ্ণব ধর্মের নয় বাংলা সাহিত্যেরও বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের এমন কোন কবি ছিলেন না যিনি মল্লরাজবংশের প্রশংসা করেন নাই। মল্লরাজারা ও রাজ-অন্তঃপুরের মহিলারা অনেকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বঙ্গদেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুর্বলতার কোন স্থান ছিল না। হরিনাম কীর্তন নিষেধ করিয়া নবদ্বীপের কাজি যে আদেশ দিয়াছিলেন চৈতন্যদেব শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে সেই আদেশ কাজিকে তুলিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যারাজ দুর্গার বরপুত্র গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব ছিলেন একজন বড় যোদ্ধা। তিনি শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইয়া পড়েন এবং এই সময় উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্মের বন্যা বহিয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর অঞ্চল ব্রাহ্মণ্যে-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়।

বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশের শহরাঞ্চল হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে ইসলামের অগ্রগতি-রোধে শুধু সমর্থ হয় নাই, ইহার দ্বারা মধ্যযুগে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবরা অবহেলিত উপজাতিসমূহকে স্বধর্মে অনুরাগী করিয়া তোলে এবং ভাববিভোর নৃত্য ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের দ্বারা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটান। উপরন্তু রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগণ একটি নূতন প্রাণবন্ত

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এই বৈষ্ণব সাহিত্য মুসলমান সমাজকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মধ্যযুগে অন্তত ১২১ জন মুসলমান কবি এই বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল সুফী, সাধু, সন্তগণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী একই সময়ে তাহারা বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন। ভবিষ্যদ্‌বাণী, মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবন দান ও ঈপ্সিত ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিতেন। ইহারা অসহায়, গরীব ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করিতেন। খুব স্বাভাবিক কারণে সাধারণ লোকে ইহাদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনধারা ও কার্যাবলীর দ্বারা খুবই প্রভাবিত হইতেন। ইহারা ছিলেন সাধারণ লোকের শ্রদ্ধার পাত্র এবং অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পর তাহারা পীর বলিয়া পরিগণিত হইয়া তাহাদের সমাধিস্থল বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ও আন্দোলন

হিন্দু ঃ স্মৃতিগ্রন্থগুলি পাঠে মনে হয় বাঙালীর জীবনে বারমাসে পূজাপার্বন লাগিয়া থাকিত। বঙ্গদেশে মধ্যযুগে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সমাজে ব্রত অনুষ্ঠানের খুবই প্রচলন ছিল। এই ব্রত সংক্রান্ত আচরণের মধ্যে পুরাণের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে শূলপানি হইতে রঘুনন্দনের কাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলিতে তন্ত্রের প্রভাব খুবই দেখা যায়। বঙ্গদেশে পূজাপার্বনে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

হিন্দু সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব অধিক ছিল তাহারা হইল শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব। ইহা ছাড়াও গাণপত্য (গণেশ), সৌর, পাশুপত, পঞ্চরাত্র, কাপালিক, কৌলক প্রভৃতি আরও অনেক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। কোন কোন গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ঠ আচার-আচরণ ও স্বকীয় পূজাপার্বন প্রচলিত ছিল। শাক্তদের মধ্যে দেবী বা শক্তি পূজা প্রধান বলিয়া গণ্য হইত।

বঙ্গদেশে প্রচলিত কালিপূজার প্রবর্তন 'তন্ত্রসার' প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এই দেশে প্রচলিত কালিপূজার প্রচলন করিয়াছিলেন কৃষ্ণানন্দ নিজেই। বৃহদ্ধর্মপুরাণে কালিকে মঙ্গলচণ্ডিকা রূপেও অভিহিত করা হইয়াছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলচণ্ডী অবলম্বনে বহু আখ্যান ও কাব্য মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। হিন্দু ধর্মের উপর তান্ত্রিক প্রভাবের ফলেই দুর্গা এবং কালি বঙ্গদেশে এই দুই দেবীর পূজা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে।

পদ্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বৈষ্ণবগণের ধর্মকর্ম সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট রাধা কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। ভাগবত পুরাণে রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাকে কৃষ্ণের বিলাসকলার কেন্দ্রগত রসস্বরূপে বলা হইয়াছে।

মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু একই সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মে 'রাধাবাদ' জনপ্রিয় হওয়ায় ইহার মাধ্যমে পরবর্তীকালে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করিয়াছিল যাহা চৈতন্য যুগের বিশুদ্ধ এবং উচ্চমার্গের বৈষ্ণবধর্মকে অনেকখানি ক্লেদাক্ত করিয়াছিল।

বৈষ্ণব মতে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। নিরাসক্ত সেবার দ্বারাই শান্ত, দাস্য (দাস), সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসভাবে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। চৈতন্যদেব নাম সংকীর্তনকেই ঈশ্বরলাভের প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার শিষ্যদের মধ্যে রূপ সনাতন ও অন্যান্য গোস্বামীগণ বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বগত দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভক্তিকেই সর্বোচ্য সাধনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যের প্রেমধর্ম হিন্দু জনগণের সর্বশ্রেণীর মধ্যে ধর্মীয়ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল। তাহার প্রেম ও ভক্তিমূলক ধর্মপ্রচার হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল। শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জনগণ পর্যন্ত ইহাতে একাত্ম হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের আদর্শ ও প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

চৈতন্যদেবের মাধ্যমে বঙ্গদেশে ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারে যে মহৎ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল তাহা এক শতাব্দীর বেশী স্থায়ী হয় নাই। বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকগণ পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে তাহাদের প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা বৈষ্ণবদের সঙ্গে যোগদান করায় তাহাদের শক্তি প্রভূত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সহজিয়া প্রচলিত ধর্মমত সামাজিক এবং রীতিনীতিও অনুষ্ঠানের ধার ধারিত না। বিভিন্ন উপায়ে তাহারা মুক্তির সন্ধান করিত। ইহাদের ধর্মপ্রচারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়া প্রেম। আশ্চর্যের বিষয় এই পরকীয়া প্রেম সকীয়া প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাই বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সহজিয়া সম্প্রদায় কিশোরী ভজন প্রভৃতি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান বঙ্গ-দেশে প্রচলিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশুদ্ধ সাত্মিক প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈষ্ণব ধর্ম

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা কালক্রমে বীভৎস অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও ব্যভিচারগ্রস্ত সহজিয়া পন্থায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। তবে এই অশ্লীলতা সেযুগে সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

তান্ত্রিক সাধনপ্রণালী বহু প্রাচীন এবং সতন্ত্র ধর্মসাধনার দ্বারা ইহার প্রভাবে বঙ্গদেশে জৈন, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ছোট ছোট দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। তান্ত্রিক সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক আছে। এই তান্ত্রিকগোষ্ঠী বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধাচারী এবং কৌলাচারী প্রভৃতি নানা পর্যায়ে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কৌলাচারী শ্রেষ্ঠ। ইহাদের আচার-আচরণের মধ্যে অবর্ণনীয় অশ্লীলতা এবং বীভৎসতা আছে। যদিও তাহাদের সমর্থনে দার্শনিক তত্ত্বেরও উত্থাপন করা হইয়াছে।

সহজিয়া অনেক শাখায় বিভক্ত, যেমন—আউল-বাউল, সাই, দরবেশ, নেড়া, সহজিয়া প্রভৃতি। ইহা ছাড়া কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, সখীভাবক, কিশোরীভজনী, রামভল্লবী, যবনমোহিনী, গৌড়বাদী, সাহেবধনী, পাগলনাথী, গোবরাই প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় দেখা যায়। ইহাদের বিভিন্ন শাখায় সহজিয়া ধর্মমতের যথেষ্ট প্রভাব থাকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে। ঘোষপাড়া, রামকেলি, নদীয়া, শান্তিপুর, খড়দহ, কেন্দুলি, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে সহজিয়াদের বহু কেন্দ্র আছে। ইহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ হাতে লেখা। ভাষা—সান্ধ্য, সাংকেতিক এবং দুর্বোধ্য।

সহজিয়াদের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন বাউল সম্প্রদায়। ইহারা এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাদের গানের মধ্যে সহজিয়া মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বাউলরা অবশ্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রীতিনীতি প্রচলিত আছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। বাউলরা জাতি, গোষ্ঠী, তীর্থ, প্রতিমা, আচার-আচরণ কিছুই মানেন নাই। মানবত্বই তাহাদের সার। মানবের মধ্যে সর্ব বিশ্বচরাচর সেখানেই সাধনা। তাহাদের সাধারণ মূলতত্ত্ব হইল প্রেম। তাহাদের কাছে প্রেমের রসে ভরপুর গুরু একমাত্র কাম্য।

সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে মূলগত অনেক প্রভাব আছে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ রাধা ও কৃষ্ণ প্রেমের মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি করে। বাউলদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে পরমাত্মা আছে এবং তাহার সহিত যোগাযোগ করিতে পারিলেই পরমাত্মা বা ভগবানের উপলব্ধি করা যায়। এই 'মনের মানুষই' বাউলদের ভগবান। প্রেমের মধ্য দিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাই প্রত্যেক বাউলের

চরম ও পরম লক্ষ্য। অনেকে মনে করেন এই বাউলদের উপর সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছিল। অবশ্য সুফী মতের উপর উপনিষদ ও সহজিয়া মতবাদের প্রভাব অনেকেই স্বীকার করেন।

চৈতন্য ও বৌদ্ধ সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার দ্বারা অল্প ও বেশী পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ও অনেকটা সহজিয়া মতবাদের অনুরূপ। এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায় বঙ্গদেশে খুবই প্রভাবশালী হইয়াছিল। কায়াসাধন, হটযোগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া সাধন এবং মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করাই তাহাদের লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ এবং তাহাদের শিষ্যা রাণী ময়নাবতী ও তাহাদের পুত্র গোপীচন্দ্রের কাহিনী বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। শূন্য পুরাণ ও ধর্মবিধান নামক গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের পরিচয় ও পূজা অনুষ্ঠান বিবৃত আছে। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পূজাকে বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও ধর্মঠাকুরের পূজায় হিন্দুদেবদেবী তান্ত্রিক ধর্মমত এবং অনার্য আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমানঃ মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম কোরান ও হাদিসের অনুশাসন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য সকল জায়গার মত বঙ্গদেশে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে ও ধর্মাচরণে সাধারণভাবে একটি মূলগত ঐক্য দেখা যায়। প্রথম যুগে বঙ্গদেশে যে সব তুর্কী সৈন্য বসবাস শুরু করিয়াছিল তাহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে খুবই নিম্নস্তরের ছিল। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বাহির হইতে উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বঙ্গদেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিজ খান মধ্য এশিয়ার মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করিলে সেখান হইতে বহু গৃহহীন তুর্কী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাদের অনেককেই আবার অর্থ ও সম্মান দিয়া বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজকর্মচারী বঙ্গদেশে আসিয়া দীর্ঘদিন থাকিতেন। এইরূপে কালক্রমে বহু পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বঙ্গদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহারা বঙ্গদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সুফী দরবেশ নামে পরিচিত মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের কার্য স্মরণীয়। ইহারা ইসলাম ধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং

আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থফীরই বহু শিষ্য ছিল। তাঁহারা বঙ্গদেশের গ্রামে ও শহরে সর্বত্র প্রচুর দরগা প্রতিষ্ঠা করিয়া শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন।

অমুসলমানদের দীক্ষিত করা মুসলমানদের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য বিবেচিত হইত। স্থফীগণ এবিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন। ইহাদের প্রচেষ্টায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নব্য ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ সামান্যই ফার্সী জানিতেন। অধিকাংশ আবার আরবী বা ফার্সী কিছুই জানিতেন না। ইসলাম ধর্মের যে মূল পাঁচটি তত্ত্ব তাহার প্রথম চারটি যথা ইমাম (ঈশ্বর বা পয়গম্বরে বিশ্বাস), নমাজ, রোজা ও হজ (তীর্থদর্শন) বাঙালী মুসলমানরা যথারীতি পালন করিতেন। কিন্তু পঞ্চমটি জাকাৎ অর্থাৎ ব্যক্তিগত আয়ের কিছু অংশ গরীব দুঃখীকে দান করা। ইহা কতটা পালিত হইত সঠিকভাবে জানা যায় না।

খাঁটি ইসলামের অতিরিক্ত অনেকগুলি সংস্কার ও প্রথা বঙ্গদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। হিন্দুদের গুরুবাদ মুসলমান পীরের প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ক্রমশ পঞ্চপীর, সত্যপীর, মানিকপীর, ঘোড়াপীর, কুম্ভীর পীর, মাদারীপীর (মৎস বা কচ্ছপীর) প্রভৃতি নানা পূজায় রূপান্তরিত হয়। মোল্লা-নামে একটি নূতন যাজকশ্রেণীর আবির্ভাবও এই প্রভাবের ফলস্বরূপ। ইহারা হিন্দু পুরোহিতদের ন্যায় গ্রামবাসীর নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান ও বিবাহাদি ক্রিয়া করাইতেন। পীরের ন্যায় মোল্লা ও ইসলাম অনুমোদিত নয়। এইরূপে ধর্মযাজকগণ হিন্দুসমাজে পুরোহিতদের অনুকরণ।

শিক্ষা

হিন্দু ঃ মুসলমান বিজয়ের পর বঙ্গদেশে শিক্ষার প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম পূর্বযুগে বঙ্গদেশে হিন্দু জনগণের শিক্ষা সাধারণত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুদের অনেকপ্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের লোকেদের প্রবেশের অধিকার ছিল না। বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় জ্ঞানচর্চায় ব্রাহ্মণগণ একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন সমাজের সকল শ্রেণীর সাম্য ও সমানস্থযোগের অধিকার আছে বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন ব্রাহ্মণগণ তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সাধারণ হিন্দুরা অনেকরকম বন্ধন হইতে মুক্তি পায়। তখন তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। এইযুগে

তাই উচ্চ-নীচ সকলশ্রেণীর হিন্দুদের নিকট প্রাধিব আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগতির সমান সুযোগ আসে। অর্থাৎ হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা আসিতে থাকে। একজন কবির 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' কাব্য হইতে জানা যায় হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনগণ যথা হাড়ি, নাপিত এমনকি ঝাড়ুদারও শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু জ্ঞান এমনকি কেহ কেহ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জনও করিয়াছিল। নিম্নবর্ণের রমণীরাও যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য হইতে জানা যায় ব্যাধরমণী, ফুল্লরা, বিপুলা ও রাজুদেবীর হিন্দু-শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। এমনকি মালির স্ত্রীও হিসাব পত্র লিখিতে পারিত।

হিন্দু বালক-বালিকাদের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হইত এবং এই সব পাঠশালা সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের গৃহসংলগ্ন ছিল অথবা গুরুগৃহে কোন বৃক্ষ-তলে বসিত। কোন কোন ক্ষেত্রে মক্তব বা পাঠশালা একই চালার নীচে দুই-বেলা বসিত। ধনীরা এইসব পাঠশালায় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেন।

হিন্দু বালিকারাও পাঠশালায় অধ্যয়ন করিত। প্রাথমিক পর্যায়ে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মনে হয় মধ্যযুগে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে শিক্ষিতা নারী লীলাবতী ও লহনার মধ্যে বিশেষ শিক্ষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি চণ্ডীদাসের রামিধোপানী বাংলায় পদাবলী রচনা করিতেন। চৈতন্যের শিষ্যা মাধবী সুশিক্ষিতা এবং কবি ছিলেন। কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী একজন সভাকবি ছিলেন। বিদুষী ও গুণবতী খনার, জ্যোতির্বিদ্যার উক্তিসমূহ বাংলার গৃহে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়িকা বিদ্যা অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। সাধারণত দুই বৎসরের বেশী প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হইত। কবি কীর্ত্তিবাস ১১ বৎসর বয়সে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণ করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য অন্যত্র গমন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু বালকগণ সাধারণত টোলে প্রবেশ করিতেন। এই সমস্ত টোল ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণ ছাত্রদেরই টোলে শিক্ষাদান করা হইত। অবশ্য ধনী বণিকগণও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের সন্তানদের এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। কোন কোন টোলে বাংলা এবং ফার্সী শেখানো হইত। ছয় শাস্ত্র, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ছন্দ, নিরুক্ত ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন টোলের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোথাও কোথাও ইতিহাস অনুশীলনও ইহার অন্তর্গত ছিল।

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল। ইহাদের মধ্যে নবদ্বীপ ছিল সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় সাত-

গাঁও ছিল সংস্কৃত শিক্ষার অন্য একটি কেন্দ্র। হিন্দুদের অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে সিলেট, চট্টগ্রাম ও বিষ্ণুপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদের বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, ইহাদের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জ্যোতিষশাস্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

মুসলমান ঃ বঙ্গদেশে মুসলমানগণ তাহাদের প্রথমযুগের মুসলমানদের শিক্ষার আদর্শ অনুসরণ করেন। সেইযুগের মুসলমান শাসনকর্তাগণ, রাজকর্মচারী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। উলেমা, সুফী দরবেশগণ বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে বিভিন্ন শহরেও প্রধান প্রধান স্থানে বহুসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় গড়িয়া ওঠে। শাসনকর্তাগণ ও বিদ্বানব্যক্তিগণ তাহাদের নিজেদের গৃহে মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যয় ও পরিচালনার ভারগ্রহণ করিতেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে সুফী পণ্ডিতদের খানকাগুলিও ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়। মসজিদগুলিকে কেন্দ্র করিয়াও বহু মাদ্রাসা গড়িয়া ওঠে।

সুফীদের কয়েকটি খানকা আবার উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। মধ্যযুগে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল লক্ষ্মণাবতী, মহিশূল, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, পাণ্ডুয়া এবং বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগোর এবং হুগলী জেলার মান্দারন। বঙ্গদেশে মধ্যযুগে মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। শিক্ষা তখন অন্যতম ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজকর্মচারী জায়গীরদারগণ, ইজারাদার, শাসক, সৈনিক এমনকি অন্যান্য সম্পদের অধিকারী মুসলমানরা মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে ছেলে-মেয়েদের বিদ্যাভ্যাসে পাঠাইতেন। এই সমস্ত মক্তবে ব্যয়ভার হয় রাষ্ট্র নয় স্থানীয় অবস্থাপন্ন ধনী-ব্যক্তিরা বহন করিত।

মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা শুরু হইত মক্তবে। এই মক্তব প্রতিটি মসজিদের এবং এমনকি কোথাও কোথাও ধনীব্যক্তিদের গৃহ-প্রাঙ্গনে অবস্থিত ছিল। মুকুন্দরামের কাব্য হইতে জানা যায় হিন্দু এলাকায় ক্ষুদ্র মুসলমান পাড়ায় ও তাহাদের সন্তানদের জন্য মক্তব ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় 'মক্তব'কে বাংলায় পাঠশালাও বলা হইত। মুসলমান কবিদের বর্ণনা হইতে মনে হয় এই প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। সাধারণত পাঁচ বৎসর বয়স হইতে মুসলমান বালক-বালিকারা শিক্ষা শুরু করিত। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে মসজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য মসজিদের ইমামরাই ছিলেন শিক্ষক। তাহারা ছাত্রদের কোরান পাঠ ও ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে শিক্ষা

দিতেন। ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। শিশুরা মক্তবে ধর্মবিশ্বাস, কোরান হইতে কিছু কিছু মুখস্থ, এবং সঙ্গে হাদিস ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে আরবী, ফার্সী ও বাংলা তিনটি ভাষা শিখিতে হইত। ছাত্ররা মক্তবে গদ্য-পদ্য লিখিতে ও পড়িতে শিখিত এবং স্রষ্টার প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখিতে ও মুখস্থ করিতে হইত। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল এই সমস্ত মক্তবে অনেক হিন্দু পরিবারের ছাত্ররা (বিশেষতঃ কায়স্থ) মৌলবীদের নিকট ফার্সী ভাষা শিক্ষা-গ্রহণ করিত। বিশেষত সরকারী চাকুরী প্রার্থিদের নিকট ইহা ছিল একান্ত আবশ্যক।

মাদ্রাসাসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষাদান করা হইত। সরকার ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদার হস্তে সাহায্য করিতেন। মাধ্যমিক স্তরে কোরান, হাদিস ধর্মতত্ব, আইনশাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামীয় বিষয় শিক্ষাদান করা হইত। ইহা ছাড়া লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান যেমন যুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ণ, জ্যোতিবশাস্ত্র এবং জ্যামিতিও পড়ানো হইত।

মুসলমান বালিকাদের ধর্মের মূলনীতি, কোরানপাঠ ও ধর্মের ক্রিয়াকর্ম আচরণ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসলমান বালিকারা বালকদের সহিত একইসঙ্গে মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিত। সমাজে পর্দাপ্রথার প্রচলন চালু থাকার ফলে মহিলাদের উচ্চশিক্ষা খুবই সীমিত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার পর মেয়েদের শিক্ষা প্রধানত উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল।

শিক্ষকরা সমাজে সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষকগণ গ্রামে সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। পিতামাতারা তাহাদের সন্তানদের গুরু বা মৌলবী-দের নিকট পড়িতে দিয়া তাহাদের শিক্ষাসম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিতেন। শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করিয়া সাধারণত ছাত্ররা বালি ও ধুলার উপর লেখা অভ্যাস করিত। ইহার পর তাহারা মেঝেতে খড়িমাটি দিয়া লেখার চেষ্টা করিতেন। পূর্ববর্তী পর্যায়ে ছাত্রদের তালপাতা, কলাপাতা বা ভোজ্যপত্রের উপর লেখা অভ্যাস করিতে হইত। খড়, নলখাগড়া, বাঁশের কঞ্চি এবং বিভিন্ন পাখির পালককে লেখনী হিসাবে ব্যবহার করা হইত। ছাত্ররা ভূমিতে অথবা বাড়ি হইতে আনা আসনে বসিত। মধ্যযুগের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে কাগজের ব্যবহার

চালু হয়। কিন্তু তাহার প্রচলন খুব একটা বেশী হয় নাই। ছাত্ররা নিজেদের কালি নিজেরা তৈয়ারী করিত। হরিতকি ও দেশীয় প্রদীপের শিখা হইতে এই কালি প্রস্তুত করা হইত। ইহা অনেক সময় অবিশাস্যভাবে দীর্ঘস্থায়ী হইত।

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে শিক্ষা সম্পর্কে যে সাধারণ চিত্র পাওয়া গেল তাহারই অনুসরণ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেও হইয়াছিল ইহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী যে কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া গেল তাহা হইতে এই অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

সাহিত্য

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে বেশ কয়েকটি বিভাগ দেখা যায়, যেমন (১) স্মৃতিশাস্ত্র, (২) নব্যন্যায়, (৩) তন্ত্র, (৪) কাব্য, (৫) পুরাণ, (৬) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ধর্মতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব, (৭) অলঙ্কার, (৮) ব্যাকরণ, (৯) অভিধান ও (১০) বিবিধ। মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গদেশের কীর্তি তিনটি—স্মৃতি, নব্যন্যায় এবং তন্ত্র। বঙ্গদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ স্মার্ত-পণ্ডিত হইলেন রঘুনন্দন। স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিনটি—আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার।

বঙ্গদেশের নব্যন্যায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণী। প্রাক্ শিরোমণী যুগে বিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌম এই শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে তিনি উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাহার পুত্র জলেশ্বরে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের সম্ভবতঃ শেষদিকে জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণী। তাহার শাস্ত্রীয় টীকাসমূহ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শিরোমণী উত্তরযুগে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভার তেমন বিকাশ দৃষ্ট হয় না।

পঞ্চদশ শতকে কাশীধামে বাঙলী নৈয়ায়িকগণ নব্যন্যায় চর্চার সূচনা করেন। ইহাদিগকে প্রধানত তিনটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা যায়—যথা প্রগল্‌ভ সম্প্রদায়, শিরোমণী সম্প্রদায় ও চূড়ামণী সম্প্রদায়। কোন কোন পণ্ডিতদের মতে বঙ্গদেশেই প্রথম তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। ইহা অবশ্য তর্কের বিষয়। তবে ইহা যে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুতন্ত্র প্রধানত, শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অথবা তাহার কিঞ্চিত পরবর্তী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ছিলেন এই শাস্ত্রের যুগন্ধর ব্যক্তি। তাহার সঙ্কলিত "তন্ত্রসার গ্রন্থে" সকল সম্প্রদায়ের সারই লিপিবদ্ধ আছে।

বঙ্গদেশে তুর্কী আক্রমণের পর প্রায় দুইশত বৎসর কোন সৃজনধর্মী কাব্য-গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বঙ্গদেশে পুনরায় কাব্যরচনার প্রচেষ্টার প্রয়াস দেখা গিয়াছিল। এই সমস্ত কাব্যকে অনেকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, (১) বৈষ্ণব কাব্য, (২) ঐতিহাসিক কাব্য, (৩) স্তবস্তোত্র, (৪) কবিতা সংগ্রহ, (৫) বেদকাব্য ও (৬) গদ্যকাব্য বা চম্পূকাব্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দ লীলামৃত' বৈষ্ণব কাব্যগুলির মধ্যে বৃহত্তম। চৈতন্যের সমকালীন মুরারী গুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত' বা 'চৈতন্যচরিতামৃত' মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে অধিক পরিচিত। কবিকর্ণপুর রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতাররূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে নায়ক করা হইয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইলেও তাহাদের গুরুত্ব তেমন বিশেষ কিছু নাই।

প্রাচীন হিন্দু দর্শনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বৈষ্ণব দর্শনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনেক। প্রাচীন ষড় দর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা চার। যেমন, প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান এবং শব্দ। বৈষ্ণব দর্শনে একমাত্র 'শব্দ প্রমাণই' স্বীকৃত।

এইভাবে বঙ্গের মণীষা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে নিজেকে বহুভাবে ব্যপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্য ঃ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনরূপে চর্চাগীতিকে এখন নিশ্চিতভাবে ধরা হয়। এই চর্চাগীতির রচনা দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে হইয়াছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বাংলায় রচিত না হইলেও বাংলা সাহিত্যের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। ইহার পরবর্তী প্রায় ২৫০ বৎসর বাঙালীর সাহিত্য সৃষ্টির তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার কারণ সম্পর্কে অনেকে অনুমান করেন তুর্কী আক্রমণের আকস্মিকতা ও ফলাফলে বাঙালী অনেকটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালী কবিদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যেমন—জয়দেব, চণ্ডীদাস এবং কৃত্তিবাস। বিদ্যাপতি বাঙালী নহেন। তিনি মৈথিলী কবি এবং তাহার জনপ্রিয়তা একসময় মিথিলা অপেক্ষা বঙ্গদেশে বেশী ছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। তিনি শুধু কবি ছিলেন না বিভিন্ন শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি কবি হিসাবে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন। প্রেমের মধুর ও সুকুমার রূপ তাহার পদাবলীতে শিল্পমাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময় পরলোকগমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ ও অনন্য সাধারণ কবি। সাম্প্রতিককালে তাহাকে লইয়া জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন কারণে অনেকে মনে করেন মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে কবি চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন। এই সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা এখনও বোধ হয় নিশ্চিতভাবে করা সম্ভব নয়। চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার ভাবের গভীরতা অতলস্পর্শী।

কৃত্তিবাস সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার রামায়ণকে বাংলায় জাতীয়কাব্য বলা চলে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যটিতে শ্রীমৎ ভগবতের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত সরল ও সুপাঠ্য রচনা। তিনি শুধু কবি ছিলেন না ভক্তও ছিলেন। তাহার কাব্যের মধ্যে বঙ্গদেশে চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে বৈষ্ণবভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব এই কাব্যের প্রতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগে এই কয়েকজন কবিই (মালাধর বসু, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও কৃত্তিবাস) বিশেষ স্মরণযোগ্য।

এই বিখ্যাত তিনজন কবির (মালধর বসু, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস) সহিত আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে একজন হইলেন 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রাচীনতর রচয়িতা বিজয় গুপ্ত। একই বিষয় লইয়া বিপ্রদাস পিপ্‌লাইও কাব্য রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। যিনি সুলতান হোসেন শাহের আমলে চট্টগ্রামের সেনানায়ক পরাগল খানের সভাকবি ছিলেন। তিনি পরাগল খানের পুত্র নসরৎ খানের অনুরোধে মহাভারতের যুদ্ধপর্ব প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন।

চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রবর্তিত বৃন্দাবনে গোস্বামীগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম অচিরে বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করে। ইহার ফলে নিশ্চিতভাবে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে। বৈষ্ণবভক্তদের মধ্যে যাহারা কবি ছিলেন তাহারা কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে অসংখ্য গান ও পদরচনা করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে সৃষ্ট পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে গৌরবের সামিল। ইহাদের মধ্যে মানব জীবনের প্রেম, বেদনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি গভীর আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শিল্প সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

চৈতন্যদেবের জীবনচরিত অবলম্বনে অনেকগুলি বৃহৎ ও সুন্দর গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহা সাহিত্যে এক নূতন দিগন্তের উদ্‌ঘাটন করিয়াছিল। ইহার

মধ্যে দেবদেবী নহে মানুষের বাস্তব জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এইভাবে ইহা বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন শাখাকে উন্মোচিত করিয়াছে। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃত ছিল খুবই বিখ্যাত। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মকে এক নূতন রূপদান করেন। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্ত স্যাধনের মুখ্য অঙ্গ রাধাকৃষ্ণলীলা শ্রবনকীর্তন, স্মরণ ও বন্দন। ইহা নানা গানের মধ্য দিয়া ভক্ত কবিগণ সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। ইহারই ফলে বাংলাভাষায় বিশেষ সমৃদ্ধ পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। অর্থাৎ ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নবসৃষ্টির জোয়ার আসিয়াছিল।

পদাবলী সাহিত্য ঃ বিষয়বস্তুর রসের দিক হইতে পদাবলী সাহিত্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের বৈচিত্র্যে অপরিসীম। ইহার অনেক পদ ব্রজবুলী নামে পরিচিত এক মিশ্র সাহিত্যিক ভাষায় রচিত। পদাবলী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কবির নাম বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, বলরামদাস প্রভৃতি। গোবিন্দদাসের অন্যতম গুণগ্রাহী ছিলেন উড়িষ্যা রাজার সেনাপতি রায়চন্দ্র।

চৈতন্যদেবের জীবনচরিতকে অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় যে নূতন শাখা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা হইল জীবনচরিত সাহিত্য। বঙ্গের বৈষ্ণবসাহিত্য আর একটি গৌণ শাখা নিবন্ধ সাহিত্য।

মঙ্গল কাব্য ঃ মঙ্গল কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মঙ্গল কাব্য বলিতে দেবদেবীর আখ্যান কাব্য বোঝায়। নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুরা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর স্মরণাপন্ন হইতেন। এইভাবে তাহাদের জনপ্রিয়তা বাড়িতে থাকে। তখন কবিরা তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মঙ্গল কাব্য রচনা করিতে থাকেন। মঙ্গল কাব্যে তিনটি বিশিষ্ট শ্রেণী ব্যতিত (মনসা-মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল) শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যে কতকগুলি বিষয়ের অবতারণ করা হইত যেমন, দেবদেবীর বর্ণনা, শাপভ্রষ্ট দেবদেবীর নায়ক-নায়িকারূপে জন্মগ্রহণ, নারীদের পতিনিন্দা, রমণীদের গর্ভের, খাদ্যের, বিবাহের, পাঁচুলির এবং ইহা ছাড়া বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা বা বারমাস্যা। মঙ্গলকাব্যের গানগুলি এক মঙ্গলবার রাত হইতে আরম্ভ হইয়া পরের মঙ্গলবার রাত্রে শেষ হইত। ইহাকে অষ্টমঙ্গলা বলা হয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সহিত অমিত বলশালী যোদ্ধা লাউসেনের যুদ্ধ বিজয়ের ঘটনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে। অনেকের মতে লাউসেন পাল রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং লাউসেন কাল্পনিক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অবশ্য "বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্তের" লেখক মনে করেন এই কাহিনী কাল্পনিক নহে। তাহার মতে মেদিনীপুর জেলার ময়না দুর্গটি লাউ-সেন বা ধর্মগড় হিসাবে সুপরিচিত। মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্ম মঙ্গল' কাব্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ময়নাগড়ের রঙ্কিনী নামে কালি ও লোকেশ্বর শিব এবং বৃন্দাবনচকের সন্নিকটবর্তী ধর্মঠাকুর লাউসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ময়নাগড় ধর্মরাজ পূজার প্রধান পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত। তবে লাউসেন আদৌ কোন ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক চরিত্র কি না তাহার সপক্ষে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য নাই।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে যে জীবন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্মৃতিশাস্ত্রের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। চৈতন্য ভাগবতকার লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে প্রকৃত বৈষ্ণববাদ একেবারে লোপ পাইয়াছে। তখন ধর্মের নামে যাহা প্রচলিত ছিল তাহা নয় তান্ত্রিক সাধনা অথবা লৌকিক দেবদেবীর পূজা। চৈতন্য ভাগবত, মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাসুলী প্রভৃতি অলৌকিক দেবীগণের পূজা এইযুগের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল দেবীমাহাত্মের বর্ণনাও পূজা প্রচলনের জন্য একশ্রেণীর মঙ্গলকাব্য প্রচলিত আছে যাহা পাঁচালি গায়করা ব্যবহার করিত। মঙ্গলকাব্য বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পদ। ইহা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নাই। বঙ্গদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে খ্যাত, অখ্যাত, অল্পখ্যাত যেসব দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে অথবা যেসব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে স্বীকৃত পান নাই মঙ্গলকাব্যের প্রধান উপজীব্য তাহারাই। মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, কালিকা, বাসুলি, ষষ্ঠি, কমলা, বরদা, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য রচনা করিয়া কয়েকজন কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য প্রধানতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত (১) মনসামঙ্গল, (২) চণ্ডীমঙ্গল ও (৩) ধর্মমঙ্গল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী বর্তমান বর্ধমান জেলায় দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একসময়ে এখানকার ডিহিদারদের অত্যাচারে দেশত্যাগ করিয়া বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় আড়চা গ্রামে উপনিত হন। সেখানে ব্রহ্মভূমির রাজা বাঁকুড়া রায় কবিকে আশ্রয় দেন এবং নিজ পুত্রকে পড়াইবার

কাজে তাহাকে নিযুক্ত করেন। তাহার আত্মজীবনী হইতে জানা যায় মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের শাসনকর্তা ছিলেন (১৫৯৪-১৬০৬), তখন তিনি জীবিত ছিলেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে যে মানবিক রস ও বাস্তবচিত্র আছে তাহার তুলনা বিরল। তাহার কাব্যে সেযুগের একটি নিখুঁত বাঙালী জীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। খুব স্বাভাবিক কারণে তাহার লেখনীতে তাহার কর্মস্থল মেদিনীপুর জেলার সমসাময়িক চিত্রটিও অনেকটা পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। পশ্চিমবঙ্গে দেবী মনসার প্রচলন কিছু কিছু থাকিলেও এই অঞ্চলের 'মনসামঙ্গল' কাব্য তেমন সাহিত্য গুণান্বিত নহে।

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যে সমস্ত আখ্যান কাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলির নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল'। তাহাও বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত। অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্টতম 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা হইলেন কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী। ইনি বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা গোপালচন্দ্রের (১৭১২-১৭৪৮) সভাকবি ছিলেন। ইনি রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

সহজিয়া সাহিত্য ঃ সহজিয়া সাধকরা বাহ্যত বৈষ্ণব হইলেও ইহাদের দার্শনিক মত ও সাধন পদ্ধতি সবই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তুলনায় স্বতন্ত্র। ইহারা বিশ্বাস করিতেন তত্ত্ব ও দর্শন সব কিছুই মানুষের দেহে আছে। ইহারা পরকীয়া প্রেমচর্চা বাস্তব জীবনে করিতেন। কারণ তাহারা বিশ্বাস করিতেন ইহার মধ্য দিয়া সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। সহজিয়াদেরও একটি নূতন সাহিত্য ছিল যাহা পদাবলী ও নিবন্ধ এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু উৎকৃষ্ট রচনা থাকিলেও অধিকাংশ অকিঞ্চিৎকর রচনা। বাংলা ভাষায় সাহিত্যে আর একটি দিকও স্মরণীয় তাহা হইল অনুবাদ-সাহিত্য। মধ্যযুগে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। কিছু ফার্সী ও হিন্দী বইও অনুবাদ করা হইয়াছে। এই অনুবাদকের মধ্যে কাশীরাম দাসের নাম আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ষোড়শ শতকে রচিত মহাভারতের মধ্যে উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দু-রাজা মুকুন্দদেবের বাঙালী কবি দ্বিজ রঘুনাথ রচিত 'অশ্বমেধ' কাব্য উল্লেখ-যোগ্য। রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় ভাগবতও বাংলায় রচিত ইহয়াছিল। তবে তাহা সংখ্যায় অল্প।

নাথ সাহিত্য ঃ বঙ্গের নাথ সম্প্রদায় ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব এবং তাহাদের আদিগুরুদের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র। নাথদের আদিগুরু বা আদি সিদ্ধাচার্য মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, খারিপা ও তাহার শিষ্য কানুপা। ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক

ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। তবে তাহাদের সম্পর্কে যে সব অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা আদৌ সত্য নয় বলিয়া বিশ্বাস। বঙ্গের নাথ সাহিত্যের কাহিনী মোটামুটি দুইটি। গোরক্ষনাথ, মীননাথের কাহিনী এবং হারিপা, মীননাথ ও গোপীচন্দ্রের কাহিনী। প্রথম কাহিনী লইয়া একটি মাত্র কাব্য রচিত হইয়াছে যাহার নাম 'গোরক্ষ বিজয়'। এই কাব্যে বহু কবির ভূমিকা থাকিলেও ইহার রচয়িতা ফয়জুল্লা বলিয়া সকলে মনে করেন। 'ময়নামতি' কাহিনীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতা দুর্লভ মল্লিক।

মুসলমান সাহিত্যঃ মধ্যযুগে বঙ্গে কৃষ্টি সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সাহিত্যে দেখা যায়। মুসলমান বিজয়ে বঙ্গদেশে যে সহজ সাধনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল তাহা মুসলমান সাধক কবিদের মাধ্যমে চতুর্দশ ও ষোড়শ শতকে সুফী সাধনার সহিত মিশ্রিত হয়। হিন্দু কবিরা মুখ্যত দেবমাহাত্ম্য ও কাহিনী লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। অপরদিকে মুসলমান কবিগণ প্রচলিত রোমান্টিক কাহিনী ও কাব্যধারা রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্গদেশে হিন্দী ও ফার্সী রোমান্টিক কাব্যের সার্থক দুইজন শিল্পী হইলেন আরাকানরাজ সভাকবি দৌলত হাজি ও আলাউল। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকরা ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক কাব্য প্রথম প্রবর্তন করেন। সৈয়দ সুলতানের শিষ্য মহম্মদ খান 'মুক্তল হোসেন' নামে একটি কাব্যে কারবালার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার রচনারীতি অত্যন্ত পরিশুদ্ধ। তিনি সংস্কৃত ভাষা খুব ভাল জানিতেন। তাহার পরিচয় এই কাব্যে খুব বেশী পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি আলাউল পদ্মাবতী কাব্য ছাড়াও 'রাগনামা' নামে একটি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়কগ্রন্থ রচনা করেন। তবে ইহার মধ্যে তিনি তেমন দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। কিছু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কয়েকজন মুসলমান কবি হিন্দী রোমান্টিক কাব্য ও ফার্সী অনুবাদ অনুসরণ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ফার্সী রোমান্টিক কাব্যগুলি বেশীর ভাগই 'লায়লা মজনু' ও 'ইউসুফ জোলে খা' অবলম্বনে রচিত হয়।

সংস্কৃত 'হরিবংশ' ও মহাভারতের অনুসরণে অনেক মুসলমান কবি 'নবিবংশ', 'রসুল বিজয়' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের কবি হায়াত মামুদই শ্রেষ্ঠ। ইহার 'মহরম পর্ব' নামক কাব্যে কারবালার কাহিনীর সহিত মহাভারতের মিল দেখানোর চেষ্টা হইয়াছে। তাহার 'চিত্তউত্থান' কাব্য হিতোপদেশের ফার্সী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত।

পীর অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন গুরু ধর্মযুদ্ধের বীর গাজীদের লইয়া

অনেক মুসলমান কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। অনেক মুসলমান কবি হিন্দু কবিদের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এমনকি অনেকে চৈতন্যদেবের রূপ ও মহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন।

গাথা ঃ বঙ্গের মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রণয় গাথার অনেক রচনা দেখা যায়। ইহা ছাড়া কেহ কেহ আবার সাধনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বহু শতাব্দী পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাহার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হইল সত্য-নারায়ণ বা সত্যপীরের উপাসনা যাহা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রে কে কাহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলা খুব মুশকিল। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ আসলে একই উপন্যাসের দুইটি রূপ। ইহার উপাসনা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত। সত্যনারায়ণের পাঁচালি ও ব্রতকথা পূজার সময় পঠিত হইত। ইহার কাহিনী দুইটি। একটি ধর্মমঙ্গলে ধর্ম-ঠাকুরের আবির্ভাবের মত, আর একটি চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির মত। এই পাঁচালি রচয়িতাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হইল—ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রভৃতি।

সত্যপীরের পাঁচালি অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণ হরিদাস, শঙ্কর, কবিকর্ণ, নায়েক ময়াজ গাজী, ফয়জুল্লা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পীর পাঁচালিতে বৌদ্ধধর্ম ঠাকুর, মুসলমান পীর ও হিন্দুনারায়ণ সংমিশ্রন দেখা যায় সপ্তদশ শতকে। সত্যনারায়ণের পাঁচালি বা সত্যপীরের পুস্তক প্রভৃতির মধ্য দিয়া দীর্ঘদিন বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিছু কিছু উপাস্য দেবতা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন হিন্দুর বনদুর্গা, ঠাকুর গোরাচাঁদ, কালুরায় (কুমিরেদেবতা) ও সিদ্ধমৎসেন্দ্রনাথ। মুসলমানদের নিকট বনবিবি, পীর গোরাচাঁদ, কালুসাহ ও মোছরাপীররূপে পরিণত হইয়াছে।

মধ্যযুগে মুর্শিদা ও বাউল সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। বাউল সঙ্গীতগুলি প্রকাশের সারল্য, সতস্ফূর্ততা ও আধ্যাত্মিক গভীরতায় পরিপূর্ণ।

ঐতিহাসিক কাব্য ঃ যদিও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নয় তথাপি মধ্যযুগে সাহিত্যে অন্যতম বিশেষ অবদান ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’ ও ‘পূর্ববঙ্গগীতিকা’ কাহিনীগুলি। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্ররায় গুণাকর ও ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ‘শিবায়ন’ কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

ইনি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ধাঁটালের অধিবাসী। কর্ণগড়ের রাজা রাম-সিংহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার পুত্র যশোবন্ত সিংহের রাজত্বকালে এই কাব্য রচনা করেন। ইহা অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে রচনা। ইহা অত্যন্ত সুখপাঠ্য এবং ভাষা অত্যন্ত সরল। এই কাব্যের মধ্যে সেই যুগের একটি নিখুঁত চিত্রের প্রতিফলন দেখা যায়।

"মহারাষ্ট্র পুরাণ" গ্রন্থটির লেখকের নাম গঙ্গারাম ভট্টাচার্য। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে পশ্চিমবঙ্গে বর্গীর আক্রমণের বীভৎস কাহিনীর লেখক প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাহার গ্রন্থে জীবন্ত ও উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্গীর আক্রমণ এবং লুণ্ঠন, নবাব আলীবর্দির যুদ্ধ অভিযান, চক্রান্ত ও ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যু প্রভৃতি অনেক কিছুই তাহার বর্ণনায় পাওয়া যায়।

এতক্ষণ মধ্যযুগের সমৃদ্ধ সাহিত্য মূলত অধিকাংশ পদ্য-সাহিত্য আলোচিত হইল। তাহা হইলেও বঙ্গদেশে ষোড়শ শতকের পর হইতে কিছু কিছু গদ্য-প্রবন্ধ রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশ অবশ্য চিঠি-পত্রে ছিল। পর্তুগীজ মিশনারীদের দ্বারা ধর্মান্তরিত বাঙালী হিন্দু দোম এ্যান্টনিওর (Dom Antonio) গ্রন্থ ব্রাহ্মণ ক্যাথলিক সংবাদ ও মন-এল-দা-আসামসোম (Manoel-Da-Assumpcom) নামক একজন পর্তুগীজ পাদ্রী কৃপার শাস্ত্রে 'অষ্টবেদ' নামক গদ্য রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত উদাহরণে প্রমাণিত হয় যে সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা গদ্য ভাষা একটি সরল সাহিত্যে রসলাভ করিয়াছিল। যদিও তখনও পর্যন্ত দেশের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরা কাব্যরচনায় বেশী উৎসাহী ছিলেন।

মধ্যযুগে বঙ্গদেশের সাহিত্যের যে মোটামুটি চিত্র পাওয়া গেল একথা মনে করিতে কোন বাধা নাই যে সমাজে সাহিত্যের একই চিত্রই অনেকাংশে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কবি মুকুন্দরাম, গঙ্গারাম ভট্টাচার্য, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতির কাব্যে যে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের চিত্র আমরা পাই অন্য অঞ্চলের কবিদের বর্ণনার মধ্যেও সমাজ জীবনের সাধারণ ধারা যে প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যুক্তি সঙ্গত।

ধর্ম ও শিল্প

হিন্দু : হিন্দু ও মুসলমান উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের শিল্প ধর্মভাবের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানদের মস্‌জিদ ও সমাধিভবন তাহাদের শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। হিন্দু-শিল্প সুষমা মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্তি ও ছবির মধ্য দিয়া

প্রকাশলাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম যুগে কোন কোন হিন্দু প্রসিদ্ধ তীর্থ বা মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ তৈয়ারী করার উদাহরণ পাওয়া যায়। এই নীতি অনুসরণের জন্য বঙ্গদেশে অতি অল্পসংখ্যক মধ্যযুগের মন্দির এখন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য মধ্যযুগের শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করার মত যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা একটু কষ্টসাধ্য। মধ্যযুগে খুববেশী উৎকৃষ্ট মন্দির তৈয়ারী হয় নাই। যে কয়েকটি তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা নানা প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংস হইয়াছিল।

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে মন্দির ছিল প্রধানতঃ ইষ্টক নির্মিত এবং এই মন্দিরগুলি সাধারণতঃ দুইটি স্থাপত্য রীতিতে নিমিত। একটি হইল রেখ-দেউল এবং অন্যটি হইল কুটির দেউল।

উড়িষ্যার সুপরিচিত মন্দিরগুলির ন্যায় সূর্য বা বাঁকা শিখরী রেখ-দেউলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কালক্রমে উড়িষ্যার রেখ-দেউল ক্ষুদ্রতর অলঙ্কার বর্জিত হইয়া অনেকটা সরল ও আড়ম্বরহীন স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত হইত। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে এই শ্রেণীর পাঁচটি মন্দির বিখ্যাত।

মধ্যযুগে বঙ্গের মন্দিরগুলি গঠনে নিজস্ব যে স্থাপত্য রীতি ছিল তাহা চির-পরিচিত কুটির বা কুড়েঘরের অর্থাৎ দোচালা, চৌচালা ঘরের গঠন প্রণালী অনুকরণে নির্মিত হইত। এইজন্য ইহাদের কুটির দেউল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাও ইষ্টক নির্মিত। এই মন্দিরগুলি দোচালা, জোড়বাংলা, চৌচালা, ডবল চৌচালা, রত্নমন্দির প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

মেদিনীপুর জেলার পার্বত্য অঞ্চলে যথা, ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, গড়বেতা খড়্গপুর, চন্দ্রকোনা, শালবনি, জামগড়, কেশিয়াড়ী প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরগুলি মাকড়া (Laterite) ও বেলে প্রস্তরে নির্মিত হইত। এই জেলার অন্যান্য স্থানে চুন, সুরকি ও ইঁটের তৈয়ারী মন্দিরই ছিল প্রধান। এই সমস্ত মন্দিরগুলির অভ্যন্তর-ভাগে একটিমাত্র গৃহ থাকিত যাহাকে বলা হইত গর্ভগৃহ। ইহারই একধারে একটি বেদির উপর মন্দিরের দেবী বা দেবতা অধিষ্ঠান করিত।

রেখ-দেউলের নিদর্শন এই জেলার বিভিন্ন অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। দাসপুর, ঘাঁটাল, পাশকুড়া প্রভৃতি এলাকার অধিকাংশ শিবমন্দির এবং রাধাকৃষ্ণের বা মদনগোপাল বা রাধাগোবিন্দের মন্দির এই রীতিতে নির্মিত।

পীড়াদেউল এই রীতি ও উড়িষ্যার প্রভাবে মেদিনীপুর জেলার মন্দির শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সাধারণত বেশীরভাগ শিবমন্দির, গড়বেতার সর্বমঙ্গলার মন্দির ও কর্ণগড়ের মন্দির এই রীতিতে নির্মিত। রত্ন

হইতে ইহা অনেকটা বৃহৎ ঘন্টার ন্যায় দৃশ্যমান। উড়িষ্যার প্রভাব মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির মন্দির স্থাপত্যরীতিতে বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। ইহার আর একটি নিদর্শন মন্দির সংলগ্ন অঙ্গন (ভোগশালা, নাটমন্দির প্রভৃতি)। এই মণ্ডপগুলি অনেক সময় আকর্ষণীয় যেমন কানাশোলের ঝাড়েশ্বরের মন্দির এবং তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের ভোগমণ্ডপগুলি শিল্প সুষমামণ্ডিত। এই জেলায় রাস মঞ্চ, দোল মঞ্চ, ঝুলন মঞ্চ ও তুলসী মঞ্চ প্রভৃতি কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলায় রাধাকৃষ্ণের মন্দিরগুলি বিশেষভাবে পোড়া-মাটির মূর্তির (Terracotta Art) দ্বারা অলঙ্কৃত। ইহা ছাড়া মন্দির গাত্রে নানাধরণের ভঙ্গিতে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া পশুপক্ষির মূর্তি-গুলিও এই সমস্ত মন্দিরগুলিতে অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীর দেবদেবীর পূজা করিতেন। তাহাদের কতকগুলি স্থায়ী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আবার কতকগুলি বা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অস্থায়ী মণ্ডপ তৈয়ারী করিয়া পূজা হইত। মন্দিরে স্থাপিত দেবতাদের প্রত্যহ পূজা হইত।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে দেবদেবীদের মোটামুটি দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হইল সারা বঙ্গদেশে জনপ্রিয় দেবদেবীরা এবং অন্যশ্রেণী হইল স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীরা। জনপ্রিয় দেবদেবীর মধ্যে তিনটি শ্রেণীগত ভাগ দেখা যায়। যেমন, শীতলা, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি। ইহারা গ্রামবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতাদের ধনী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত-ভাবে অথবা পরিবারগত মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যথা লক্ষ্মী-জনার্দন প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীর দেবতাদের মধ্যে ছিল শিব, কালি প্রভৃতি যাহা কোথাও যৌথভাবে আবার কোথাও ব্যক্তিগতভাবে পূজিত হইতেন।

এই জেলার পুরুষ দেবতাদের মধ্যে শিবের সংখ্যাই অধিক। তিনি ঋগ্বেদের যুগে প্রধান স্থান অধিকার না করিলেও পরে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। শিবকে নানা আকারে পূজা করা হয়, পশুপতি, নটরাজ, রুদ্র প্রভৃতি। এমনকি শিব-লিঙ্গ পূজারও প্রচলন হইয়াছে। পুরুষ দেবতাদের মধ্যে পরবর্তীকালে উদ্ভব হইল রাধাকৃষ্ণ। ইহাদের কখনও আলাদাভাবে পূজা করা হয় নাই, তাহার পরই হইলেন বিষ্ণু। এই জেলায় ইহার সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। অন্যান্য পুরুষ দেবতাদের উল্লেখযোগ্য হইলেন গণেশ, কার্তিকেয়, জগন্নাথ। জগন্নাথদেবের মধ্যে উড়িষ্যার প্রভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান। মেদিনীপুর, ঘাঁটাল, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে উড়িষ্যার রীতিতে নির্মিত অনেক জগন্নাথ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

মাতৃকা দেবীর মধ্যে এই জেলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী হইলেন শীতলা। তাহাকে বসন্তের দেবী (Pox) বলা হয়। অনেক সময় তিনি চণ্ডী নামেও খ্যাত। অবশ্য মেদিনীপুর জেলাতে চণ্ডী এবং শীতলা পূজার মধ্যে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। মেদিনীপুর শহরে বড়বাজার এই জেলার সবচেয়ে প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে। মাতৃকা দেবীর মধ্যে দ্বিতীয় হইলেন কালি, তৃতীয় হইলেন দুর্গা, চতুর্থ হইলেন মনসা, পঞ্চম হইলেন লক্ষ্মী এবং ষষ্ঠ হইলেন রামসীতা।

জেলার সর্বত্রই মন্দিরের ভিতরে এবং বাহিরে কালিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাকে শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। এই জেলায় কয়েকটি কালিমন্দির আছে। দুর্গাকে উমা, পার্বতী, দশভূজা প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। দুর্গাপূজা খুবই জনপ্রিয় উৎসব। সাধারণত স্থায়ী মন্দিরের বাহিরে তাহার পূজা করা হয়। এই জেলায় খুব সামান্য কয়েকটি দুর্গামন্দির আছে। মনসা পূজার জন্য আলাদা মন্দিরের সংখ্যা এই জেলায় খুব সামান্যই দেখিতে পাওয়া যায়। মনসা পূজার প্রচলন নিম্নবর্ণের লোকদের এবং অনার্যদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয় মনে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মনসা এবং শীতলা সমঅর্থে ধরা হইয়াছে। ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর পূজা অনেক ঘরে ঘরে নিত্য সাধিত হয়। আলাদা কোন মন্দির খুব কম দেখা যায়। কিন্তু এই জেলায় রামসীতার পূজা খুবই প্রচলন আছে। কোন সময় রঘুনাথ, কখনও বা জানকীনাথ অথবা জানকীবল্লভ নামে ইহার পরিচয়। মেদিনীপুর শহরে মীর বাজারে হনুমানের একটি মন্দির আছে। ঠিক এই ধরণের আর কোন মন্দির এই জেলায় দেখা যায় নাই।

লৌকিক দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইলেন ধর্মঠাকুর। যদিও এই দেবতার জনপ্রিয়তা এখানে খুব বেশী নয় তবুও খুব ছোট দুই-একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল কাঁথির নিকটবর্তী দেবী কপালকুণ্ডলা। এই কপালকুণ্ডলা মন্দিরের দেবীকে অনেকে কালির সহিত অভিন্ন মনে করেন। ইহা ছাড়া সুবর্ণরেখা নদীর তীরে ধলভূম রাজাদের পূজিত আর একটি লৌকিক দেবী হইলেন রুক্মিণী। গড়বেতা ও কেশিয়াড়ী এই জেলার দুইটি স্থানের বিখ্যাত লৌকিক দেবী হইলেন সর্বমঙ্গলা। গড়বেতা মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল এই মন্দিরটি উত্তরমুখী। আর একটি বিখ্যাত লৌকিক দেবী হইলেন ঝাড়গ্রাম রাজাদের পূজিত সাবিত্রী দেবী ঝাড়গ্রামের মল্লরাণী কর্তৃক একান্ত পূজিত এই দেবী বর্গীর আক্রমণের হাত হইতে তাহাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে দীর্ঘদিন পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন। আর একটি লৌকিক দেবী হইলেন এই জেলার সদর সাবডিভিশানের উত্তরে

অবস্থিত সনাকা মন্দির। কাহিনী অনুসারে তিনি গড়বেতার সর্বমঙ্গলা দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী। তাহাকে নিম্নশ্রেণীরা (মাঝের শ্রেণী)(প্রধানত পূজা করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া তমলুকের বর্গভীমা হইল এই জেলার আর একটি লৌকিক দেবী। ইনি শক্তিরূপিণী দেবী কালিকার ন্যায় চারিহাত বিশিষ্ট এবং শিবের বুকে দণ্ডায়মান। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালীতে উড়িষ্যারীতি প্রতিফলিত। এই মন্দিরটি সম্ভবতঃ একাদশ শতকে তৈয়ারী হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই জেলায় বহু স্থানীয় লৌকিক দেবতাদের নাম পাওয়া যায়। যেমন, ঝাড়গ্রামে কনকদুর্গা, সতী, রাজবল্লভ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মহাপ্রভুর মন্দিরের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জেলায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কয়েকশত মন্দিরকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে মোটা-মুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন প্রথমটি হইল প্রশস্ত বিশাল মান্দর। যাহা সাধারণত রাজা এবং অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিরা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রকোনার লালজিউ-এর এবং কাজলাগড়ের গোপালজিউ-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উভয় মন্দির বর্ধমানের রাজা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এগরার শিবমন্দির কোন উড়িষ্যার যুবরাজ তৈয়ারী করিয়াছিলেন কথিত আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলি অধিকাংশই হয় স্থানীয় রাজারা অথবা নিজস্ব এলাকায় লোকেরা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। রামগড়, কর্ণগড়, মহিষাদল, ময়না তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরগুলি স্থানীয় রাজারা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির-গুলি ছিল অল্পধনী ও ছোট জমিদারদের তৈয়ারী, ফলে ইহারা পূর্বে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর মন্দিরের আকৃতি বা প্রকৃতির সহিত পাল্লা দিতে পারিত না। অর্থাৎ তাহাদের জাঁকজমক ছিল অপেক্ষাকৃত কম। সবচেয়ে অধিক সংখ্যক মন্দির ছিল চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত যাহা সাধারণ গ্রামবাসীরা স্বল্পসঞ্চয়ের মাধ্যমে যৌথ প্রচেষ্টায় তৈয়ারী করিত। খুব স্বাভাবিক কারণে এইগুলি ছিল সাদাসিধে।

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে পার্বনের প্রচলন দেখা যায়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীরা হইলেন আদিবাসী। সাঁওতালদের মধ্যে 'সোহরায়' সবচেয়ে বড় এবং ইহাকে শষ্য উৎসবের আনন্দময় পরিসমাপ্তির উৎসব বলা চলে। পৌষমাসে ধানকাটার পর এই উৎসব পালিত হয়, বঙ্গদেশে অন্যান্য অঞ্চলে পৌষ পার্বনের মত। পৌষ সংক্রান্তিতে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে 'টুসু' উৎসবও খুব জনপ্রিয়। কয়েকদিন আগে হইতে ইহার সূচনা হয়। মানভূম হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে 'টুসু' উৎসবের সমারোহ বেশী।

ঝাড়গ্রামে এই রকম নানাপ্রকার পার্বনে অনুষ্ঠান দেখা যায়। উৎসবের গানগুলি গ্রাম্য কৃষকরা মুখে মুখে রচনা করেন। ইহাদের রচিত গানগুলি সাধারণত বিজয়া দশমীর দিন কাঠি নৃত্যের সাহায্যে গীত হত।

'ইন্দ্রধ্বজ' ঝাড়গ্রামের আর একটি বিশেষ উৎসব। ধ্বজ উৎসব বহু প্রাচীন-কালের। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। ছত্র হইল তাহার রাজকীয় প্রতীক। শাল-গাছকে সাজাইয়া ইন্দ্রধ্বজ তৈয়ারী করা হয়। এই উৎসব অনেকটা বিজয় উৎসবের ন্যায় পালিত হয়। সারেঙ্গাগড় গ্রামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বংগা ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে প্রতিবছর ৩রা মাঘ সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা বসে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া কথিত। এই জেলার দেওয়ানগঞ্জের নিকট একটি নবরত্নের মন্দির এবং চন্দ্রকোনার লালজিউ-এর মন্দির স্থাপত্য-কীতির একটি অন্যতম নিদর্শন। ইহার নির্মাণকাল ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মুসলমান ঃ মুসলমান শাসকদের নির্মিত মসজিদ ও সমাধি ভবনগুলি মধ্যযুগে বঙ্গদেশে স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, এগুলি ইষ্টক নির্মিত। ইহা ছাড়া ইঁটের বাড়ির ছাদ এবং বঙ্গদেশের চিরাচরিত দোচালা, চৌচালা খড়ের চালের অনুকরণে বাঁকাইয়া তৈয়ারী হইত। ফলে এই বাড়ির চারিকোণে চারটি স্তম্ভ (Tower) নির্মাণ করিতে হইত। ইহা ছাড়া দেওয়ালের গঠনের অংশবিশেষ সম্মুখে বর্ধিত করিয়া বা পেছনে গুটাইয়া বৈচিত্র সৃষ্টি করা হইত। দেওয়ালের গায়ে নানা লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্‌শা খোদাই করা হইত। ইসলামী স্থাপত্যরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল নূতন ধরণের খিলান নির্মাণ। ইহার নাম ছিল প্রকৃত খিলান বা True Arch। একইভাবে বড় বড় গম্বুজ (Dome) তৈয়ারী হইত। এই খিলান, গম্বুজ ঐসলামিক স্থাপত্যরীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়া ভিতরে ও বাহিরে মিনাকরা কাঁচের ন্যায় মসৃণ টাইল ও ইঁটের ব্যবহারের দ্বারা এইগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হইত। মুসলমান বা ঐসলামিক স্থাপত্যরীতির সবচেয়ে বেশী নিদর্শন পাওয়া যায় অতীত বঙ্গের রাজধানী গৌড় এবং আদিনাতে।

মোগল আমলে শিল্পকলার উৎকর্ষ প্রধানত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলিতে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন সুবাদারগণ। এখান হইতে অর্থ কেন্দ্রে পাঠাইবার দিকে তাহাদের অধিক নজর থাকিত। ফলে এই যুগে শিল্পকলা তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই। তথাপি কিছু কিছু মস্‌জিদ, সমাধি-ভবন, স্তম্ভ ও তোরণ এযুগে নির্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত নিদর্শন খুব একটা উচ্চশ্রেণীর নহে। মোগলযুগে স্থাপত্যরীতিতে সুলতানী আমলের ধারা প্রায়

অব্যাহত ছিল। একটিমাত্র পার্থক্য হইল ইঁট, পাথর বা পোড়ামাটির ফলকে প্রকৃত ভাস্কর্যের পরিবর্তে চুণের আবরণ দ্বারা দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করা হইত।

মধ্যযুগে সুলতানদের প্রাসাদ ও ধনীদের সুরম্য অট্টালিকার কোন নিদর্শনই বর্তমানে নাই। মেদিনীপুর শহরের মধ্যে একটি অসমাপ্ত মস্‌জিদ আছে। প্রবাদ অনুসারে যুবরাজ সাহজাহান দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার পথে একদিন মেদিনীপুরে আসেন। তখন তিনি একদিনের মধ্যে ঈদের নমাজের জন্য এই মস্‌জিদটি নির্মাণ করেন। এই প্রবাদ কতটা সত্যি তাহা বলা মুশ্‌কিল। তবে মন্দিরটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণগড়ের নিকটবর্তী কসবা গ্রামে একটি প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। ইহা ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ শাহসুজা বঙ্গদেশে সুবেদার থাকার সময় নির্মিত হয়। এই মস্‌জিদের উপর তিনটি গম্বুজ আছে। তাহার একটি বর্তমানে ভগ্নদশায় উপনীত।

মেদিনীপুর শহরের মধ্যস্থিত মস্‌জিদ ও পীরস্থানগুলির মধ্যে সিপাহী বাজারে সাধল, নরমপুরে ইদ্‌গা, মিঞাবাজারে দেওয়ান সৈয়দ রাজ্জি বা চন্দনসাহিদের মস্‌জিদে ও মহাপাতপুরের ইয়াদগা সাহেবের মস্‌জিদ প্রসিদ্ধ। চন্দন সাহিদ, ইয়াদ্‌গার শাহ ও পীর পলওয়ান হিন্দু-মুসলমানদের সমান শ্রদ্ধার পাত্র। উত্তর বিলগ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে নাসির খাঁ পীর উরস্ উপলক্ষে তাহার সমাধি সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে। কাঁথির নিকট দারুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উপলক্ষে একটি মেলা বসে। উৎসবটি অতিপ্রাচীন।

সূত্র নির্দেশ

১। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ২৪২-২৪৯, ৩৭৩-৩৯৭, ৪১৯-৪৪৯, ৪৬৪-৪৭৭।

২। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১ম খণ্ড), এম. এ. রহিম, (ঢাকা একাডেমি, ১৯৮২), পৃঃ ৮১-১৭৪, ১৮৬-২৩২, ২৪৭-২৬৮, ৩৬১-৩৭০, দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ৩১৪-৩৬৮।

৩। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, জগদীশ নারায়ণ সরকার, ১৩৮৮, পৃঃ ৮-১৩, ৩২খ-৩৮।

৪। বাংলার সাধক বাউল, ইন্দিরা দেবী, ১৩৬৯, পৃঃ ১০৬-১১৫।

৫। বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত, সুরেন্দ্রনাথ জানা, ১৩৭১, পৃঃ ২১-২২।

৬। বাঙ্গলার ইতিহাস (২য় খণ্ড), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১, পৃঃ ২২৭-২৪৭।

৭। মেদিনীপুরের ইতিহাস, যোগেশচন্দ্র বসু, ১৩৪৬, পৃঃ ১৩২-১৩৩।

৮। তমলুকের ইতিহাস, ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, ১৯৭২, পৃঃ ১১২-১১৩।

৯। বঙ্গদেশের ইতিহাস (প্রথম পর্ব, মধ্যযুগ), সুশীলা মণ্ডল, ১৯৬৩, পৃঃ পরিশিষ্ট খ৩০-৪৫।

১০। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন, (বিশ্বভারতী, ১৯৬২), পৃঃ ১-২৩।

১১। বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), আবদুল করিম, ১৯৭৭, পৃঃ ৫২৫-৫৭২।

১২। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা (৩য় খণ্ড), অশোক মিত্র (সম্পাদক), ১৯৭১, পৃঃ ২৭৫, ৩৭৮-৪৭৩।

১৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খণ্ড), বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৪১-৫৪, ৮৯-১০৮।

১৪। History of Medieval Bengal, R. C. Mazumdar, (1974), Pp. 271-305.

১৫। Bengal under Akbar and Jahangir, T. K. Roychowdhury, (1953), Pp. 80-148.

১৬। Husain Sahi Bengal, M. R. Tarafdar, (1965), Pp. 238-283.

১৭। History of Bengal (Mughal Period), A. C. Roy, Pp. 464-466.

১৮। Obscure Religious Cults, Sasibhusan Dasgupta, (1976), Pp. 167-179.

১৯। Vaishnavism in Bengal—1486-1900, Ramakanta Chakrabarti, Sanskrit Pustak Bhandar, 1985, Pp. 244-256.

২০। Islam in Bengal, J. N. Sarkar, (1972), Pp. 21-26.

২১। Historical Studies in the Cult of Goddess Manasa, (1966), P. K. Maity, Pp. 256-257.
The Goddess Barghvima, P. K. Maity, (1971), Pp. 11-18.

২২। Late Mediaeval Temples of Bengal, David J. Mccutchion, (1972), Pp. 17-80.

২৩। Temples of Midnapore, G. Santra, (1980), Pp. 24-40.

সপ্তম অধ্যায়

বিদেশীদের আগমন

পর্তুগীজ ঃ মোগলযুগে বঙ্গদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিবর্তনে একটি অন্যতম ঘটনা হইল বিভিন্ন বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর কার্যাবলী। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারিটি বিদেশী বণিকগোষ্ঠী যথা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীগণ বঙ্গদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আগমন করিয়াছিল। এই বিদেশী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অবশ্য প্রথমে পর্তুগীজ এবং পরে ইংরেজরা বঙ্গদেশে অতি গুরুত্ব-পূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রপাত করিয়াছিল।

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা প্রথম উড়িষ্যা উপকূলে পিপ্‌লি নামক স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে মেদিনীপুর জেলার হিজলী বন্দরে তাহাদের আগমন ঘটিয়াছিল। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ প্রথম চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া আরাকান রাজদরবারে উপস্থিত হইবার জন্য। সেই সময় তাহাদের দলনেতার উদ্দেশ্য ছিল ঐ অঞ্চলে কুঠি স্থাপন করা ও প্রতি বৎসর সম্ভব হইলে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করা। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আর একদল পর্তুগীজ অনুচর সাতগাঁওয়ে ব্যবসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক তারপরের বৎসর বঙ্গদেশের ইতিহাসে পর্তুগীজদের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ঐ বৎসর সম্রাট মহম্মদ শাহ পর্তুগীজদের চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে কুঠি নির্মাণে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই সময়ে হুগলীর নিকটবর্তী একটি অখ্যাত গ্রামে পর্তুগীজদের সুবা বাংলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বন্দরটিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য হাজির হইত এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রত্যেকেরই বৃহৎ বৃহৎ গোলা তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৫৭৯-১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা হুগলীতে আকবরের হুকুমনামা পাইয়া এখানকার ঘাঁটি সুদৃঢ় করিয়াছিল। এই কেন্দ্রটিতে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বঙ্গদেশে পর্তুগীজদের যাবতীয় প্রভাব এখানে এক সময় সংহত হয়। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত র‍্যালফ ফিচ্ (Fetch) হুগলীকে পর্তুগীজ বন্দর হিসাবে দেখিয়া-ছিলেন। ক্যাবরাল (Cabral) হুগলী বন্দরকে ভারত এবং আন্তঃ-এশিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'আইন-ই-আকবরীতে' সাতগাঁওকে পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল হিসাবে দেখানো হইয়াছে।

বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজদের বহু কুঠি বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার হিজলী ছাড়া ঢাকা, যশোহর, বরিশাল এবং নোয়াখালি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি গড়িয়া উঠিয়া-

ছিল। পরবর্তীকালে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যখন চট্টগ্রাম পর্তুগীজদের অধিকারে আসিল তখন ইহাই তাহাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিল। চট্টগ্রামের নিকটবর্তী দিয়াঙ্গা (Dianga) পর্তুগীজদের আর একটি শক্তিশালী বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ সেনানায়ক কারভেলো (Carvalho) সন্দীপ দ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করিয়া এখানে প্রায় স্বাধীনরাজ্য গড়িয়া তুলিয়া-ছিলেন। যদিও ইহার অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

ষোড়শ শতকের শেষদিকে বঙ্গদেশে পর্তুগীজ আধিপত্য চরম শিখরে পৌছাইয়া ছিল। ঐ সময় বঙ্গদেশের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য মুসলমানদের হাত হইতে পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া গিয়াছিল। হুগলী ও চট্টগ্রামে তাহারা প্রায় স্বাধীনভাবে কার্যাবলী চালনা করিতেন। তাহারা দেশীয় পর্তুগীজ সরকারের প্রতি এবং সেই সরকারের সিংহলীয় প্রতিনিধিদের প্রতি কেবলমাত্র মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিতেন। ইহারা একটি বিশেষ ধরনের স্বাধীন জীবন ও জীবিকায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা জলদস্যুতার দ্বারা অর্থ আহরণ করিত। তাহাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি। এই আক্রমণ চালাইতে গিয়া কোন কোন সময় তাহারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে ক্রীতদাস ব্যবসায় ছিলেন তাহারা পটু। দুর্ধর্ষ এই জলদস্যুদের আক্রমণে জনসাধারণের ধনপ্রাণ একেবারেই নিরাপদ ছিল না। বঙ্গ-দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকেরা সর্বদাই আতঙ্কে দিনযাপন করিতেন।

রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরাও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে দলে দলে আগমন করেন। তাহারা হিজলী, বাক্সা, হুগলী, ব্যাণ্ডেল, শ্রীপুর, চণ্ডিকান, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূর দূর অঞ্চলে গীর্জা স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগকে ধর্মান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন। স্থানীয় শাসকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদের এই ধর্মান্তরকরণ কাজে কোন বাধা প্রদান করেন নাই।

এরপর পর্তুগীজ বাণিজ্যের বিপর্যয়ের দিন আসে। সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে যখন বঙ্গদেশে পর্তুগীজ বাণিজ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন সমগ্র এশিয়াতে তাহাদের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির অবক্ষয় শুরু হইয়াছিল। ভারত মহাসাগরে প্রথম ওলন্দাজ এবং পরে পরে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের আগমন সূচিত হয়। এই সময় বঙ্গদেশে রাজনৈতিক বিপর্যয়ে পর্তুগীজদের ভাগ্য বিড়ম্বনা আনিয়াছিল। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজা তাহাদের দিয়াঙ্গ (Dienga) কুঠির উপর হামলা করিয়া বহুলোককে হত্যা করিয়াছিল। চণ্ডীকানির রাজা বিশ্বাস-

ঘাতকতা করিয়া কারভেলোকে হত্যা করে ও খ্রীষ্টানদের শাস্তি দিতে শুরু করিয়াছিল। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মগরাজাদের আক্রমণে সন্দীপের স্বল্পস্থায়ী স্বাধীন রাজা গঞ্জালেসের রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সাহজাহানের নির্দেশে মোগল সৈন্যবাহিনী পর্তুগীজদের হুগলী কুঠি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে। একইভাবে বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশও শায়েস্তা খানের শাসনকালে পর্তুগীজ জলদস্যু, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানা দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবশ্য তাহাদের এইসব (দস্যুতা ও ধর্মান্তকরণ) কার্যাবলী বহুদিন পর্যন্ত ইহাতে তেমন ব্যাহত হয় নাই। তবে জলপথে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক আধিপত্যের গৌরবময় দিনের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল সত্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে তাহারা সমর্থ ছিল না।

১৫৭৫-১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশের অর্থনীতিতে পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভূত প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক বৎসর গঙ্গা হইতে পর্তুগীজ বাণিজ্যতরী যাত্রা শুরু করিত। এই সমস্ত জাহাজগুলিতে কাপড়, চাল, লাক্ষা, চিনি প্রভৃতি নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হইত। ইহাদের গন্তব্যস্থল ছিল মূলত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। হুগলী বন্দরের পত্তনের পর এই ব্যবসাধারার বিরাট পরিবর্তন আসে। এইবার পর্তুগীজ বণিকেরা স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা প্রচুর গুদাম তৈয়ারী করিয়াছিল। প্রধানত দক্ষিণ অঞ্চল হইতে এই সামগ্রী সংগ্রহ করা হইত। শ্বেতচন্দন, পর্শেলিন, শয্যাদ্রব্য, টেবিল, চেয়ার, বাক্স এমনকি মুক্তা পর্যন্ত এখানে জমা হইত। মালদ্বীপ হইতে কড়ি, টিনেভ্যালি উপকূল হইতে শাঁক, সিংহল হইতে দারুচিনি প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইত। এই সমস্ত দ্রব্য যাহারা আহরণ করিত তাহারা হইলেন দেশীয় সওদাগর। তাহাদের নিকট হইতে পর্তুগীজগণ উত্তর ভারত ও এশিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রেরণের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করিত। অর্থাৎ বঙ্গদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্পূর্ণটাই ছিল পর্তুগীজ নিয়ন্ত্রণাধীন। ভারতীয় বণিকেরা সেখানে সহকারীর ভূমিকা পালন করিত।

সূতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, চিনি, ঘি, চাল, তুঁত, মোম, লাক্ষা ও বিভিন্ন শয্যাদ্রব্য প্রভৃতি পর্তুগীজদের খুব প্রিয় ছিল। পরে পর্তুগীজ জাহাজগুলি সুমাত্রা, মালাক্কা হইতে প্রতি বৎসর হিজলীতে আসিয়া চাল, তুলা, মাখন প্রভৃতি সংগ্রহ করিত। অর্থাৎ পর্তুগীজরা বঙ্গদেশের বাণিজ্যের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমুদ্রবাহী আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের উপর তাহাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল।

এই কর্তৃত্ব তাহারা হিজলী প্রভৃতি প্রধান বন্দরের মাধ্যমে করিত। অর্থাৎ তাহাদের কর্তৃত্ব ছিল একচেটিয়া। এই একচেটিয়া কর্তৃত্ব রাখিবার উদ্দেশ্যে ভারত মহাসাগরে আগত অন্যান্য বিদেশী বাণিজ্য তরীগুলির উপর তাহারা হামলা চালাইত। শিহাবুদ্দীন তালিশের ফার্সী বিবরণে দেখা যায় (১৬৬৫) তমলুকে পর্তুগীজদের একটি সমৃদ্ধ ক্রীতদাসের বাজার ছিল। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় হিজলী বন্দরে ওলন্দাজদের পাশাপাশি পর্তুগীজ বাসকেন্দ্র ও গীর্জা ছিল। এখানে চাল এবং অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় হইত। এই বর্ণনায় তমলুক ও বানজিয়া। (Banzia) দুইটি জায়গার পর্তুগীজদের বাণিজ্য ও গীর্জা ছিল বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সেই যুগেও বাণিজ্যবন্দর হিসাবে তাম্রলিপ্ত সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই।

একচেটিয়া অধিকার সত্ত্বেও বঙ্গদেশের ব্যবসায়ে সমস্তটাই পর্তুগীজরা দুইটি কারণে অধিকার করিতে পারে নাই। প্রথমত জলপথে যতই তাহারা শক্তিশালী হউকনা কেন, স্থলে তাহাদের শক্তি ছিল সীমিত। ফলে সেখানে ভারতীয় ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা তাহাদের আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিল। দ্বিতীয়ত পর্তুগীজরা সম্ভবতঃ নিজেদের স্বার্থে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ সহ্য করিত। সাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দিকে মেনরিক (Manrique) মেদিনীপুরে একজন ব্যবসায়ীর সন্ধান পাইয়াছিল (মোবা টৌথান) যিনি ভারতের সহিত বিপুল পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন। উড়িষ্যার নিকট পিপ্‌লিতে তিনি একজন শিকদারের অধীন বৃহৎ বাণিজ্য জাহাজ দেখিয়াছিলেন, যাহাতে একজন পর্তুগীজ বণিকের নেতৃত্বে কোচিনে প্রচুর পণ্যসামগ্রী পাঠানো হইয়াছিল। পর্তুগীজরা যেমন এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আহরণ করিয়া বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে বিক্রয় করিতেন, তেমনি বঙ্গদেশ হইতে একই পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্যবসা চালাইতেন।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রে দেশীয় বণিকেরা পর্তুগীজদের নিকট হইতে কোন বাধা না পাইয়া পূর্বের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন। তবে তাহারা অনেক সময় ভারতীয় বণিকদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিতে বাধ্য করিতেন। যেমন সন্দীপ এবং হিজলী ছিল অন্যতম প্রধান লবণ ব্যবসার কেন্দ্র।

বঙ্গদেশের পর্তুগীজ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি মোগল কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্র ছিল খুবই প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উপরন্তু পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়াবহ অত্যাচার মোগল সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে ছিল বিঘ্নস্বরূপ। এই সমস্ত ছাড়াও পর্তুগীজরা দেশীয় রাজাদের সেনাবাহিনীতে কাজ করিয়া ছিল। যেমন কারভেলো, দান্তেজ

(Dantas), ফারমান্দোল, পেরিরা (Pareira) প্রভৃতি পিপ্‌লি বন্দরের অধ্যক্ষ অথবা শ্রীপুরের রাজার সেনাবাহিনী এমনকি হিজলীর মসনদ-ই-আলার সেনাবাহিনীতে কাজ করিয়াছিলেন। তবে মনে রাখিতে হইবে ক্রীতদাস ব্যবসা পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের একটি প্রধান বাণিজ্য। এই কাজের জন্য তাহার যে নিষ্ঠুরতা ও নৃসংশয়তার আশ্রয় লইয়াছিল তাহা ছিল ভয়াবহ।

বঙ্গদেশে পর্তুগীজ জনগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ছিলেন পুরোহিত ও ধর্ম প্রচারক। ইহাদের প্রতি সাধারণ জনগণের সম্পর্ক মনে হয় বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। বাকল, চণ্ডীকান, শ্রীপুরের রাজা ও হিজলীর মসনদ-ই-আলা সকলেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতেন।

সাধারণভাবে ধর্ম প্রচারকগণ খুব গোঁড়া হইতেন। দেশীধর্ম ও রীতিনীতির প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা অপরিসীম। তথাপি পুরোহিত ধর্ম প্রচারকদের সহিত সাধারণ লোকেদের সম্পর্ক ছিল একটা সমঝোতামূলক। হিজলীর শিকদার মেনরিককে রাজ্যে আগমন করিলে খাদ্য সামগ্রী উপহার দিয়া আপ্যায়ন করেন। পরে মেদিনীপুরের কোতয়াল ও তমলুকের রাজা মেনরিককে যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অবশ্য তমলুকের রাজা তাহার রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে পর্তুগীজদের সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে আরও একটি বিষয় বলা সমীচীন। তাহাদের কার্যাবলী অনেকাংশে ভয়াবহ ও নৃশংস হইলেও বঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনে তাহাদের কোন প্রভাব নাই ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। তাহাদের অনেক রকম ত্রুটি সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে পশ্চিমীদের মত ধর্মবিদ্বেষ ছিল না। সেজন্য তাহারা অবলীলাক্রমে বিবাহ করিয়া এদেশে সংসার করিতেন। কেহ কেহ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। যেমন মেদিনীপুর জেলায় মীরপুর গ্রামে এখনও পর্তুগীজদের বসবাস আছে। তাহারা এদেশে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছিলেন যেহেতু তাহারা নিজেরাই নিজের দেশের উন্নত কৃষক ছিলেন। পর্তুগীজদের মাধ্যমে আমেরিকা হইতে তামাক ও আলু আমদানি হয়। ব্রাজিল হইতে তাহারা এ দেশে কাজুবাদাম আমদানি করে। এক সময় ইহাকে হিজলীর বাদাম বলা হইত। কারণ হিজলীর বালুকাময় মাটিতে ইহার প্রচুর চাষ হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাহারা পেঁপে, আনারস, কামরাঙা, পেয়ারা প্রভৃতি এদেশে আমদানি করিয়াছিল। ফুলের মধ্যে কৃষ্ণকলি ফুল তাহাদের দ্বারা আনিত হইয়াছিল। এই তালিকাটি সম্পূর্ণ না হইলেও ইহা হইতে তাহাদের কৃষিবিজ্ঞানের দিকে অবদান কত গভীর তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ইহা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলা শব্দবিন্যাসে তাহাদের অবদান প্রচুর। প্রায় ৫০টি পর্তুগীজ শব্দ বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। কয়েকটি যেমন চাবি, বাল্‌তি, পেরেক, আল্‌পিন, বারান্দা, জানালা প্রভৃতি। দুইটি জাতি একে অন্যের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশ্রণের ফলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে একে অন্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রচনা পর্তুগীজদের দান। একজন পর্তুগীজই প্রথম বাংলা গদ্য রচনা এবং অন্যজন বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যকবদার শোশা (Soso) নামে একজন খ্রীষ্টান ধর্মপুস্তক বাংলায় অনুবাদ করেন। ডোম এ্যন্টনিও ডো রোজারিও নামে অভিজাত বংশীয় একজন পর্তুগীজ দ্বারা ধর্মান্তরিত ভারতীয় ব্যক্তি প্রথম বাংলা গদ্যে কথোপকথন রচনা করেন। কাজেই পর্তুগীজরাই বাংলা ভাষাকে প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

ওলন্দাজ ঃ পর্তুগীজদের পর বঙ্গদেশে যে বিদেশীদের আগমন হয় তাহারা হইল ওলন্দাজ বণিকগোষ্ঠী। বঙ্গদেশে তাহাদের প্রথম আবির্ভাবের ইতিহাস এখনও অস্পষ্ট। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারীর লিখিত চিঠিতে প্রথম ওলন্দাজদের বঙ্গদেশে বাণিজ্যের সংবাদ পাওয়া যায়। এই চিঠিতে যে ধরণের ব্যবসার কথা উল্লিখিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহে দস্যুতামূলক। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে অন্য একজন ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর চিঠি হইতে বাংলা ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ইহাতে বঙ্গদেশে প্রচুর সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনের কথা বলা হইয়াছিল এবং তাহা সুমাত্রা, জাভা, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপে ব্যবসার উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হইত। ঐ অঞ্চল হইতে ওলন্দাজ বণিকগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে লবঙ্গ ও অন্যান্য সামগ্রী বঙ্গদেশে আমদানি করিত এবং জিনিসগুলি খুব ভাল মূল্যে সাতগাঁও বন্দরে বিক্রয় করা হইত। এই অঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে বিক্রয়ের জন্য ওলন্দাজগণ গোল-মরিচ, সোনা, কর্পূর, গন্ধক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিত।

এইভাবে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে ওলন্দাজরা বাণিজ্যিক সূত্রে বেশ আধিপত্য অর্জন করিয়াছিল। খুব স্বাভাবিক কারণে তাহাদের পূর্বে আগত পর্তুগীজ বণিকদের সহিত প্রায়ই তাহাদের সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইত। নবাগতদের উৎসাহ ও উদ্যমে বিভিন্ন যুদ্ধে পর্তুগীজরা ক্রমশই পশ্চাতধাবন করিতে বাধ্য হইতে লাগিল। অর্থাৎ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ওলন্দাজরা প্রত্যক্ষভাবে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজ কয়েকটি ওলন্দাজ জাহাজকে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাহাকে সাহায্য দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ওলন্দাজরা খুব ঘন ঘন বঙ্গোপসাগর দরিয়ায় উপস্থিত হইত। সমসাময়িক কালে ইংরেজ রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রো বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুযোগ আছে কিনা এর জবাবে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা এখানে ভাল ব্যবসা করিতেছে এই উত্তর দিয়াছিলেন। সমুদ্র উপকূলবর্তী ওলন্দাজ ব্যবসা মোটামুটি বিনা বাধায় চলিতেছিল।

১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজরা বঙ্গদেশে প্রথম চুঁচুড়ায় কুঠি স্থাপন করে। এই কুঠি পর্তুগীজদের হুগলী বন্দরের সামান্য কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে ওলন্দাজরা বেশ শক্তভাবে বঙ্গদেশের মাটিতে নিজেদের কুঠি স্থাপন করিয়া বঙ্গের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ওলন্দাজগণ পর্তুগীজদের প্রধান প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহারা বঙ্গের সামগ্রিক বাণিজ্যে এতদিন পর্যন্ত পর্তুগীজদের যে একচেটিয়া অধিকার ছিল তাহা ছিনাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতি পর্তুগীজদের মতই ছিল। যদিও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের ব্যবসা আন্তঃ-এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সপ্তদশ শতকের তিরিশের দশকে ওলন্দাজ কিছু কিছু জাহাজ উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত ছিল। এই জাহাজগুলি আবার সস্তায় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া ভারতের বাহিরে যাইত এবং সেখান হইতে নিজের দেশে ফিরিত। ওলন্দাজ মূলধন খানিকটা ইউরোপ হইতে আসিত। কিন্তু অধিকাংশ আসিত জাপানের স্বর্ণ ও তাম্র, মালয়ের টিন, ব্রাস ও হাতির দাঁতের জিনিস এবং দক্ষিণ সমুদ্র অঞ্চলে মশলা ও শঙ্খ বিক্রয়ের মাধ্যমে। এই অর্থে তাহারা সূতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, গাঁজা, চাল, আফিং, চিনি, গোলমরিচ, শুষ্ক শাকসব্জী, সোরা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দেশে পাঠাইত। অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশ তথা ভারতীয় পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল ইউরোপের বাজারগুলি। এই শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে বাণিজ্যের এই বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পর্তুগীজরাও তাহাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রথম অবস্থায় এই এই ধারা অনুসরণ করিত। পরবর্তীকালে যখন তাহারা বঙ্গদেশের অর্থনীতিকে অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল তখন তাহারা লক্ষ্য করিল যে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করা বিশেষ সুবিধাজনক এবং অধিকতর লাভজনক। সেই

সময় হইতে তাহারা ইউরোপের দিকে তেমন নজর রাখিত না। অপর দিকে ওলন্দাজ বণিকেরা কিন্তু কখনও ইউরোপের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই। যদিও তাহাদের বাণিজ্য আন্তঃ-এশিয়াতেই প্রধান স্থান পাইত।

পর্তুগীজদের সহিত ওলন্দাজদের আর একটি প্রধান পার্থক্য হইল জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ সময়কালে এমনকি চুঁচুড়ায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরেও তাহাদের কার্যাবলী ছিল মূলত উপকূল বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ। ইহার কারণ বোধ হয় বোঝা মুশ্‌কিল নহে। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে পর্তুগীজরা বঙ্গদেশে বাণিজ্যিক প্রাধান্য হারাইতে আরম্ভ করিলেও তখন হুগলী, সাতগাঁও প্রভৃতি জায়গায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ইহার ফলে তাহারা বঙ্গদেশে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর খুবই কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। হুগলী বন্দর পত্তন পর্যন্ত ওলন্দাজরা মূলত উপকূল বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারিয়াছিল।

ওলন্দাজদের করমণ্ডল উপকূলে গুজরাটে কুঠি ছিল। ইহা ছাড়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অভ্যন্তর ভাগে তাহারা কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরাহনগর, পাটনা, বালেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে তাহাদের কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল।

ইংরেজ ঃ ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে এমনকি ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা বঙ্গদেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে তেমন কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। এই সময়ে তাহাদের মোগল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বাণিজ্যের সাফল্য সম্পর্কে খুবই একটা আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা ছিল। ষোড়শ শতকের শেষদিকে বঙ্গদেশে আগত প্রথম ইংরেজ পর্যটক রালফ্‌ ফিচ্‌ (Ralphfitch)-এর মন্তব্য অনুসারে বঙ্গদেশ ইংরেজদের বাণিজ্যের উপযোগী নয় বলিয়া মনে করা হইত।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে কিন্তু ইউরোপীয় বণিকগণ বঙ্গদেশে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সাগ্রহে দৃষ্টি রাখিত। তাহাদের চিঠিপত্রে প্রায়ই বঙ্গদেশে তৈয়ারী বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের উল্লেখ থাকিত। তাহারা জানিত বঙ্গদেশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং সেই দেশীয় কিছু কিছু জিনিস বঙ্গদেশে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গদেশে ইংরেজ বাণিজ্যের স্মরণীয় দিন। কারণ সেই বৎসরই একজন ইংরেজ চিঠির মাধ্যমে প্রথম বঙ্গদেশে সরাসরি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্য করিবার কথা বলেন। একই বৎসর স্যার টমাস রো সুরাটের বণিকদের পরিষ্কারভাবে লেখেন যে তাহাদের উচিত স্থলপথে বঙ্গদেশের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করা। সুরাটের ইংরেজগণ অবশ্য বঙ্গদেশে বাণিজ্য ব্যাপারে তখনও উদাসীন ছিলেন। ঐ বৎসরের শেষদিকে টমাস রো সুরাটের বণিকদের তাহার মত গ্রহণ

করিতে বাধ্য করিলেন। যদিও তিনি নিজেও বঙ্গদেশে ব্যবসার ব্যাপারে খুব উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন না।

এই সব নানাবিধ বিপত্তি সত্ত্বেও ১৬১৮-১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্যিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দুইজন কোম্পানীর কর্মচারীকে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা পরীক্ষা করিবার জন্য পাটনায় পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে একটি চুক্তির মাধ্যমে জাহাঙ্গীর ইংরেজদের বঙ্গদেশে বাণিজ্যিক অধিকার দান করেন। অবশ্য এই চুক্তি তেমন কার্যকর হইবার পূর্বেই ইংরেজ বণিকদের বঙ্গদেশ হইতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয় (১৬২৮)। পরে ১৬৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইংরেজদের বঙ্গদেশে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়।

বঙ্গদেশে ইংরেজদের প্রধান কাজ ছিল অভ্যন্তর ভাগ হইতে পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা। কারণ উপকূলবর্তী অঞ্চলে সব কিছু পাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সুজা কোম্পানীকে একটি ফরমান দিয়াছিলেন যাহার বলে তাহারা বার্ষিক ৩০০০ টাকার বিনিময়ে আর কোন প্রকার শুল্ক না দিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা আরও একটি অনুমতিপত্র পাইয়াছিল (নিশান) যাহার বলে ইংরেজ কুঠিগুলির শুল্কবিভাগের উপরে কোন জবরদস্তি চলিত না। বিদেশী অথবা আন্তর্দেশীয় কোন বাণিজ্য সামগ্রীর উপর তাহাদের কর দিতে হইত না। কিন্তু সুজার উত্তরাধিকারীরা ইহা মানিতে রাজি ছিল না। তাহারা ক্রমবর্ধমান ইংরেজ বাণিজ্যের উপরে শুল্ক আদায়ে দাবি করিল। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী শায়েস্তা খানের নিকট হইতে আর একটি ফরমান লাভ করিল। এই ফরমান বলে ইংরেজ বণিকেরা বিনাশুল্কে আবার বাণিজ্যিক অধিকার পাইল। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবও এই ধরনের একটি ফরমান জারি করিয়াছিলেন। এসব সত্ত্বেও স্থানীয় শাসকরা যখন তখন ইংরেজ বণিকদের উপর হইতে শুল্ক আদায়ে চেষ্টা করিতেন।

এই অবস্থায় কোম্পানী আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করিল এবং হুগলী বন্দরটি সুরক্ষিত করিল। অনিবার্য কারণে ইংরেজদের সহিত মোগলদের সংঘর্ষ বাধিল। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের হুগলী বন্দর ধ্বংস করা হইল। ইংরেজরা তখন হিজলী ও বালেশ্বর আক্রমণ করিয়া সেখানে আশ্রয় লইল। হুগলী হইতে বিতাড়িত ইংরেজগণ যব চার্নকের নেতৃত্বে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সুতানুটি নামক একটি গ্রামে কুঠি স্থাপনের জন্য অনুমতি চাহিয়াছিল। কিন্তু মোগলদের সহিত পুনরায় বিবাদ ঘটে এবং এক বৎসরের মধ্যে সুতানুটি ত্যাগ করিতে হয়।

এই সময় ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষ মোগল সম্রাটদের সহিত একটি চুক্তি

স্বাক্ষর করে (১৬৯০)। এই চুক্তির শর্তানুসারে যব চার্নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট সুতানুটিতে পুনরায় আসিয়া ইংরেজ কুঠি স্থাপন করেন। ইহাই পরবর্তী-কালে ইংরেজদের ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতায় পরিণত হইয়াছিল। মোগল সম্রাটের আদেশে বঙ্গের শাসক ইব্রাহিম খাঁ ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের জন্য একটি ফরমান জারি করেন। এই ফরমান বলে বার্ষিক ৩০০০ টাকার বিনিময়ে ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্যিক সুযোগ পাইল। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভারাম সিংহের বিদ্রোহকে উপলক্ষ্য করিয়া ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকেরা তাহাদের কুঠিগুলি যথাক্রমে কলিকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়াকে সুরক্ষিত করে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীগুলিকে একটি আলাদা শাসনাধীনে আনা হয়।

বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা ও প্রতিপত্তি রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্বেও প্রথম ৪০ বৎসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ চিকিৎসক হ্যামিল্টন সম্রাট ফারুকশিয়ারের নিকট হইতে বিনা শুল্কে বাণিজিক অধিকার লাভ করিয়াছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ খুব জবরদস্ত নবাব ছিলেন। তিনি ইংরেজদের অতিরিক্ত সুযোগ দিতে রাজি ছিলেন না। নানা অজুহাতে তিান ইংরেজদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন।

ফারুকশিয়ারের ফরমান লাভ করিবার পূর্ববর্তী ১৮ বৎসর ইংরেজদের ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য মারাঠাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুবই ব্যাহত হইয়া-ছিল। সেই সময় তাহারা আরও অধিকতর পূর্বদিকে বাণিজ্যে নজর দিয়াছিল।

ফরাসী ঃ যদিও ফরাসীদের মধ্যে পূবগোলার্ধে বাণিজ্য করিবার আকাঙ্খা বহুদিনের তথাপি তাহারাই ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে শেষে ভারত-বর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। ফরাসী রাজনীতিবিদ রিসলু (Richelieu) ও কোলবার্ড (Colbered) প্রথম বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে উদ্যোগী হয় এবং কোলবার্ডের উদ্যোগে প্রথম ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কোম্পানী স্থাপিত হয়। যদিও এই কোম্পানী সম্পূর্ণ ফরাসী অর্থে গঠিত হইয়াছিল তথাপি প্রাথমিক অবস্থায় ইহাদের কার্যধারার মধ্যে খুবই কম উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা প্রথম সুরাটে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। পরে তাহারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বাণিজ্য কুঠিস্থাপন করিতে শুরু করে।

বঙ্গদেশের নবাব শায়েস্তা খান ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের একটি জায়গা দান করিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা বিখ্যাত চন্দননগরে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে স্বভাবতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সপ্তদশ শতকের

প্রথমার্ধে ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। একদিকে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে বিবাদ, অন্যদিকে পর্তুগীজ ও ইংরেজদের সহিত বিবাদ এবং সর্বশেষে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সহিত বিবাদ। ওলন্দাজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদে ওলন্দাজদের ইংরেজরা সর্বদাই সাহায্য করিত। ফলে এই বিবাদে ফরাসীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। ওলন্দাজরা ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর দখল করিয়া পরে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তির মাধ্যমে ইহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ হইতে ফরাসী শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে এবং তাহারা সুরাট, মুসলিপত্তম কুঠিগুলি পরিত্যাগ করে।

চারটি বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে ফরাসীরা সর্বশেষে ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে আসিলেও তাহারাই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অধিকার লাভের বিষয়ে প্রথম সচেতনভাবে চিন্তা করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলিতেছিল সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলে একটি ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গঠন সম্ভব প্রতিভাবান ডুপ্লে তাহা প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন বিবদমান ভারতীয় শক্তিবর্গের অস্ত্রও সেনাবাহিনীসহ যে কোন একজনের পক্ষ অবলম্বন করিলে যুদ্ধ জয় অনিবার্য।

তাহার এই আদর্শ অনেকটা দ্বিমুখী অস্ত্রের মত ছিল। ক্ষমতাশালী যে কেউ ইহা তাহাদের নিজেদের জন্য ব্যবহার করিতে পারে। ডুপ্লে তাহার চিন্তাধারাকে দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকে বাস্তবে প্রয়োগ করিয়া অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন যাহা ইংরেজ বণিকদের ঈর্ষা ও ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল। পরবর্তীকালে ডুপ্লে প্রদর্শিত এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বঙ্গদেশে প্রথম ইংরেজগণ ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনে সক্ষম হইয়াছিল। বণিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পর্তুগীজরা বহু আগে পিছু হটিতে বাধ্য হয়। পর পর তিনটি কর্ণাটক যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফরাসীরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বঙ্গদেশে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক দুই বৎসর পরে ওলন্দাজরা ইংরেজদের হাতে (১৭৫৯) বেদারার যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে ইংরেজদের বাধা দেবার মত আর কোন বিদেশী বণিকগোষ্ঠী থাকিল না।

ইউরোপীয় বণিকদের কার্যাবলীর ফলাফল

ইউরোপীয় বাণিজ্যের দ্বারা খুব স্বাভাবিক কারণে বিদেশীরা বেশী লাভবান হইয়াছিলেন। পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ফলে বঙ্গদেশ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তবে ইউরোপীয়দের যাহাতে লাভ তাহা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে

বহুবিধ ক্ষতির কারণ ছিল। প্রথমত বঙ্গদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য এদেশীয় বণিক-গোষ্ঠীর হাত হইতে চলিয়া গিয়াছিল। ইহার একাধিপত্য লাভ করে পর্তুগীজরা, পরে কিছুটা পরিমাণে ওলন্দাজরা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরোক্ষভাবে তাহাতে দেশের উপকার হইয়াছিল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ জাহাজ আয়তন ও কৃতকৌশলে উন্নত ছিল বলিয়া তাহারা পণ্যসামগ্রী এত দ্রুত দেশের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারিত যাহা ভারতীয় জাহাজগুলি পারিত না। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-সমুদ্রের উপর আধিপত্য থাকায় বিদেশীগণের পক্ষে ব্যবসার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল। বিদেশ হইতে বিভিন্ন চিঠিপত্রের মাধ্যমে বঙ্গদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছিল স্পষ্ট বোঝা যায়। পর্তুগীজদের চেষ্টায় সমগ্র এশিয়ার বাজার বঙ্গদেশের পণ্যের জন্য খুলিয়া যায়। অর্থাৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে পশ্চিমের দরজা ভারতীয় পণ্যের জন্য খুলিয়া গিয়াছিল।

এই উন্মুক্ত পথ দিয়া ধীরগতিতে বঙ্গদেশে প্রচুর বিদেশী স্বর্ণ আমদানি হইত। স্বর্ণ আমদানির সঙ্গে সঙ্গে বহু সুযোগ-সন্ধানীর আগমন ঘটিয়াছিল। তাই দেখা যায় হুগলী বন্দরে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দেশের (খোরাসান, ফার্সী, মোগল, আর্মেনিয়ন, হিন্দুস্থানী) ভিড় জমিয়াছিল। বঙ্গদেশের নূতন রাজধানী ঢাকার বাজার সর্বদা সরগরম থাকিত। ব্যবসার উন্নতির জন্য স্বাভাবিক কারণে বঙ্গদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত।

রালফ্ ফিচ্ ও মীর্জানাথন বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে এদেশীয় ধনী ব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই আপাত ঐশ্বর্যের মধ্যে অবশ্য একদল দেশী দালাল শ্রেণীও ছিল। পর্তুগীজরা ইহাদের পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রচুর টাকা আগাম দিত। দেশী ও বিদেশী দালাল ও বণিকেরা বিদেশী বাণিজ্যের ফলে খুবই ধনশালী হইয়াছিল।

সাধারণ লোকেরা অবশ্য এই ঐশ্চর্যের বিশেষ কিছু পাইতেন না। শুধু পর্তুগীজদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে গঙ্গার উভয় তীরে একটি ছোট দেশীয় লোকবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে সকলে (দেশী ও বিদেশী) ভালভাবে থাকিতে পারিত। বিদেশে বঙ্গদেশের পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইয়া দিয়া পর্তুগীজরা পরোক্ষভাবে বঙ্গদেশের সূতী, রেশম ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের হারকে বাড়াইতে সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় ভারতীয় খাদ্য তালিকার কিছু কিছু নূতন জিনিস যুক্ত হইয়াছিল, যেমন চীজ, আচার প্রভৃতি।

ইহা অপেক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। পর্তুগীজদের

আগমনের পূর্বেকার কয়েকটি অজ্ঞাত অঞ্চল ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে প্রভূত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। হিজলী, চট্টগ্রাম সন্দীপ ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সূত্র নির্দেশ

১। মেদিনীপুরের ইতিহাস, যোগেশচন্দ্র বসু, পৃঃ ১৮৮-১৯০

২। Bengal Under Akbar & Jahangir, T. K. Raychowdhury, Pp. 52-77, 210-230

৩। History of Bengal, Vol. II, J. N. Sarkar (ed), Pp. 351-370.

৪। District Gazetteer (Midnapur), O'Mally, Pp. 26-27

৫। An Advance History of India, Majumdar, Raychaudhuri and Datta, Pp. 623-625, 631-636

৬। History of Bengal (Mughal Period), A C. Roy, Pp. 17-219

৭। The French in India, S. P. Sen, (1958), Pp. 27

অষ্টম অধ্যায়

সমাজ

জনগোষ্ঠীর বিবর্তন : হিন্দু

বঙ্গদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী সেন রাজাদের আমলে প্রথম আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দু ধর্মের বিবর্তনের সঙ্গে সমাজজীবনেও নানা পরিবর্তন লক্ষিত হয়। মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা কঠোরভাবে চালু হইয়াছিল। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথা এই ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

বঙ্গদেশে মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজে এইভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বল্লাল সেনের হিন্দুসমাজ সংস্কারের চেষ্টা মোটেও সার্থক হয় নাই। ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে অখণ্ড ঐক্য কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই অবস্থায় মুসলমান আক্রমণের ফলে হিন্দু সমাজ-জীবন বিশেষভাবে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু সমাজে অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর জনগণ দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক নিপীড়নের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হিসাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাই অনেকে শ্রেয় বলিয়া মনে করিত।

এদিকে যখন বৌদ্ধধর্ম ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ঠিক সেই সময় হিন্দুধর্মের মধ্যেও এই ভাঙ্গন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে স্মার্ত রঘুনন্দন অনেক শাস্ত্রীয় গোড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া হিন্দু সমাজকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক সুশীল কুমার দের ভাষায় ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা ঐক্যবদ্ধ করা।

মুসলমান আক্রমণের প্রথম আঘাত সামলাইয়া উঠিবার পর হিন্দু সমাজ-জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইত। ব্রাহ্মণগণ পূর্বেকার বিশিষ্ট্য সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া নূতনভাবে সমাজকে সংস্কারে চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে চৈতন্য আবির্ভাবের সময়কাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ নেতৃবৃন্দ হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও জাতিভেদ বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণ মুসলমান আক্রমণের পরবর্তী সময়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে খুবই দৈন্যদশায় পড়িয়াছিল।

হিন্দুসমাজের শীর্ষে তখন অধিষ্ঠিত ছিলেন ব্রাহ্মণগণ। ইহারা কৌলিণ্যপ্রথার দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, যথা—কুলিন, শ্রোত্রিয় এবং বঙ্গজ। বলাবাহুল্য ইহাদের মধ্যে কুলিনরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। শ্রেণী বিভাগ অনুসারে বিবাহ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। কৌলিন্য প্রথার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হইল ইহার প্রভাবে বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মণদের সহিত অব্রাহ্মণদের সম্পর্ক কতকগুলি অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হইত। বিবাহ, আহার ও অন্যান্য সংযোগের ঘটনা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হইত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে আহারাদি ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। ভবদেব ভট্ট কর্তৃক লিখিত 'প্রায়শ্চিত্যপ্রকরণ' গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথা অমান্য করিলে কত প্রকার শাস্তি হইতে পারে তাহার তালিকাও উল্লেখ আছে।

আদি মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল কায়স্থরা। ইহারা আবার কুলিন কায়স্থ এবং মৌলিক কায়স্থ এই দুইভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। তুর্কী-আফগান শাসনকালে অনেক কায়স্থ রাজদরবারে খুবই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এমনকি কেহ কেহ সুলতানদের সেনাপতি হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। কায়স্থদের পরবর্তী স্তর ছিল বৈদ্য। মধ্যযুগে ইহারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল। সুলতানদের আমলে তাহারা অনেক রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

সমাজে ইহার পরের শ্রেণী হইলেন বৈশ্য। তাহারা প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহারাই ছিলেন মঙ্গলকাব্যের ধনী সওদাগর। মধ্যযুগে হিন্দুর এই সমাজ-ব্যবস্থা খুবই দৃঢ়বদ্ধ রূপ ধারণ করে যখন জাতিগত বৈষম্য খুব কঠোর-ভাবে পালিত হইত।

এই সমাজবিন্যাসের মধ্যে অনেক উপজাতিও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের নিজস্ব জাতিগত বিধিনিষেধ প্রবর্তিত ছিল। প্রাচীনযুগের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের জাতিগোষ্ঠীটিতে উপজাতিদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেই সমাজবিন্যাস মধ্যযুগেও দেখা যায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। সেই পুরাতন কাঠামোর মধ্যে মধ্যযুগে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত স্বরূপটা আর একবার সংক্ষেপে দেখা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই পূর্বের ন্যায় রাঢ়ী শ্রেণীর ছিল। অপর দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যথা, মধ্যশ্রেণী ও ব্যাসোক্ত এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের ন্যায় কৈবর্তরাও উত্তর ও দক্ষিণ

রাঢ়ীতে বিভক্ত। দক্ষিণ রাঢ়ীদের আবার চারটি শাখা। হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীর অন্যতম একটি হইল বাগ্‌দী। ইহা ছাড়া সদগোপ, ভক্তা, দণ্ডমাঝি, কদমা, কায়স্থ, রাজু, শুন্ডি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের দেখা যায়। পর্তুগীজদের প্রভাবিত বিনপুরে পর্তুগীজ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে এক অদ্ভুত মিশ্রিত জাতিগোষ্ঠী।

মেদিনীপুরে উপজাতিদের মধ্যে পূর্বেই বলা হইয়াছে সাঁওতাল প্রধান। তাহা ছাড়া অন্যদের মধ্যে উল্লেযোগ্য হইল ভূমিজ, কোরা মুণ্ডা, লোধা প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে বহু পারিবারিক উপাধিযুক্ত ব্যক্তিরা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিত। এই উপাধিগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য হইল বেহারা, গিরি, জানা, মহাপাত্র মহান্তি, পণ্ডা, খাসনৈবল, শাওয়ন্ত, শাসমল, ফাদিকর প্রভৃতি। অর্থাৎ মধ্যযুগে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালী, ওড়িয়া, মারাঠা, আদিবাসী উপজাতিদের সংমিশ্রন অবাধে ঘটিয়াছিল।

চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথার এক বিশাল পরিবর্তন শুরু হয়। বৈষ্ণবধর্মের সার্বজনীন আবেদন হিন্দুসমাজের এই কঠোর জাতিভেদ প্রথার মধ্যে কিছুটা শৈথিল্য দেখা যায়। সব কিছুর উপর মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনাকে একস্থানে আনিয়া দাঁড় করানোর মত উদার আহ্বান বৈষ্ণবরা দিয়াছিলেন।

বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়াও একথা বলা যায় মধ্যযুগে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তাহার অবশিষ্টাংশ লৌকিক ধর্ম ব্যতিত অন্য কোথাও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব ছিল না।

মোগলযুগে হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে পূর্বের ধারাই মোটামুটি অনুসৃত হইয়াছিল। তবে মোগল যুগে ইহার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল হিন্দুধর্মের উপর চৈতন্যের নব বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব সহজিয়া শাস্ত্র ও তন্ত্র জনমানসে বিস্তারলাভ করিয়াছিল চৈতন্যের নব বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জনগন বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এইযুগের বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লৌকিক দেব-দেবীর আবির্ভাব ছিল একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পুরাণের দেবদেবীর পূজার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীরা যথা ভবানী, কালি, মহামায়া প্রভৃতি পূজা পাইতে আরম্ভ করিল। এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবকেও দেবতা হিসাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করা এই যুগে শুরু হইয়াছিল।

জীবনযাত্রা ঃ হিন্দু

মধ্যযুগে সাধারণ হিন্দুদের জীবনযাত্রার ধারা মোটামুটি নির্দিষ্টভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জীবনযাত্রায় ধর্মীয় বিশ্বাস (শাস্ত্রীয় ও লৌকিক) ও নানাপ্রকার সংস্কার বাঙালী হিন্দুদের সমাজ জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রঘুনন্দনের বিধানসমূহ খাঁটি হিন্দুর জীবনকে যেভাবে নিয়মের দ্বারা বাঁধিয়া দিয়াছিল তাহার ধারা পরবর্তীকালে অব্যাহত ছিল।

হিন্দুদের জীবনযাত্রায় জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সবই কতকগুলি বিধিবদ্ধ আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এমনকি জন্মের সূচনা হইতে ইহার শুরু হইয়া শ্মশান পর্যন্ত বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালীতে এই সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ আছে। মধ্যযুগে হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত ব্রতকথা, পাঁচালি গান, পূর্ণিমা, একাদশী পালন প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা প্রায় লাগিয়াই থাকিত। ইহার উপর ছিল বিভিন্ন ঋতুতে পূজাপার্বন, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা। তাহা ছাড়া দোলও বঙ্গদেশের একটি প্রধান উৎসব। এইজন্য বোধ হয় ষোড়শ ও সপ্তদশ বাঙালী হিন্দুদের সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল "ইহাদের বারমাসে তেরপার্বন।" বলাবাহুল্য এইসব কয়টি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল আপামর জনসাধারণের আনন্দ উৎসবের প্রধান উৎস। মধ্যযুগে প্রাচীন যুগের ন্যায় ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী সমাজে একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। ইহারা অনেক সময় গৃহভৃত্যের কাজে নিযুক্ত থাকিত। দাসব্যবসা এই সময়ে খুব প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে বিদেশ হইতে ক্রীতদাস আমদানির প্রথাও বহুল প্রচলিত ছিল। পরবর্তী মধ্যযুগে বঙ্গদেশে বিদেশীরা (বিশেষভাবে পর্তুগীজ ও ইংরেজ) দাসব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে মনে হয় সেই যুগের নিম্নশ্রেণীর জনগণ বিশেষভাবে হাড়ি, ডোম প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য সমাজে পদমর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। ফলে নারীদের অবস্থা সহজে অনুমান করা সম্ভব। সতীনের দুঃখ এবং তাহা প্রতিকারের নানারূপ চেষ্টা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। সমাজে স্ত্রীলোকদের সতীত্ব সম্পর্কে সাধারণত সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, মুকুন্দরামের কাব্যে তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সেই যুগে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অবরোধ প্রথা ছিল কিনা তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় নারীদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ছিল প্রচুর। হিন্দুসমাজে বিধবাদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাহারা ভাল

পোশাক-পরিচ্ছদ বা অলঙ্কার পরিধান করিতে পারিতেন না, এমনকি কোন উৎসব অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে পারিতেন না। বিধবা-বিবাহের প্রচলন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ছিল না। সতীদাহ প্রথা তখন প্রচলিত ছিল।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুদের খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত রাজাকে ভেট দেওয়ার জন্য কাঁচকলা, পুঁইশাক, মোচা, বেগুন, মূলা প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিল। মনে হয় এইগুলি তখন-কার যুগে খুব প্রিয় খাদ্যের তালিকায় পড়িত। চৈতন্যদেব শাক ভালবাসিতেন।

অন্যান্য তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে বৈষ্ণবগণ মৎস্য ও মাংস আহার বর্জন করি-তেন। সেজন্য কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যে নিরামিষ আহার্যদ্রব্যের তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু শাক্ত গ্রন্থগুলিতে নিরামিষ ও আমিষ দুইটি তালিকা আছে। এই তালিকার মধ্যে বহুরকমের মৎস ও মাংসের উল্লেখ পাওয়া যায়। খাদ্য-সম্ভারের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য তালিকা হইল মিষ্টান্ন দ্রব্য (পিঠে, পায়েস)। সেইযুগে প্রকাশ্যে মদ্যপান সমাজে খুবই নিন্দনীয় ছিল। তবে গোপনে ইহার অধিক মাত্রায় প্রচলন দেখা যাইত। মধ্যযুগে খাবার পর পান (তাম্বুল), সুপারি, হরিতকি প্রভৃতি মুখশুদ্ধি হিসাবে ব্যবহার করা হইত।

সেকালে বাঙালী পুরুষেরা ধুতি, চাদর ও স্ত্রীলোকেরা সাধারণত খালিগায়ে শাড়ি পরিত। পুরুষের পায়ে জুতা এবং মস্তকে পাগড়ীর কথাও মুকুন্দরামের কাব্যে আছে। পুরুষেরা লম্বা কাছা দিয়া কাপড় পরিত। বিলাসীরা রূপা ও ভেলভেটের জুতা, কর্ণে স্বর্ণলঙ্কার ও দেহে চন্দনচর্চিত এবং তসরের বস্ত্র পরিধান করিত। ধনী পুরুষেরা কোটের ন্যায় কঙ্গরাখা ও পাগড়ি পরিতেন। পুরুষেরা কোমরে পটুকা ও স্ত্রীলোকেরা নিবিবন্ধ পরিত।

দরবারের পোশাক ছিল আলাদা। ইজার, কোমরবন্ধ, কাবাই প্রভৃতি। ধনী স্ত্রীলোকেরা নানাধরনের রেশমের শাড়ি ব্যবহার করিতেন। কোন কোন স্ত্রীলোক ছবিআঁকা কাঁচুলি ও ওড়না পরিত। নর্তকীরা ইজার পরিত। গরীব লোকেদের বেশীর ভাগ সময়ে নেংটি জড়ানো থাকিত। স্নানের সময় মেয়েরা হলুদ ও কুমকুম দিয়া গাত্র মার্জনা করিতেন এবং আমলকি দিয়া চুল ধুইতেন। তাহারা কেহ কেহ কেশ মার্জনা করিয়া ধূপ দিয়া চুল শুকাইতেন এবং চন্দন দিয়া দেহ লেপন করিতেন। চুল আঁচড়াইবার জন্য তাহারা অভ্রের চিরুণী ব্যবহার করিতেন। সমসাময়িক সাহিত্যে ধনী নারীদের নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহারে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অলঙ্কার স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদাঁতের তৈয়ারী এবং অনেক সময় মণিমাণিক্য খচিত হইত।

মধ্যযুগে পাশাখেলা খুবই জনপ্রিয় ছিল। মহিলা এবং পুরুষেরা পাশা খেলায় এমন মত্ত হইতেন যে তাহারা নিজেদের কর্তব্য পর্যন্ত অবহেলা করিতেন এই কাহিনী প্রচলিত আছে। বিষ্ণুপুরে গোল তাসখেলার প্রচলন আছে। অনেকে অনুমান করেন পর্তুগীজরা ইহা এদেশে আমদানি করে। পায়রা ওড়ানো প্রতিযোগিতা একটি জনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। একইভাবে মল্লক্রীড়া জনপ্রিয় ছিল। শঙ্খ, ঘণ্টা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র রামায়ণের কাহিনী ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কাহিনী বহু কাব্যে পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বহু প্রচলিত ছিল পাঁচালি গান। প্রাচীন বঙ্গের কাব্যগুলি সবই প্রায় এই শ্রেণীর।

চীনদেশীয় পর্যটকদের বর্ণনায় দেখা যায় প্রত্যহ ভোরে একশ্রেণীর পেশাদার লোক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাড়ির সম্মুখে গিয়া সানাই, ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজাইত। পরে ইহার জন্য তাহারা পারিশ্রমিক হিসাবে নানা উপহার পাইত। চীনারা বাঘের সঙ্গে খেলারও বর্ণনা দিয়াছেন যাহা বর্তমান যুগে সার্কাসের ন্যায়।

মধ্যযুগে বাঙালীরা যে যুদ্ধে পটু ছিলেন তাহার বর্ণনা রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্ম-মঙ্গল' কাব্যে পাওয়া যায়। তিনি এই কাব্যে লাউসেনের যুদ্ধযাত্রার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে যুদ্ধ ও অস্ত্রের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে সাধারণ লোকেদের মধ্যে বহুপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র, ঔষধ, বশীকরণ, জ্যোতিষগণনার প্রতি ছিল লোকেদের অগাধ বিশ্বাস। সেকালে লোকেদের পশুপক্ষি পোষার দিকে অত্যধিক ঝেঁাক ছিল। ধনী ও বিলাসীদের গৃহে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত পালঙ্ক, মশারী, শীতলপাটি, কম্বল, গালিচা, আয়না, চামর প্রভৃতি আসবারপত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

বঙ্গদেশের বহু জিনিসপত্র অত্যন্ত সস্তা হওয়ায় বহু বিদেশী এখানে বসবাসে খুব আগ্রহ পোষণ করিতেন। বিদেশীদের মধ্যে একটা প্রবাদবাক্যের বহুল প্রচলন হল "বঙ্গদেশে শত শত প্রবেশের দ্বার আছে, কিন্তু বাহিরে যাইবার একটিও পথ নাই"।

মধ্যযুগে বাঙালীদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বিদেশীরা পরস্পর বিরোধী মত জ্ঞাপন করিয়াছেন। জোয়ানেস-ডি-লায়েট (Jonnes-De-Laet) ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়াছেন যে "বাঙালীরা খুব চালাক চতুর, কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুব খারাপ। পুরুষেরা চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোকেরা লজ্জাহীনা ও অসতী"। সপ্তদশ শতকে শুটেন বলেন (Schouten) যে 'লাম্পট্য ও দুর্নীতি ভারতবর্ষের সর্বত্র আছে তবে বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী।" সেবাস্টিও

ম্যানরিক (Sebestiao Manrique) ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছেন "বাঙালীরা ভীরু, উত্তমহীন ও পরের পা চাটিতে অভ্যস্ত।" তাহাদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে "মারে ঠাকুর না মারে কুকুর"। অর্থাৎ যে প্রহারের উপর রাখে তাহাকে ঠাকুরের মত মান্য করা এবং যে তাহা করে না তাহাকে কুকুরের মত ঘৃণা করা স্বভাব।

অপরদিকে চীনাদের বিবরণে সর্বত্র বাঙালীদের সততা ও দয়াদাক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহারা কোন চুক্তি করিলে ভঙ্গ করে না, এমন কি দশ-হাজার টাকার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাকেও ঠকাইত না এবং নিজের গ্রামে দুস্থ লোকেদের নিজেরাই প্রতিপালন করিত, অন্যত্র যাইতে দিত না। তবে মুকুন্দরাম বর্ণিত ভাড়ুদত্তের চরিত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক বলিয়া নিশ্চয়ই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মধ্যযুগে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশ্রেণীর মত নীতির আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না তাহা স্পষ্টভাবে বলা যায়। টমাস বাউরী (১৬৬৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) বাঙালা ব্রাহ্মণদের মানসিক উৎকর্ষের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য অনেক বিষয়ে ভিন্ন হলেও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বাঙালী চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

মুসলমান ঃ মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হইবার পর অধিক সংখ্যক মুসল-মানগণ বঙ্গদেশে বসবাস করিতে শুরু কারলেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে বঙ্গদেশে বহু সংখ্যক গাজী এবং আউলিয়াগণ আসিয়াছিলেন। তাহাদের পবিত্র চরিত্র অচিরেই তাহাদের জনগণের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। সাধুসন্তগণ ইসলামধর্মকে ক্রমাগত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত করিতে লাগিল।

বঙ্গদেশে এইভাবে গঠিত মুসলমান সমাজ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমত যাহারা অনন্য স্থান হইতে এখানে আসিয়াছিলেন, দ্বিতীয়ত স্থানীয় ইসলাম ধর্মান্ত-রিত জনগণ। বাহির হইতে কেহ আসিয়াছেন বিজয়গর্বে, কেহ চাকুরী বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেহ আবার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। বঙ্গদেশে প্রথম আসিলেন যুদ্ধপ্রিয় খিলজী অভিযাত্রীগণ এবং তাহার পরে পরে ইলবারী তুর্কী আবিসিনিয়ান ও আফগানগণ। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন উদ্দেশ্যের লোক ইস-লামের মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। অর্থাৎ সকলশ্রেণীর জনগোষ্ঠী ইসলামের ছত্র-ছায়ায় একত্রিত হইল।

কালক্রমে বঙ্গদেশে মুসলমান জনগণের মধ্যে কতগুলি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিভাগের কোন নির্দিষ্ট নীতিগত মান ছিল না। প্রথম গোষ্ঠীতে

ছিল সদত উলেমা-মাসিক (Mashik), দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে ছিল খান মালিক উমরা, তৃতীয় গোষ্ঠীতে ছিল মুকাদ্দাম, মালকান এবং চতুর্থ গোষ্ঠীতে ছিল সাধু-সন্ত প্রভৃতি।

ইহা ছাড়া আরও একপ্রকার সমাজ ব্যবস্থা ছিল যেমন, সৈয়দ, আলিম, শেখ প্রভৃতি। সৈয়দরা পয়গম্বরের বংশধর বলিয়া খুবই গর্ব বোধ করিত। এই বিভাগ মনে হয় মুসলিম জনগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সরকারী পদাধিকার প্রভৃতির মাপকাঠিতে নির্ধারিত হইত। মুসলিম জনগণের মধ্যে জাতিগত বিভাগও ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের মধ্যে আরব, পাঠান, তুর্কী সবজাতির লোক ছিল। মূলত দেখিতে গেলে মুসলমান জনগোষ্ঠী উচ্চ ও নীচ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে মুসলমানদের মধ্যে কোন উচ্চ ও নীচ ভেদ না থাকিলেও যে শ্রেণী গোষ্ঠীর কথা আলোচনা করা হইল তাহাদের অবস্থা অনেকটা হিন্দুদের জাতি-ভেদের মতই ছিল। বিশেষত নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি ছিল তাহাদের শ্রেণীগত কার্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মূলত প্রথমে ইহা ছিল পেশাদারী এবং পরে যাহা বংশানুক্রমিক হইয়াছিল।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের বর্ণনা হইতে মুসলমান সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন এখানে এমন কিছু লোক আছে যাহাদের বলা হইত গোয়ালা অর্থাৎ দুগ্ধ ব্যবসায়ী। তাহারা নিয়মিত উপবাস বা নমাজ পড়িত না। পেশার দিক হইতে এইভাবে বিভক্ত আরও অনেক শ্রেণী ছিল। যেমন জোলা (তন্তুবায়), গোযান চালক (মুখেরী), রুটিবিক্রেতা (পিঠারী), মৎস বিক্রেতা (কবাড়ি) ইত্যাদি। মুকুন্দরামের ভাষায় ইহারা কখনও দাড়ি রাখিতনা এবং সর্বদা মিথ্যাকথা বলিত। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে সব মুসলমান হিন্দু হইয়াছে তাহাদের বলা হইত 'ঘাড়শাল', যাহারা রাত্রে ভিক্ষা করে তাহাদের বলা হইত 'কাল', তাঁত যে তৈয়ারী করে তাহাদের বলা হইত 'সোনাকার'। কেহ কেহ তাহাদের চিত্রিত দ্রব্যাদি শহরে ফেরি করিয়া বিক্রি করিত। ইহা ছাড়া তীরন্দাজরা তীরধনুক বানাইত। যাহারা কাগজ বানাইত তাহাদের বলা হইত কাগজা, কাপড় যাহারা বানাইত তাহাদের বলা হইত রংরেজ, কেহ দরজী, কেহ কাঁসাই প্রভৃতি বহু শ্রেণীর নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা এই বর্ণনার মধ্যে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের একটা স্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

মনে রাখিতে হইবে মোগল শাসন বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হইবার পূর্বে মুসলমানগণ এখানে খুব একটা সুসংবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হইতে পারে নাই। বরং তাহারা

বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, যখন তাহারা পূর্বের বৃত্তিমূলক নামে অধিক পরিচিত হইয়াছিল। এতদিন পর্যন্ত স্থায়ী বসবাসকারী এবং অস্থায়ী মুসলমানদের মধ্যে একটা মানসিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যাইত। মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে অধিক সংখ্যক মুসলমান স্থায়ীভাবে বঙ্গদেশে বসবাস শুরু করে। মোগল শাসক এবং সেনানায়কগণ তাহাদের সঙ্গে করিয়া বহু লোকজন লইয়া আসিত। তাহারাও বঙ্গদেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিল। যখন বঙ্গদেশে মোগল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল তখন মুসলমান সমাজ দৃঢ়ভাবে দুইটি ভাগে বিভক্ত হইল। এখনকার বিভাগগুলি ছিল অর্থনৈতিক। প্রথমটি হইল অভিজাত ধনীশ্রেণী এবং দ্বিতীয়টি হইল নিম্নশ্রেণীর বৃত্তিজীবি বা কৃষক শ্রেণী।

মধ্যযুগে মুসলমান সুফীরা সমাজগঠনে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে বৈষ্ণব আন্দোলনের মত সুফী আন্দোলনও মুসলমান ধর্মের কঠোর রীতিনীতি অনেকটা মোলায়েম করিয়া দিয়াছিল। উপরন্তু তাহাদের মাধ্যমে মুসলমান সমাজজীবনে নানা সংস্কার ও রহস্যমূলক বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। পূর্বেই দেখানো হইয়াছে, সুফী সাধু-সন্তরাই ছিলেন বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসারের প্রধান কারণ।

মুসলিম জনগণের মধ্যে আরবী, ফার্সী ও বাংলা এই তিনটি প্রধান ভাষাই প্রচলিত ছিল। প্রথমদিককার মুসলমানরা বঙ্গদেশের বাহির হইতে আরবী, ফার্সী, তুর্কী প্রভৃতির মাধ্যমে তাহাদের ভাষা আনিয়া ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল তখন ফার্সী ভাষাই রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহারই প্রচলন ছিল তখন অভিজাতদের মধ্যে অধিক। বঙ্গের মুসলমানদেরও সরকারী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। পরবর্তীকালে বাংলাভাষা মুসলমানদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে সুফীদের অবদান অনস্বীকার্য।

জীবনযাত্রা ঃ কবি বিজয়গুপ্তের রচনা হইতে আমরা মধ্যযুগের মুসলমানদের পোশাক সম্পর্কে ধারণা করিতে পারি। তাহাদের পোশাকের মধ্যে দেশী ও বিদেশী উভয়ের সংমিশ্রণ ছিল। তিনি মোল্লাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন তাহারা দাড়ি রাখিতেন, মাথায় টুপি পরিতেন এবং কোমরের সঙ্গে আঁট করিয়া ইজার বা পায়জামা পরিতেন। ধনী মুসলমানরা সূক্ষ্ম, ও মূল্যবান সোনা অথবা রূপার কারুকার্যখচিত বস্ত্র পরিধান করিতেন। অভিজাতদের পরিচ্ছদ সর্বদাই শ্বেতশুভ্র থাকিত যাহা হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত। বারবোসা লিখিয়াছেন

যে অভিজাত মুসলমানরা খুব মূল্যবান পোশাক পরিতেন। তাহারা রৌপ্যনির্মিত কিংখাবে মোড়া তরবারি কোমরে ঝুলাইয়া ব্যবহার করিতেন। ইহা ছাড়া মাথায় মূল্যবান টুপি ও অঙ্গুরীয় ব্যবহার করিতেন। চৈনিক পর্যটকদের বর্ণনায় একই ধরণের পোশাকের বিবরণ পাওয়া যায়। পায়ে সোনার জরিসহ চামড়ার জুতা। মহিলাদের পোশাক সম্পর্কে বলা হইয়াছে তাহারা খাট শার্ট পরিতেন এবং উপরদিকে সিল্ক অথবা তুলার তৈয়ারী ওড়না ব্যবহার করিতেন। অভিজাত মুসলমান রমণীদের গায়ের রং এত গৌরবর্ণ ছিল যে অনেকে তাহারা কোন প্রকার প্রসাধন ব্যবহার করিত না। কানে বহুমূল্যবাণ রত্নখচিত দুল পরিতেন এবং পায়ে, হাতে এবং আঙ্গুলে নানা রকমের রঙিন মূল্যবান অঙ্গুরীয় ব্যবহার করিতেন। অন্যান্য বৈদেশিক পর্যটকেরা অভিজাত মুসলমানদের সাজ-পোশাকের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম মোল্লারা অবশ্য খুব সাদাসিধে পোশাক ব্যবহার করিতেন। পর্যটকদের বিবরণে যে পোশাকের বিবরণ দেখা গেল স্বাভাবিকভাবে তাহা উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ অবস্থাপন্ন মুসলমানদের পক্ষে এই ধরণের পোশাক ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। সাধারণ মুসলমানেরা কমদামি কাপড়ের খাটো জামা পরিতেন। মাথায় ছোট টুপি পরিতেন, খুব সামান্য কয়েকজন পায়ে জুতা বা চটি ব্যবহার করিতেন। সাধারণ লোকেদের অলঙ্কার ছিল খুব কম মূল্যবান সামগ্রী এমনকি শাঁখের তৈয়ারী।

ধনী মুসলমানদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বলিতে গিয়া পর্যটক বারবোসা লিখিয়াছেন, তাহারা খুব বিলাসবহুল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতেন। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেন এবং নিজস্ব পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন। প্রত্যেকটি ধনী গৃহস্থের প্রচুর দাসদাসী থাকিত। ধনী বক্তিদের সাধারণত তিনচারিটি পত্নী থাকিত। কাহারো কাহারো কোন কোন ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী ছিল। অভিজাত মহিলারা মূল্যবান সাজসজ্জা পরিধান করিয়া সর্বদা গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন। বিবাহ বা কোন উৎসব উপলক্ষে তাহারা বাহিরে যাইতেন এবং তাহাতে যোগদান করিতেন। ইসলামীয় শাস্ত্রে পান নিষিদ্ধ হইলেও মধ্যযুগে মুসলমানগণ নানা প্রকার পানীয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। এমন কি মুসলমান অভিজাত মোল্লারাও বিভিন্ন পানীয় গ্রহণ করিতেন। মুসলমান উচ্চশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী পরিত্যাগ একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। কেহ কেহ বহু স্ত্রী রাখিতেন। কার্য উপলক্ষে যে সমস্ত জায়গায় যাইতেন প্রত্যেক জায়গায় উপপত্নী রাখিতেন। হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও নৈতিক চরিত্র উন্নত মানের ছিল না। ধনীদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ খুবই প্রচলিত ছিল।

মোগল আমলে মুসলমান উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আভিজাত্য অনেক বেশী প্রগাঢ় ছিল। বাহিরে যাইবার সময় তাহারা অশ্বারোহনে প্রচুর অনুচরসহ গমন করিতেন। এমনকি যুদ্ধ অভিযানের সময় স্ত্রীরা ও নর্তকীরা সঙ্গে যাইতেন। সাধারণত মোগল অভিজাতদের গৃহগুলি দোতালা ও প্রশস্ত থাকিত। উচ্চ অভিজাতরা বেশীর ভাগই রাজধানী অথবা শহরে বাস করিতেন। অবশ্য গ্রাম্য মুসলমানরা খড়ের তৈয়ারী চালের মাটির বাড়িতে বাস করিতেন। বড় লোকেদের বাড়িতে পুকুর, বাগান অবশ্যই থাকিত।

সুলতানী আমলের মত মোগল আমলের অভিজাতরা মূল্যবানপোশাক ও অলঙ্কারাদি পরিতেন। অভিজাতদের মধ্যে বিশেষ ধরণের রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। তাহাদের দৈনন্দিন আচরণে তাহারা ইহা কঠোরভাবে মানিয়া চলিতেন। তাহাদের সামাজিক এই ব্যবহার অনেকাংশে হিন্দুরীতি অপেক্ষা ভিন্নতর ছিল। পরবর্তীকালে অনেক অভিজাত হিন্দুরা অভিজাত মুসলমানদের পোশাক ও রীতিনীতি অনুকরণ করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগে মুসলমানদের মধ্যে ইদলফেতর, ইতুজ্জোহা ও মহরম এই তিনটি ছিল প্রধান উৎসব। অথবা সম্রাট ও নবাবদের জন্মদিন ও নববর্ষ প্রভৃতি জাঁকজমকের সহিত পালিত হইত। মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে হারেম প্রথারও বিশেষ প্রচলন ছিল। মধ্যযুগেও মুসলমানদের মধ্যেও ক্রীতদাস প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। তীর্থযাত্রা সমাজে বহুল প্রচলন ছিল। মক্কা হইতে তীর্থ করিয়া (হজ) ফিরিয়া আসিলে সমাজে তাহাদের খুবই সম্মান প্রদর্শন করা হইত।

মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে তথ্য উপস্থিত করা হইল তাহার সবগুলির উৎসই হইল সেযুগে পাঁচালি ও মঙ্গলকাব্যসমূহ। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে নিখুঁত সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত দেখানো হইয়াছে। এই কাব্য যেহেতু মুকুন্দরামের বাসস্থানে লিখিত হইয়াছিল কাজেই ইহার মধ্যে যে বাস্তব চিত্র দেখা যায় তাহা সম্পুর্ণটাই দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

বঙ্গদেশে প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ধর্ম ও সমাজের একটা গুরুতর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়, মূলতঃ হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভুত ছিল বলিয়া কালক্রমে ইহাদের মধ্যেকার প্রভেদ কমিতে ছিল। মুসলমানদের বঙ্গদেশে আগমণের পূর্বে জৈন ধর্মের প্রভাব প্রায় লুপ্ত

হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্মের পৃথক সত্ত্বা প্রায় ছিলনা বলিলেই চলে। কাজেই মুসলমানরা বঙ্গদেশে আসিয়া এদেশের আপামর জনগণকে সকলেই "হিন্দু" এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বে যে সমস্ত বিদেশীর আগমন হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ এদেশে ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পরবর্তীকালে বিলীন হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল যাহার ফলে তাহাদের অস্তিত্ব কখনও লুপ্ত হয় নাই। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭০০ বৎসর তাহারা পাশাপাসি বসবাস করিয়াও আলাদাই থাকিয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ বোধ হয় এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস ও সমাজ বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুদের পক্ষে মন্দিরে দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা ধর্মের প্রধান অঙ্গ। অপরদিকে মুসলমান শাস্ত্রে দেবমূর্তি পূজা নিষিদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্রমতে মুসলমানরা ম্লেচ্ছ ও অপবিত্র। তাহাদের সহিত বিবাহ, একত্র পান-ভোজন হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ। গোমাংস ভক্ষণ, বিধবা বিবাহ হিন্দুদের দৃষ্টিতে গর্হিত অন্যায়। কিন্তু মুসলমান ধর্মে তাহারা স্বীকৃত। হিন্দুদের বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা সংস্কৃত। মুসলমানদের আরবী ও ফার্সী গ্রন্থসমূহ। বিবাহ ও উত্তরাধিকার আইনসমূহ দুইটি জাতির মধ্যে পৃথক। এই সমস্ত প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় একাদশ শতকে (১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ) মুসলমান পণ্ডিত আলবিরুণী লিখিয়াছেন "হিন্দুরা যাহা বিশ্বাস করে আমরা তাহা করি না, আমরা যাহা বিশ্বাস করি হিন্দুরা তাহা করে না"।

তথাপি মধ্যযুগে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহার পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল। মুসলমান শাসনকর্তাগণ রাজনৈতিক উপযোগিতার প্রয়োজন হিন্দুদের মধ্যে একটি সহযোগিতার রীতি অনুকরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান স্বার্থ সমসূত্রে আবদ্ধ ছিল। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানগণ সৎ-প্রতিবেশিমূলক সম্বন্ধ সর্বদাই বজায় রাখিতেন। উপরন্তু বহু শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক ও সামাজিকভাব আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া উভয় সম্প্রদায় একে অন্যের সংস্কৃতি ও মতবাদগুলি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল। ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে একটি সৌহার্দ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শাসক মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দুদের নিজেদের কাছে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কবি বিদ্বানদের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা, প্রতিভাবান যোগ্য হিন্দুদের সরকারী পদে, উপাধি ও জমিদান তাহাদিগকে মর্যাদাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। বহুব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া রাজ-

দরবারে বিশ্বস্তপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুলতান ইলিয়াশ শাহ দিল্লীর সুলতান-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হিন্দু সামন্ত, জমিদার, সেনাপতিদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার হিন্দু সেনাপতি (সহদেব) ফিরোজশাহ তুঘলকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে কংস নামে একজন ব্রাহ্মণ রাজস্ব বিভাগের সামান্য কর্মচারীর পদ হইতে প্রথমে উজীর ও পরে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকারী হইয়াছিলেন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে, রূপ ও সনাতন নামে দুই ব্রাহ্মণ রাজদরবারে পদমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। রূপ সুলতান হোসেন শাহের দবীর-ই-খাসের (ব্যক্তিগত কর্মসচীব) গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন সাকর সাকর মল্লিকের পদে (রাষ্ট্রমন্ত্রী) নিযুক্ত হন। রাজদরবারে উচ্চ-পদে হিন্দুদের সাহচর্য স্বভাবতই সেকালে সামাজিক জীবনে এক বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল।

মুসলমান শাসকরা তাহাদের রাজদরবারে হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের সম্মানের আসন প্রদান করিতেন। হিন্দুদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহারা গভীর আগ্রহের সহিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন। শ্রীপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায় সোলেমান লোহানীকে তাহাদের সৈন্যদলের সেনাধক্ষ্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আফগান দলপতি খাজা কামান যশোহরে প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনা-ধ্যক্ষ ছিলেন। কবি বিজয়গুপ্তের 'মনসা মঙ্গল' হইতে জানা যায় চাঁদ সওদাগরে জাহাজে মুসলমান অধ্যক্ষ ও নাবিক ছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ছিল। হিন্দুরা তাহাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করিত আবার মুসলমানরা হিন্দুদের আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিত। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা হিন্দুদের বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে ও অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থপরিবার মুসলমানদের সহিত এই ধরণের সম্পর্কের ফলে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। শেরখানই, পীরালি ও শ্রীমন্ত খানই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারসমূহ ইহাদের জলন্ত প্রমাণ। সামাজিক লেনদেন, চিন্তাভাবনা ও আদান-প্রদানের ফলে হিন্দু ও মুসলমান একে অন্যের সম্বন্ধে ভাল-ভাবে জানিতে পারে। স্বভাবতই ইহার ফলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মুসলমানদের এবং মুসলমান ধর্মগ্রন্থের প্রতি হিন্দুদের ভক্তিশ্রদ্ধা জাগ্রত হইয়াছিল।

সেকালের সাহিত্য হইতে জানা যায় যে মুসলমানদের কোরান, পীর ফকিরদের প্রতি হিন্দুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। অনেক সময়ে ব্রাহ্মণগণ যাত্রার শুভদিন অনু-

সন্ধানের জন্য কোরান আলোচনা করিতেন এবং হিন্দু বণিকগণ তাহাদের নিরাপত্তার জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া বাণিজ্য যাত্রা করিতেন। কবি ক্ষেমানন্দ তাহার 'মনসামঙ্গল' কাব্যে লিখিয়াছেন লখিন্দরের জন্য নির্মিত লোহার ঘরে দেবী মনসার কোপ এড়াইবার জন্য অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থের সহিত একখণ্ড কোরান গ্রন্থও রাখা হইয়াছিল। পীর দরবেশদের দরগাসমূহে সিরণী বা উপঢৌকন প্রদান হিন্দুদের মধ্যে সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। পীর দরবেশকে তাহারা খুব গভীর শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন এবং তাহাদের আশীর্বাদ গভীর শ্রদ্ধার সহিত কামনা করিতেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিন্দু কবিগণ সাধারণত মুসলমান পীর দরবেশদের প্রশস্তি গাহিয়া তাহারা কাব্য রচনা করিতে শুরু করিতেন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কবি সীতারাম দাস তাহার কাব্যের বর্ণনা গড় মান্দারনে পীর ইসমাইলের বর্ণনার মধ্যে আরম্ভ করিয়াছেন "বন্দোপীর ইসমালি গড় মান্দারনে"।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার অবশ্য তাহার পুস্তকে (বাংলা ও ইংরাজী) হিন্দু-মুসলমানের)এই সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার সপক্ষে বহু জোরালো যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। তবে তাহার বক্তব্যের মধ্যে শেষ কথা বলা হইয়াছে ইহা মনে করিবার পক্ষে বিশেষ কোন কারণ নাই।

মারাঠাদের আক্রমণের সামগ্রিক ফলাফল

বঙ্গদেশের মধ্যযুগে ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে মারাঠাদের আক্রমণ শুধু রাজনৈতিক দিকে নয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মারাঠা আক্রমণের রাজনৈতিক ফলাফল পূর্বেই বলা হইয়াছে। গঙ্গারামের বিবরণ অনুসারে মারাঠারা প্রথম চন্দ্রকোনা, মেদিনীপুর, ক্ষীরপাই, চান্দিপুরা, বর্ধমান শহর প্রভৃতি লুণ্ঠন শুরু করে। পরবর্তী দুই-তিনমাসের মধ্যেই উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বর্ধমান সবটাই মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়।

ইহার ফল হইয়াছিল সামাজিক দিক হইতে সুদূরপ্রসারী। সাধারণ লোকেদের দুঃখ-দুর্দশা সীমাপরিসীমা ছিল না। এই সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণ ধর্ম সম্পত্তির প্রাণ নিরাপদ মনে করিত না। মারাঠাদের অত্যাচারে নৃশংসতা আবাল-বৃদ্ধবণিতাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া মারাঠাদের যে আক্রমণ চলিয়াছিল তাহার ফলে এই অঞ্চলগুলি জনবিরল হইয়াছিল। তাহাতে কৃষিকার্য, শিল্পদ্যোগ প্রায় সমস্তই বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাহার "মহারাষ্ট্র পুরাণ" কাব্যে ভীত সন্ত্রস্ত লোকেদের একটা নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহাদের পুঁথি পুস্তক লইয়া স্বর্ণকারগণ

তাহাদের দাঁড়িপাল্লাসহ, গন্ধবণিক শংখবণিক কাসারী, ঔষধ বিক্রেতা, কর্মকার, কুম্ভকার, জেলে সবাই যে যার কর্ম ত্যাগ করিয়া নিরাপদ উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছিল। কায়স্থ, বৈদ্য তাহারাও একইভাবে পলায়ন করিয়াছিল। যেসব সম্ভ্রান্ত বাড়ির মহিলারা জীবনে কখনও গৃহের বাহিরে প্রকাশ্যে আসিতেন না তাহারাও প্রাণ রক্ষার তাগিদে রওনা হইলেন। শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠানরাও সবাই গ্রামগঞ্জ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। মারাঠা বর্গীরা অনেক সময় পলায়নকারী ব্যক্তিদের ঘেরাও করিয়া নৃশংসভাবে হত্যালীলা ও অত্যাচার চালাইত। মায়ের সম্মুখে সন্তান, স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীকে হত্যা করিয়া পৈশাচিক আনন্দ ভোগ করিত। লুক্কাইত অর্থ উদ্ধারের আশায় তাহারা নানাবিধ দৈহিক অত্যাচার চালাইত এবং বহু লোক ইহাতে মারা পড়িত। গঙ্গারামের এই প্রত্যক্ষ বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় আরও তুইটি সমসাময়িক লেখকের রচনায়। তাহাদের মধ্যে একজন হইলেন বর্ধমান রাজার সভাপণ্ডিত বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আর একজন হইলেন গোলাম হোসেন সালিম। শিশুহত্যা, নারীহত্যা কোন ব্যাপারে মারাঠারা পশ্চাৎপদ হইতেন না। হলওয়েল সাহেবও মারাঠাদের আক্রমণের একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন।

জনসাধারণের অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় দূর-দূরান্তরে গমন করিয়াছিলেন। কেহ পূর্ববঙ্গে, কেহ বা উত্তরবঙ্গে (ঢাকা, রংপুর, সিলেট) বসবাস শুরু করিয়াছিলেন। বহুলোক আবার ইউরোপীয় বণিকদের সংরক্ষিত কুঠিগুলিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিশেষত নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতার ইংরেজ কুঠিগুলিতে বহু লোক স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করিলেন। ইংরেজরাও মারাঠা আক্রমণের পূর্ব সুযোগ গ্রহণ করিয়া কলিকাতার উত্তরে মারাঠাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা (Ditch) খনন করিয়াছিলেন।

এইভাবে মারাঠা আক্রমণের ফলে উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বহু অঞ্চল জনবিরল হইয়া পড়িল এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিয়া কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

জনগোষ্ঠীর এই বিবর্তনকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক কলিকাতার জন্ম হইল। সেই সঙ্গে বাঙালীর জীবনযাত্রার পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য হইতে আধুনিক যুগে পদার্পণ করিল। তাই মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে মারাঠা আক্রমণের ফলাফল হইয়াছিল বিপ্লবাত্মক ও সুদূরপ্রসারী।

সূত্র নির্দেশ

১। বাংলার ইতিহাস (২য় খণ্ড), রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ২৪২-৩৪৩।
২। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এম, এ, রহিম, পৃঃ (১ম খণ্ড) ৩৭০-৩৭৭, (২য় খণ্ড) পৃঃ ১২৯-১৯৪, ২২৬-২৭৩,
৩। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, মহম্মদ আবদুল জলিল, ১৯৮৩, পৃঃ ৩৭-৪৩।
৪। বাংলায় হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ), জগদীশনারায়ণ সরকার, ১৩৮৮, পৃঃ ৮-৫১।
৫। মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ), সুকুমার সেন, ১৯৬২, পৃঃ ৭-১৬, ৩১-৪১।
৬। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ), প্রমথ চৌধুরী, ১৩৬০ পৃঃ ২৬-২৮।
৭। History of Mediaevel Bengal, R. C. Majumdar, Pp. 188-254.
৮। Husain Sahi Bengal, M. R. Tarafdar, Pp. 310-346.
৯। Bengal Under Akbar & Jahangir, T. K. Roychoudhury, Pp. 184-208.
১০। History of Bengal, (Turko Afgan Period), A. C. Roy, 1986, Pp. 343-366.
১১। History of Bengal (Mughal Period), A. C. Roy, Pp. 466-474.

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

রমেশচন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), ১৩৭৩
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড), ১৯৭১
আব্দুল করিম	বাংলার ইতিহাস (সুলতানি আমল), ১৯৭৭
সুখময় মুখোপাধ্যায়	বাংলার ইতিহাসে দু'শ বৎসর (স্বাধীন সুলতানদের আমল—১৩৩৮-১৫৩৮), ১৯৬২
যোগেশচন্দ্র বসু	মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১৩৪৬
প্রবোধচন্দ্র বসু	ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৬
নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ	বাংলার অর্থনৈতিক জীবন (১৭৫৭-১৭৯৩), ১৯৬৭
এম, এ, রহিম	বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৮২
তরুণদেব ভট্টাচার্য	মেদিনীপুর, ১৯৭৯
ইরফান হাবিব	মোগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা, ১৯৮৫
সুরেন্দ্রনাথ জানা	বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত, ১৯৭১
জগদীশ নারায়ণ সরকার	বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১৩৮৮
ইন্দিরা দেবী	বাংলার সাধক বাউল, ১৩৬৯
ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত	তমোলুকের ইতিহাস, ১৯৭২
সুশীলা মণ্ডল	বঙ্গদেশের ইতিহাস (প্রথম পর্ব, মধ্যযুগ), ১৯৬২
সুকুমার সেন	মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, (বিশ্বভারতী), ১৯৬২
অশোক মিত্র (সম্পাদিত)	পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা (৩য় খণ্ড), ১৯৭১
বিনয় ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খণ্ড), ১৯৭৮
মহম্মদ আব্দুল জলিল	মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ১৯৮৩
প্রমথ চৌধুরী	প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ), ১৩৬০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১৯৫৯
লোকেশ্বর বসু	আমাদের পদবীর ইতিহাস, ১৯৮১
সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), ১৯৮৫

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	প্রাক্-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭), ১৯৮২
শশিভূষণ দাসগুপ্ত	ভারতীয় সাধনার ঐক্য (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্ব-ভারতী), ১৩৫২

পত্রিকা

ঐতিহাসিক	প্রবন্ধ সঙ্কলন, ষষ্ঠ সাংখ্যা, ১৯৮৬, "বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজ পরিবার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম"
ঐতিহাসিক	প্রবন্ধ সঙ্কলন, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৭৯, "চন্দননগরে ফরাসী বণিক এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ও বাংলার তন্তুশিল্পীদের প্রতিরোধ" (১৭৫৭-১৮০০)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা	৮৮ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮৮ সাল, "বাংলার মধ্য-যুগীয় মন্দির গাত্রস্থ ভাস্কর্যে প্রতিফলিত সমাজ চিত্র"।

ENGLISH BOOKS

Barui Balai	The Salt Industry of Bengal, 1984
Banerjee J. N.	Puranic and Tantric Religion, 1966
Bhattacharya S.	East India Company and the Economy of Bengal (1704-1740), 1969
Carey W. H.	The Good Old days of Honourable John Company (1600-1858) 1964
Chakraborty Janardan	Bengal Vaisnavism and Chaitanya, 1975.
Chakraborty-Ramakanta	Vaishnavism in Bengal (1486-1900), 1985
Chowdhury Susil	Trade and Commercial Organisation of Bengal (1650-1720), 1975
Dasgupta S. B.	Obscure Religious Cults, 1976
De Harinath (Ed)	Ibnbatuta's Account of Bengal, 1978
Dutt K. K.	Studies on the History of Bengal Subah 1956 ;
"	Alibardi and his Times, 1939 ;

Dutt K. K. — Survey of Indian Social life and Economic Condition in the 18th Century (1760-1813), 1961

Habib and Nizami (ed) — The Delhi Sultanate, 1982.

Haque M. A. — Muslim Administration in Orissa, 1980

Mazumdar, Roy-Chowdhury, Dutta — An advance History of India, 1967

Mazumdar R.C. — The History of Mediaeval Bengal

" (ed) — The Delhi Sultanate (V.V.B.), 1960

Maity P. K. — Historical Studies in the Cult of Goddess Manasa, 1966 ;

" — The Goddess Barghavima, 1971

Mitra D. B. — Cotton Weavers of Bengal (1757-1833), 1978

Maccutchion D.J. — Late Mediaeval Temples of Bengal, 1972

Mandal Sushila — History of Bengal (Middle age), Part I, 1963

Moreland W.H. — The Agrarian System of Muslim India, 1929

O'Mally — District Gazetteer, Midnapur, 1911

Quango K. R. — Islam and its impact of India, 1968

Rashid A. — Society and Culture in Mediaeval India, 1969

Roy A. C. — History of Bengal (Turko Afgan period), 1986 ;

" — History of Bengal (Mughal Period), 1965

Roychowdhury T. K. — Bengal Under Akbar and Jahangir, 1953

and Irfan Habib — The Cambridge Economic History of India ; Vol. I (1200-1750), 1984

Santra G. — Temples of Midnapur, 1980

Sarkar J.N. (ed) — History of Bengal, Vol. II (D.U.), 1972

Sarkar J.N. — Islam in Bengal, 1972

Sen S. P. — The French in India, 1958

Sinha P.	Calcutta in Urban History, 1978
Sinha N. K.	The Economic History of Bengal, Vol, I, 1965 ; Vol. II, 1968
Tarafdar M. R.	Husainshahi Bengal, 1965
Twari S. P.	Comprehensive History of Orissa 1985
Bengal Past and Present	"Monuments of Midnapur", May-Dec. 1974
"	The Sobha Singha Revolt
	Dutch Policy and Responce, January to June 1975.
"	"The Indian Historical Review", I.C.H.R Sept. 1974 (Vol,-I, No-2)
"	"Textile Trade and industry in Bengal Subah, 1650-1720"
"	Jan. 1978, Vol.-IV, No-2
"	"Trade and Society in Early Medieval Bengal".

মধ্যযুগের বঙ্গদেশের সামগ্রিক ইতিহাসের পটভূমিকায় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্যনিষ্ঠ ও গবেষণামূলক প্রথম বিস্তারিত মূল্যায়ন।

কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কৃতী ছাত্র, বর্তমানে তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রধান।

ISBN : 81-7074-016-9

Rs. 25·00

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২